নীল দুর্গম

শঙ্কু মহারাজ

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৭০

—সাড়ে ছ টাকা—

রচনাকাল

সেপ্টেম্বর—ডিসেম্বর ১৯৬২

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীকানাই পাল

মুদ্রণ—ফটোটাইপ সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
ক্যাশ প্রেস, ৩৩বি মদন মিত্র লেন, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

বাবা ও মা-কে

নীল দুর্গম এর চিত্রসূচী

প্রচ্ছদপট—'চূড়ান্ত সংগ্রাম' —ভানু ব্যানার্জি

রঙীন—'নীল দুর্গম' —বীরেন সরকার

'অভিযাত্রীদল'

'শেরপাদল' —জেসমণ্ড ডয়েগ

'অমর সিং ও তার খচ্চর পড়ে যাবার পর অন্যান্য খচ্চরদের ধরে ধরে ধস পার করা হচ্ছে।' —ভানু ব্যানার্জি

'উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী উপেনবাবু প্রজাতি সংগ্রহ করছেন।' —বীরেন সরকার

'ধাপে ধাপে ক্ষেত—পাহাড়ের গায়ে কি বিচিত্র আল্পনা।' —শেষকিরণ সুরানা

'নিথর নিস্পন্দ নিরুদ্বিগ্ন হেমকুণ্ড।' —কানইলাল ঘোষ

'গুরুদ্বার ও ঝুলা—গোবিন্দঘাট।' —কানাইলাল ঘোষ

'জনহীন ঘাংরিয়ার বন্ধ বিপণি।' —কানাইলাল ঘোষ

'দুর্গম গিরি নীলগিরি' —চঞ্চল মিত্র

'নন্দন কাননে ফুল সরিয়ে পথ চলা।' —চঞ্চল মিত্র

'পর্বতারোহণ শিক্ষা।' —চঞ্চল মিত্র

'নন্দন-কাননের নন্দাবতী।' —লেখক

'রতবন পর্বত।' —লেখক

'সিংহ ও ঘোড়ী পর্বত।' —লেখক

'উমাপ্রসাদ নগর।' —লেখক

'অগ্রবর্তী মূল শিবির।' —ভানু ব্যানার্জি

'খুলিয়াঘাটার পথে।' —ভানু ব্যানার্জি

'খুলিয়াঘাটা গিরিবর্ত্ম।' —চঞ্চল মিত্র

'খুলিয়াগার্ভিয়া হিমবাহ।' —লেখক

'দু নম্বর শিবির।' —চঞ্চল মিত্র

'তিন নম্বর শিবির।' —অমূল্য সেন

'স্বপ্নশিখর।'

'নীলমণি নীলগিরির শুভ্র শিখরে নিতাই একটি চুম্বন দিল এঁকে।
—ভানু ব্যানার্জি

'শিখরে টোপগে—নীচে নিতাই।' —ভানু ব্যানার্জি

'শিখরে জাতীয় পতাকা ধরে ভানু, পাশে ছান্দু, পেছনে টোপগে, আজীবা, নিতাই ও আং টেম্বা।' —আং দাওয়া

নীল দুর্গম

নীল দুর্গম

এমনটি যে হবে তা কারুর কল্পনাতেও আসে নি। এমন কি এই যুদ্ধের মূলে যিনি—সেই কলহ-বিশারদ নারদও ভাবতে পারেন নি যে, সত্যি সত্যি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রের এমনি একটা প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হয়ে যাবে। আর ভাববেনই বা কেমন করে? রাজ্য নিয়ে যুদ্ধ হয়, রানী নিয়ে যুদ্ধ হয়, আদর্শ নিয়ে যুদ্ধ হয়—তাই বলে ফুল নিয়ে? কিন্তু হয়েছিল তাই। পারিজাত নিয়েই নাকি যুদ্ধ বেধেছিল।

সেই দেবদুর্লভ পারিজাতের বন পেরিয়ে আমাদের যেতে হবে। ভৌগোলিকরা বলেন—ভুইন্দার উপত্যকা, গাড়োয়ালীরা বলেন—ফুলোঁ কা ঘাটি। বিখ্যাত পর্বতারোহী ও দার্শনিক ফ্র্যাঙ্ক এস্ স্মাইথ নাম দিয়েছেন—ভ্যালী অফ ফ্লাওয়ার্স, আমরা বলি, নন্দন-কানন।

শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্রের সেই সমর-ক্ষেত্র কোথায় জানি না। তবে শুনেছি—ব্রহ্মকমল, ফেণকমল, হেমকমলে পরিপূর্ণ কলির এই কানন, দ্বাপরের পারিজাত বনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। চারিদিকে তার তুষারমণ্ডিত শৈলশিখর।

স্মাইথ বলেছেন, 'the most beautiful Himalayan valley I have ever seen.' তিনিই একে সভ্য জগতের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন। কিন্তু নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই তাঁর সঙ্গে এই উপত্যকার পরিচয়। ১৯৩১ সালে স্মাইথ কামেট (২৫৪৪৭ ফুট) বিজয় করে যখন গামশালী দিয়ে ফিরে আসছিলেন তখন তিনি প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। দল ছাড়া স্মাইথ সহযাত্রী হোল্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে দিশেহারা হয়ে ছুটতে থাকেন। ঝড় থামল, দৃষ্টি স্বচ্ছ হল। তাঁরা বিস্মিত হলেন। দেখতে পেলেন—যতদূর চোখ যায়, শুধু ফুল আর ফুল। লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি—জগতে যত রং আছে, যত গন্ধ আছে—সব এসে জড়ো হয়েছে এখানে। আকস্মিক ভাবে জগতে অনেক বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে। পথ হারিয়ে এক পথিক পিরামিড আবিষ্কার করেছিলেন। পথহারা পর্বতারোহীরা আবিষ্কার করলেন এই উপত্যকা।

অবশ্য ডাক্তার টি. জি. লংস্টাফের মতে সম্ভবতঃ ১৮৪৮ সালে রিচার্ড স্ট্র্যাচী এই উপত্যকা অতিক্রম করেছিলেন। ১৮৬২ সালের ৩১শে অক্টোবর কর্নেল এডমাণ্ড স্মাইথ এবং ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে লংস্টাফ নিজেও এই উপত্যকায় এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা এই কাননের কথা তেমন করে প্রচার করেন নি বলেই আমরা হোল্ডস্‌ওয়ার্থ ও স্মাইথকেই এই কাননের আবিষ্কারক বলব।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের স্বর্গ এই কানন। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাড়ে তেরো

হাজার ফুট উঁচু। জোশীমঠ থেকে উনিশ মাইল। কিন্তু মাইল মেপে পাহাড়ী পথের বিচার হয় না। বিশেষ করে গোবিন্দঘাটের পর বারো মাইল পথ, অত্যন্ত চড়াই। তাহলেও এ পথে দলে দলে তীর্থ যাত্রী আসেন। যান লোকপাল-হেমকুণ্ড ও নন্দন-কানন। হেমকুণ্ডে তাঁরা কতটা পুণ্য সঞ্চয় করতে পারেন জানি না, কিন্তু প্রাণভরে নন্দন-কাননের সৌন্দর্য-সুধা পান করে ঘরে ফেরেন। আমরাও যাব সেখানে। দু হাতে ফুল সরিয়ে পথ চলব। দেখব অমল-ধবল শুভ্র-সুন্দর নীলগিরি আমাদের আবাহন করছে। স্মাইথের স্বপ্ন ছিল নীলগিরি, 'unique in my recollections for its beauty and interest, indeed the finest snow and ice-peak I have ever climbed.…… simple, beautiful and serene in the sunlight, the perfect summit of the mountaineers dreams.'

নীলগিরি অনেকটা নীলকণ্ঠ শৃঙ্গের মত। একেবারে ত্রিভুজাকৃতি। আশে পাশের সব শিখর ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। স্মাইথ ১৯৩৭ সালে এই শিখর বিজয়ের গৌরব অর্জন করেন। কিন্তু সেই প্রথম, সেই শেষ। আজ পর্যন্ত আর কেউ এই শিখরে আরোহণ করতে পারেন নি। তাহলে আমরা এই শিখর নির্বাচিত করেছি কেন? পর্বতাভিযানে যত রকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়, নীলগিরি তা সবই আমাদের উপহার দেবে। এই বাধাকে জয় করার অভিজ্ঞতা আমাদের আগামী দিনের বৃহত্তর পর্বতাভিযানের পথ প্রশস্ত করে দেবে বলে।

বারো জন অভিযাত্রী, ছজন শেরপা ও দুজন সহকারীসহ বটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার একজন বটানিস্টকে নিয়ে আমাদের দল। ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬২ দুন এক্সপ্রেসে আমরা হাওড়া থেকে ঋষিকেশ যাত্রা করছি। আমাদের নেতা অমূল্য সেন দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের এ্যাড্‌ভান্সড্‌ ট্রেন্‌ড্‌। সহ-নেতা ভানু ব্যানার্জি, স্যার এডমাণ্ড হিলারীর 'সিলভার হাট' অভিযানের সদস্য ছিল। শিখর অভিযাত্রীদলের অপর দুজন সদস্য নিতাই রায় এবং নিরাপদ মল্লিকও দার্জিলিং থেকে বেসিক ট্রেনিং নিয়েছে।

দেশবাসীর অকুণ্ঠ সাহায্য ও আশীর্বাদ নিয়ে আমরা চলেছি দুর্গম নীলগিরি-শিখরে। সফল আমাদের হতেই হবে। আশীর্বাদ করুন—শুভ যাত্রা লগ্নে যে পবিত্র জাতীয় পতাকা আপনারা আমাদের নেতার হাতে তুলে দিচ্ছেন, নীলমণি-নীলগিরির রজতশুভ্র স্বপ্ন-শিখরে তাকে স্থাপিত করে আমরা যেন উন্নত শিরে আপনাদের মাঝে ফিরে আসতে পারি।

॥ ১ ॥

সেকি! লাল আলোটা সবুজ হয়ে গেছে! কখন হল? এইমাত্র কি? এর আগে তো চোখে পড়ে নি। পড়বে কেমন করে? আত্মীয়-স্বজন সহ অগণিত শুভানুধ্যায়ীর আগমনে প্লাটফর্মে তিল ধারণের স্থান নেই। তাঁরা ফল ও মিষ্টি এনেছেন। ফুলের তোড়া ও মালা এনেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, আলিঙ্গন করেছেন, আশীর্বাদ করেছেন। এতক্ষণ কি অন্য কোন দিকে তাকাবার অবসর ছিল, না থাকে? লালকে সবুজ হতে দেখি নি, কিন্তু স্টেশনে আসার পরে গত এক ঘণ্টায় যা দেখেছি তার তুলনা নেই। স্বজন-স্বগণের অন্তরের সবটুকু প্রীতি জড়ানো যে শুভেচ্ছা পেয়েছি, তা অভূতপূর্ব। বার বার মনে হয়েছে এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন পাবার যোগ্যতা আমাদের আছে কি? আমরা কি পারব নীলগিরি বিজয় করতে? নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু যাঁর অকৃপণ করুণা না হলে, এই অভিযানের আয়োজন সম্ভব হত না—আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী শারীরিক অসুস্থতার জন্য আজ স্টেশনে আসতে পারেন নি। ব্যথা পেয়েছি, কিন্তু বিমর্ষ হই নি। কারণ আমরা জানি তিনি রোগশয্যা থেকেও আমাদের আশীর্বাদ করছেন।

আমাদের সবাইকে গাড়িতে উঠতে দেখেই, নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় পনেরো মিনিট পরে, গার্ডসাহেব বাঁশীতে ফুঁ দিলেন। আত্মীয়-বন্ধুর সমবেত জয়ধ্বনির মধ্যে তুন এক্সপ্রেস নড়ে উঠল।

কতবার তো এই গাড়িতে চেপে কত জায়গায় গিয়েছি। প্রতিবারই এমনি করে লাল আলো সবুজ হয়েছে। গার্ডসাহেব বাঁশী বাজিয়েছেন, আলো দেখিয়েছেন, তুন এক্সপ্রেস নড়ে উঠেছে। কিন্তু এমন অনুভূতি তো কোনোদিন হয় নি। এমন উৎসাহ, এমন উদ্দীপনা, এমন সম্বর্ধনা, জীবনে এই প্রথম।

ধীরে ধীরে আমাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীরা প্ল্যাটফর্মের জনারণ্যে মিলিয়ে গেলেন। মিলিয়ে গেল আলো-ঝলমল হাওড়া স্টেশন ও কলকাতা মহানগরী—যে নগরী থেকে গত তিন বছর যাবৎ প্রতিবার এমনি একদল দামাল ছেলে তুন এক্সপ্রেসে চেপে হিমালয়ের গর্বকে খর্ব করার প্রচেষ্টায় যাত্রা করে। গাড়ি চলল বেঁকে এগিয়ে। আমরা চললাম এগিয়ে—ব্রহ্মকমল পরিবেষ্টিত অমল ধবল শুভ্র সুন্দর গাড়োয়ালের নীলগিরির দিকে।

যাত্রা হল শুরু। মনে পড়েছে আর এক সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় এমনি ভাবেই

যাত্রা করেছিলেন আমাদের এসোসিয়েশানের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীসুকুমার রায়, তাঁর সহযাত্রীদের নিয়ে, নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টির উদ্দেশ্যে। ১৯৬০ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বরের সেই গৌরবান্বিত গোধূলি থেকেই বাঙ্গালীর পর্বতারোহণের ইতিহাস শুরু।

মনে পড়ছে 'মানা' অভিযানের নেতা বন্ধুবর শ্রীবিশ্বদেব বিশ্বাস ও তাঁর সহযাত্রীদের কথা। মনে পড়ছে শ্রীপৃথ্বী চৌধুরীর কথা। পঁচিশ বছরের সেই দুঃসাহসী যুবক আমাদের বীরেন সরকার সহ ছ জন তরুণ অভিযাত্রীকে নিয়ে গত বছর ১৯৬১ ২০শে অক্টোবর (২১৬৯০ ফুট) উঁচু নন্দাখাত শিখরে আরোহণ করেন।

এঁরা সবাই আমাদের পথিকৃৎ। আজ এই শুভ লগ্নে এঁদের সবাইকে আমাদের ধন্যবাদ জানাই।

'হিমালয়ান এসোসিয়েশান—জিন্দাবাদ।'

শ্রীরামপুর স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। অপেক্ষমান জনতা আমাদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন। প্রাণেশ ও দেবীদাস উত্তরপাড়ার বাসিন্দা। ওদের আত্মীয়-স্বজনেরা বিদায় জানাতে এখানে এসেছেন। বীরেন ও টোপগের সঙ্গে প্রাণেশ আগেই চলে গেছে। কাল ওদের টেলিগ্রাম পেয়েছি। ঋষিকেশে আমাদের জন্যে বাসের ব্যবস্থা করে ওরা পিপলকোঠি রওনা হয়ে গেছে।

দেবীদাস দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, তার স্বজনদের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু সে কথায় সুরের পরশ নেই। যাঁর ভ্রমরকৃষ্ণ আঁখির একটু সলাজ দৃষ্টি এই বিদায়লগ্নকে কাব্যময় করে তুলতে পারত, দেবীদাস তাঁকেই খুঁজে পাচ্ছে না।

রনেশদা ও শেষকিরণ সুরানা আমাদের সঙ্গে আছে। ওরা বর্ধমানে নেমে যাবে। শরীর ভাল নয় বলে রনেশদা অভিযানে যেতে পারছেন না। গেলে খুবই ভাল হত। ওঁর মত বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন অপরিহার্য। আর শেষকিরণের কথা ভেবে দুঃখ পেয়ে লাভ কি ? তারই এ অভিযানে নেতৃত্ব করার কথা। কিন্তু এম. এ. পরীক্ষার জন্য তাকে বর্ধমানে পড়ে থাকতে হল। নন্দাঘুণ্টি অভিযানেও শেষকিরণের অংশ গ্রহণ করার কথা ছিল। ৯ই আগস্ট ১৯৬০ আনন্দবাজারে তার নাম পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। কিন্তু সেবারেও অনিবার্য কারণে শেষ পর্যন্ত শেষকিরণ অংশ গ্রহণ করতে পারে নি। সত্যই হতভাগ্য সে—দুর্ভাগ্য আমাদের।

বর্ধমানেও শ্রীরামপুরেরই পুনরাবৃত্তি। সস্ত্রীক ডাক্তার শৈলেন মুখার্জিসহ বহু শুভানুধ্যায়ী এই গভীর রাতে আমাদের বিদায় জানাতে স্টেশনে এসেছেন—সঙ্গে ফল ফুল ও মিষ্টি।

বর্ধমান থেকে গাড়ি ছাড়ল। অনেক ফুল পাওয়া গেছে। পিনাকী ফুল সাজিয়ে বাসর রচনা করল। এইবারে শুয়ে পড়া যাক। যতটা সম্ভব জিরিয়ে নেওয়া ভাল। এতক্ষণ নিজেদের কথা ছিলাম ভুলে। কিন্তু এবারে সে ভুল ভাঙতে হবে। সবার কথা ভাবতে হবে। সুখে-দুঃখে, বিপদে-বিজয়ে, একসঙ্গে থাকতে হবে, খেতে হবে, চলতে হবে। আমি এই অভিযাত্রী পরিবারের একজন, আলাদা প্রাণ থাকলেও আলাদা মন নেই।

রেলওয়ে বোর্ড আমাদের 'সিঙ্গল ফেয়ার ডাব্‌ল্ জার্নি কনসেসান' দিয়েছেন। মালপত্রের জন্য আমাদের মাত্র অর্ধেক ভাড়া লেগেছে। আমরা তৃতীয় শ্রেণীর স্লিপিং বার্থের যাত্রী। চার আনার বিনিময়ে এমনি আরাম কয়েক বছর আগেও কল্পনাতীত ছিল। গতকালের কল্পনা আজ বাস্তবে পরিণত, আজকের কল্পনা আগামীকাল বাস্তবে রূপায়িত হবে—এইতো সভ্যতার নিয়ম। অদূর ভবিষ্যতে এই কাঠের বেঞ্চখানায় গদী লাগানো হবে। জানলা দিয়ে আর কয়লার কালো ছাই প্রবেশ করবে না। গাড়িতে বসেই বাড়ির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা যাবে।

একি করছি! চলেছি না নীলগিরি শিখরে। অভিযাত্রীর আবার ঘরের কথা কেন? পিছুটান থাকলে নাকি মানুষ এগিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু আমরা তো কেউই সন্ন্যাসী নই। যাঁরা আমাদের পথিকৃৎ তাঁরাও যে প্রায় সকলেই সংসারী। সংসার তো তাঁদের তুষার-সাধনায় বিঘ্ন উৎপাদন করে নি।

ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটে চলেছে। কারও কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। ওরা কি সবাই ঘুমিয়ে পড়ল? আমি ভাবছি—সেজকা, প্রবোধদা, শিশিরদা, মনিদা, লক্ষ্মীদা, ডেসমণ্ড্ ও ব্রডীর কথা। বিদ্যাদানের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ডক্টর এলমার জে ব্রডী আমেরিকা থেকে ভারতে এসেছে। কিন্তু হিমালয় তাকে শুধু অধ্যাপনা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে দেয় নি। দার্জিলিং থেকে সস্ত্রীক বেসিক ট্রেনিং নিয়েছে। কথা ছিল ব্রডী আমাদের সঙ্গে যাবে। কিন্তু নানা কারণে সে আমাদের সঙ্গী হতে পারে নি।

"মিস্টার, শুনিয়ে মিস্টার আপকা টিকট্ দেখাইয়ে।"

ঘুম ভেঙে গেল। খুব কাছাকাছি কেউ কাউকে ডাকছেন। হ্যাঁ, আমাদের গাড়ির কণ্ডাক্টার ভানু ও চঞ্চলকে ডাকছেন। ডাকবেনই তো। ওরা যে অন্যের বার্থ বেদখল করেছে। ওদের ভাগে পড়েছিল জানালার ধারে দুটি বার্থ। দৈর্ঘ্যে ওদের দেহের চেয়ে কিছু ছোট। তাই নিজেদের বার্থ খালি রেখে অন্য দুটি খালি বার্থ ওরা বেদখল করে নিয়েছে। এখন বোধ হয় খালি বার্থের আরোহীরা গাড়িতে উঠেছেন। কণ্ডাক্টার জবরদখলকারীদের উৎখাত করতে এসেছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ যে শব্দহীন। সাড়া দেব কি? নাঃ, ভানু সাড়া দিয়েছে। তবে কণ্ডাক্টারের পক্ষে এরকম সাড়া না পেলেই বোধ হয় ভাল ছিল। তিনি ভানুর সাড়ায় ভড়কে গেছেন। এই গভীর রাতে তাকে বিরক্ত করার জন্যে চোস্ত ইংরাজিতে কণ্ডাক্টারের কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে ভানু। উৎখাত করতে এসে উৎখাত হলেন কণ্ডাক্টার। এক পা দুপা করে পেছিয়ে গেলেন। ভানু নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরতে যাচ্ছে এমন সময়, "কিরে? লোকটা গেছে তো?"

সেকি! চঞ্চল তাহলে জেগেই ছিল? ভানুর সঙ্গে আমিও হেসে উঠলাম।

"এখানে কিছু খেয়ে নিতে হবে।"

"কে?"

"আমি দেবীদাস।"

শুধু আমার নয়, ঘুম ভেঙেছে পিনাকী অমূল্য ও ডাক্তারের। পিনাকী বলে, "কি হয়েছে দেবীদাস?"

"একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। ভাবছি এখানেই কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়?"

"মোটেই ভাল হয় না। তুমি যদি রোজা করতে তাহলে না হয় ভেবে দেখা যেত।"

"মানে?" দেবীদাস গরম হয়েছে।

"এখন রাত তিনটে।"

"এ্যাঁ। কিন্তু আমার ঘড়িতে যে ছটা বেজে চার মিনিট।"

"ওটা কাল বিকেলের সময়, যখন বৌমার কাছ থেকে তুমি বিদায় নিচ্ছিলে।"

"মহারাজ।" অমূল্য আমাকে ডাকে।

"কি বলছ?"

"আপনি বলেছিলেন ওয়াকি টকি নেওয়া হল না—দেবীদাসের ডিমোশান

হল। এখন তো বুঝতে পারছেন, ওর প্রোমোশান ঠেকানো গেল না।"

"কি রকম?"

"ওয়ারলেস্ ইঞ্জিনিয়ার থেকে ফুড মিনিস্টার—রাষ্ট্রভাষায় খাদ্-মন্ত্রী।"

তুমুল হাস্যরোলের মধ্যেও ডাক্তার প্রতিবাদ জানায়, "ভুল হল। অমূল্য, তোমার ভুল হল।"

"কি হবে তাহলে?"

"একে কি প্রোমোশান বলে? এ যে ঘোড়া থেকে সহিস।"

আমাদের হট্টগোলে নিরাপদর ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তাহলেও সে এতক্ষণ চুপচাপ শুয়ে ছিল। এবারে গম্ভীর স্বরে শুরু করে, "বিয়িং দি ফাদার অভ দি এক্সপিডিশান..."

এ কি বলছে নিরাপদ? আমরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। সেও বুঝতে পারে আমাদের অজ্ঞতা। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "মানে...আমাদের দলে তিনজন বিবাহিত, তবে জনক হবার সৌভাগ্য একমাত্র দেবীদাসবাবুরই হয়েছে। তাই বলছিলাম", নিরাপদ আবার দেবীদাসের দিকে তাকায়, "বিয়িং দি ওনলি ফাদার অভ দি এক্সপিডিশান, আপনি কি করে বাড়ি থেকে অনুমতি পেলেন?"

"ছেলে বড়। প্রথমে তাকেই বোঝালাম—তুই সঙ্গে গেলে যে আমায় চিঠি লিখতে পারবি না। তাই তোকে রেখে যাচ্ছি। ছেলে মেয়েকে বোঝাল..."

"মেয়ের মাকে কে বোঝাল, আমরা তাই জানতে চাইছি।" অমূল্য চিৎকার করে ওঠে।

দেবীদাস নির্বাক। বাইরে অসীম আকাশ আর সীমাহীন অন্ধকার। সে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে সেদিকে। হয়তো উষার আশায়। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে আসা স্টেশনে কিছুই খাওয়া হয়ে ওঠে নি দেবীদাসের।

'অশোচ্যানন্বশোচস্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥'

আবার ঘুম ভাঙ্গল। না এবারে সত্যিই সকাল হয়েছে। কিন্তু গীতাপাঠ করছে কে? এ যে দেখছি ডাক্তার! তন্ময় হয়ে পড়ছে :—

'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥'

যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি উচ্চারণ। শুনতে ভালই লাগছে। কিন্তু শোনার কি উপায় আছে ?

"এ নিশ্চয়ই মল্লিকের কাজ।" নিতাই চিৎকার করে উঠেছে। মল্লিক মানে নিরাপদ। নিরাপদ কিন্তু নির্বিকার। পলকহীন নয়নে সে চেয়ে আছে দূরের ঐ শিশির-ভেজা ছোট্ট গাঁয়ের দিকে। নিতাইকে জিজ্ঞেস করি, "কি করেছে মল্লিক ?"

"আমাকে সরিয়েছে। শুয়েছিলাম আপনার নীচের বার্থে। আমি এখানে এলাম কেমন করে ?"

আশ্চর্য! আমরা তো কেউ টের পাই নি। আর যাকে সরিয়েছে সেই যখন পায় নি, আমরা টের পাব কেমন করে ?

ডাক্তারের গীতাপাঠ শেষ হয়েছে। সে পুজোয় বসেছে। চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়েছে।

"তাহলে আজ দুপুরের মেনুটা এখনই ঠিক করে ফেলা যাক।"

সে কী ? সকালের খাওয়াই যে এখনও হল না!

কিন্তু দূরদর্শী দেবীদাস বলে চলে, "ভাত, ডাল, ভাজা, তরকারী, মাটন…"

"না না চিকেন।" বলেই আবার চোখ বোজে ডাক্তার! খুব মনযোগ দিয়ে পুজো করছে কি না।

গাড়ি থেমেছে। গয়া এসেছে। চা এল। পিনাকী মিহিদানার ঠোঙা বার করতে যায়। দেবীদাস পিনাকীর দিকে এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু পারে না। অমূল্য নিতাই ও নিরাপদ অতি কষ্টে তাকে বসিয়ে দেয় তার সীটে। ডাক্তারের পুজো শেষ হয়েছে। চোখ খুলেই বলে, "আমার কাছে ট্যাবলেট আছে।"

"কিসের ?" দেবীদাস জিজ্ঞেস করে।

"ক্ষিদে নষ্ট করার।"

"আমি খাব না।"

"কাল রাতে দেখেছি আপনি হাঁ করে ঘুমোন।"

"রাতের কথা রাতে হবে। এখন তো মিহিদানা খাওয়া যাক।" আমরা হাসিতে ফেটে পড়ি। এই সুযোগে দেবীদাস পিনাকীর পাশে গিয়ে বসে পড়ে।

॥ ২ ॥

প্রায় তেইশ ঘণ্টা কেটে গেল। গাড়ি চলছে, আমরা চলেছি। আলাপ-আলোচনা, গাল-গল্প, খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে আমাদের সময় গাড়ির মতই বয়ে চলেছে।

গাড়ি থামল। লখ্‌নউ এসে গেছে। হাত পায়ের জড়তা ভাঙ্গাতে সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। আমিও নামলাম। তবে আলস্য পরিহার করতে নয়, এখানে এসে আমি গাড়ির মধ্যে বসে থাকতে পারি না। লখ্‌নউকে আমার বড় ভাল লাগে। লখ্‌নউ উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম মহানগরী। ভুলভুলাইয়া, রেসিডেন্সী, চিড়িয়াখানা ও হজরৎগঞ্জ ভারত বিখ্যাত। লখ্‌নউয়ের মানুষ সুন্দর, ভাষা সুন্দর, সঙ্গীত সুন্দর। সুন্দরের চিরস্থায়ী আবাস লখ্‌নউ। লখ্‌নউকে সকলের ভাল লাগে। আমার কিন্তু ভাল লাগে অন্য কারণে। ভাল লাগে এই স্টেশনটির জন্যে। যদি কোনদিন 'আর্ট-ইন-ইণ্ডাস্ট্রির' মত 'আর্ট-ইন-স্টেশন' কথাটি চালু হয়, তবে লখ্‌নউয়ের স্থান হবে ভারতীয় রেলপথের পুরোভাগে। লখ্‌নউয়ের চেয়ে বৃহত্তর আধুনিকতর স্টেশন ভারতে আছে, কিন্তু সুন্দরতর স্টেশন আছে কি?

তাই গাড়ি থামলেই নেমে পড়ি। বেরিয়ে আসি বাইরে। রাস্তায় পায়চারী করতে করতে স্টেশনটি দেখি আর ভাবি……

কিন্তু আজ বোধ করি ভাবার অবকাশ হল না। গেটের বাইরে পা বাড়াতেই কানে এল, "কোথায় যাচ্ছেন মহারাজ?"

"প্রায় চল্লিশ মিনিট এখানে গাড়ি দাঁড়াবে। একটু ঘুরে আসি।"

"চলুন আমিও যাচ্ছি। শেরপা পূর্বা ছান্দুর পেটের গোলমাল হয়েছে। ওর জন্যে বিস্কুট নিয়ে আসি।"

"কেন? বিস্কুট তো আমাদের সঙ্গেই রয়েছে।"

"না না। ডাইজেস্টিভ কিছু নিতে হবে।" কিন্তু দেবীদাস ওদিকে ছুটছে কেন? ওটা তো বিস্কুটের দোকান নয়। পকোড়া আবার ডাইজেস্টিভ হল কবে থেকে? তাহলেও দেবীদাস হাঁক ছাড়ে, "এই এক কিলো লাগাও।"

"সে কী, ছান্দুকে এক কিলো পকোড়া খাওয়াবেন?"

"ছান্দু নয়, আমি, মানে আমরা খাব।"

"একটু বাদেই যে রাতের খাবার এসে যাবে।"

আমার অবান্তর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দেবীদাস নিজের কাজ গুছিয়ে নেয়। গরম ঠোঙাটি হাতে নিয়ে বলে, "চলুন।"

"কোথায় ?"

"ছান্দুর বিস্কুট কিনতে।"

ছোট লাইনের স্টেশন পেরিয়ে আমরা বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। রাস্তা পেরুতে হবে। ওপারেই বাজার। দেবীদাস থমকে দাঁড়ায়। না দাঁড়ায় না, কি একটা ইশারা করেই উল্টো দিকে ছুটে চলে। নিরুপায় হয়ে ওর পেছনে ছুটি। বেশী দূর ছুটতে হয় না। দেবীদাস কলা কিনছে। বাছাবাছি ও দরাদরি চলল প্রায় মিনিট দশেক ধরে। আমি দর্শক মাত্র। অবশেষে দেবীদাস রফা করে, "দেও তিন দরজন।"

"সে কি মশাই, ক্ষেপে গেলেন নাকি ? কাল সকালেই তো আমরা হরিদ্বার পৌছচ্ছি। এগুলো খাব কখন ?"

"কেন আজ রাতে। সাহেবদের দেখেন নি ডিনারের পর ফ্রুটস খায় ?" কলার কাঁদি আমার কাছে দিয়ে দেবীদাস বলে, "চলুন।"

"কোথায় ?"

"ছান্দুর বিস্কুট কিনতে।"

"কিন্তু এদিকে যে প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে এল।"

দেবীদাস অবিচলিত। সে এগিয়ে চলে। আমি তাকে অনুসরণ করি।

দু তিনটি দোকানে হানা দিয়ে আমাদের জন্যে আর কিছু না কিনে, শেষ পর্যন্ত শ্রীমান ছান্দুর ভোজনোপযোগী সেই পরম ঈপ্সিত ডাইজেস্টিভ বিস্কুট কেনা হল। আর কিনেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবিচলিত দেবীদাস বিচলিত হয়ে উঠল। বিস্কুটের ঠোঙা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে সে পকোড়া হাতে ছুট লাগাল। গাড়ি টাঙ্গা, রিক্সা, ঠেলা ও পদচারীদের সশঙ্কিত করে প্রকম্পিত হৃদয়ে সে দুন এক্সপ্রেসের পানে ছুটল। আমি তাকে অনুসরণ করি। বেশ কয়েকজনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে, একাধিকবার গাড়ি চাপা এড়িয়ে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে দেখি সহযাত্রীরা গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে গাড়ির দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। গার্ডসাহেব সবুজ আলো দেখাচ্ছেন—দুন এক্সপ্রেস নড়ে উঠেছে।

ঐ তো মনসা পাহাড়। হরিদ্বার এসে গেছি। শুধু হরিভক্ত ও হরভক্তদের

মোক্ষদ্বার নয়, ধর্মপ্রাণ ভক্তদের মোক্ষক্ষেত্র নয়, আমাদের মত ভক্তিহীন অধার্মিক পাহাড়-পাগলেরও পরম প্রিয় এই হরিদ্বার।

আজ সোমবার ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৬২। সকাল আটটা। চারিদিকে চকচকে রোদ। কালও নাকি বেশ বৃষ্টি হয়েছে। কলকাতায়ও ঠিক তাই হয়েছিল। আমাদের রওনা হবার আগের দিন সে কি বিরামহীন বৃষ্টি। তারই মধ্যে শেরপাদের দ্বিতীয় দল হিমালয়ান ইন্সটিটিউটের সাজসরঞ্জাম নিয়ে দার্জিলিং থেকে শেয়ালদা পৌছল। ট্রাম বাস বন্ধ। এক কোমর জল ভেঙে শেয়ালদা গিয়েছিলাম। কি দুশ্চিন্তায়ই না পড়েছিলাম। অথচ আশ্চর্য, পরদিন সকাল থেকেই খটখটে রোদ। হরিদ্বারেও কি তাই হল?

গাড়ি থেমেছে। কোয়ার্টার মাস্টার পিনাকী সিংহ ও দেবীদাস চঞ্চল হয়ে উঠল। চঞ্চল হয়েছে ম্যানেজার চঞ্চল মিত্র। বলতে গেলে এখান থেকেই কাজ শুরু হল। প্রাথমিক প্যাকিং পিনাকীকেই করতে হয়েছে সত্য, কিন্তু হাওড়া স্টেশনে রনেশদা, শেষকিরণ ও কয়েকজন সহৃদয় রেলকর্মী আমাদের মালপত্রের ঝক্কি সামলেছে। আজ রনেশদা ও শেষকিরণ নেই। হরিদ্বার স্টেশনের রেলকর্মীরা নিজেদের কাজ ফেলে আমাদের মালপত্রের তদারকী করবেন না। তাই ওরা প্ল্যাটফর্মে লাফিয়ে পড়ল। কুলি, এই কুলি বলে চিৎকার করে উঠল। কুলি কাছেই ছিল। চিৎকারের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মানুষ সব সময়ে প্রয়োজন হিসেব করে কাজ করে না।

কুলি এল। দলে দলে কুলি এসে ভীড় করল। কিন্তু মালপত্র পরীক্ষা করার পর কুলিদলপতির শ্রীমুখ থেকে যে টাকার অঙ্কটি নিঃসৃত হল, তা শুনে শুধু কেশিয়ার শৈলেশ চক্রবর্তীর নয়, আমাদের সকলেরই হৃদকম্প শুরু হল। অতএব পিনাকী প্রস্তাব করে, "বারো আনা মাল তো ব্রেকভ্যানেই রয়েছে। রেলের কুলিরাই ওগুলো ঋষিকেশের গাড়িতে তুলে দেবে। সঙ্গে আমাদের আধটনের মত পার্সোনাল লাগেজ। চোদ্দজন মিলে এ মালটুকু ও প্ল্যাটফর্মে নিতে পারব না?"

"নিশ্চয়ই পারব।" ছাপ্পান্ন বছরের প্রবীণ যুবক শৈলেশদাই সবার আগে হেঁকে ওঠেন।

মালপত্র গাড়ি থেকে নামানো হল দেবীদাস ইতিমধ্যে Nilgiri (Garhwal) Expedition, 1962 ফেস্টুন দুটো গাড়ির গা থেকে খুলে ফেলেছে। ঠিক হল বাঁকে করে মাল নিয়ে যাওয়া হবে। সবাই কিছু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে

পড়লাম। শৈলেশদাও এসে দাঁড়ালেন আমাদের সঙ্গে। অনেক বলে কয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করলাম। তিনি তাঁর সাদা র‍্যাশন ব্যাগটি নিয়ে ঋষিকেশের গাড়িতে চলে গেলেন। বয়ে নিয়ে যাওয়া মালপত্র পাহারা দেবেন শৈলেশদা।

কুলিরা কাছেই বসে আছে। বসে বসে বিড়ি ফুঁকছে। কি যেন বলাবলি করছে, আর মাঝে মাঝেই হো হো করে হেসে উঠছে। হাসবেই তো, আমরা যে ওদের জুলুম মেনে নিই নি। শুধু ওরা নয়, হরিদ্বারের অন্যতম বাসিন্দা শ্রীহনুমানের বংশধরগণও বোধ করি ক্ষুব্ধ হয়েছে আমাদের আচরণে। নইলে ওরা কেন একে একে এসে ভীড় করেছে আমাদের চারপাশে? কুলিরা হাসছে, ওরা ভেংচী কাটছে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেবীদাস জানে, কুলিদের অসন্তুষ্ট করে ঋষিকেশ পৌছনো যাবে, কিন্তু হনুমানদের হাতে রাখাই উচিত। র‍্যাশন ব্যাগ থেকে কলা বের করে প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে দেয় দেবীদাস। হনুমানকুল অম্লানবদনে দেবীদাসের ঘুষ গ্রহণ করে। কলা কেনার জন্যে কাল রাতে অনেক কথা শুনতে হয়েছে তাকে। অনেকেই কলা খায় নি। সেই কলা আজ জান বাঁচাল আমাদের। দূরদর্শী দেবীদাস।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই মালপত্র সব নিয়ে আসা হল ঋষিকেশের গাড়িতে। অমূল্য, ভানু, নিতাই, নিরাপদ ও ডাক্তার হর-কি-প্যারী দেখতে চলল। ওরা এই প্রথম হরিদ্বার এসেছে। চঞ্চল ওদের গাইড হল। আজীবা তার সঙ্গীদের নিয়ে খেতে গেল। ব্রেকভ্যানের মালপত্র তদারক করতে ছুটল পিনাকী ও দেবীদাস। শৈলেশদার সঙ্গে আমিও পড়ে রইলাম প্ল্যাটফর্মে।

শৈলেশদা তাঁর সাদা থলিটি দেবীদাসের টুল-বক্সের ওপর রেখে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে এসে বসেন। আমি পায়চারী করতে থাকি। গাড়ি ছাড়ার দেরি আছে। প্ল্যাটফর্মে শুধু আমরা দুজন। কোথা থেকে আবার একটা হনুমান এসে হাজির হল। দু চার বার এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সে আমাদের কামরায় ঢুকে পড়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে শৈলেশদা এমন ভাবে চিৎকার করে ওঠেন যেন পালে বাঘ পড়েছে। দ্বিতীয় দরজা দিয়ে তিনিও গাড়িতে ঢোকেন। হাত পা নেড়ে বলতে থাকেন, "হেই হেই।" হনুমানও তাঁকে ভেংচী কাটতে থাকে। নির্ভীক হনুমান ধীর পদক্ষেপে শৈলেশদার থলির দিকে এগোয়। ঐরকম একটি থলি থেকে দেবীদাস ওদের কলা বের করে দিয়েছিল। শৈলেশদা আর্তনাদ করে উঠেন, "গেল গেল।"

এগিয়ে যাই। জানলা দিয়ে একখানি আইস্-এক্স হাতে তুলে নিই।

হনুমানের নজর পড়ে আমার দিকে। আইস-এক্স এর সম্মান রেখে সে পেছনের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়। হেসে শৈলেশদাকে বলি, "কি আর করত হনুমানটা?"

"কি করত না? দেখতে পাও নি সে আমার থলির কাছে আসছিল।" অপুত্রক শৈলেশদা অপত্যস্নেহে থলিটায় হাত বুলিয়ে, আবার নেমে আসেন গাড়ি থেকে।

"শৈলেশদা ও শৈলেশদা! টুল্‌সের বাক্সটা একটু দিয়ে যাবেন?" ঐ প্ল্যাটফর্ম থেকে দেবীদাস হাঁকছে। শৈলেশদা নিরুত্তর। এমন কি তিনি দেবীদাসের দিকে ফিরে পর্যন্ত তাকাচ্ছেন না। বাধ্য হয়ে আমি উঠে দাঁড়াই। কিন্তু দেবীদাস ততক্ষণে লাইন ডিঙিয়ে আমাদের প্ল্যাটফর্মে উঠে এসেছে। বলে, "ব্রেকের মাল নামাতে গিয়ে কুলিরা দুটি বাক্স ভেঙে ফেলেছে। সারাতে হবে।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি গাড়িতে উঠবে না। আমি দিচ্ছি তোমার টুল-বক্স।" শৈলেশদা দেবীদাসকে বাধা দেন।

একজন দুজন করে যাত্রী সমাগম হচ্ছে। শৈলেশদা বেঞ্চির সীট থেকে ব্যাক্ রেস্টের ওপর উঠে বসেছেন। অপলক নয়নে তাকিয়ে আছেন তাঁর থলিটির দিকে।

দেবীদাস ও পিনাকী এসে জানাল, ব্রেকের মালপত্র সব গাড়িতে উঠে গেছে। একটু বাদে শেরপারাও ফিরে এল। দেবীদাস বলে, "চলুন কিছু খেয়ে আসা যাক।"

"সবাই তো একসঙ্গে যেতে পারব না।" শৈলেশদা বলেন।

"কেন?"

"তোমার সব কিছুতেই কেন।"

"বেশ আপনি থাকুন। আমরা চলি।"

"তা চলবে না? আমি বুড়ো মানুষ না খেয়ে তোমাদের মাল পাহারা দেব।"

লজ্জা পেয়ে বলি, "আমার তেমন ক্ষিদে পায় নি। আমি এখানে বসছি। আপনারা খেয়ে নিয়ে আমার জন্যে যা হোক কিছু নিয়ে আসুন।"

"তাই ভাল।" শৈলেশদা খুশী হয়েছেন, "মহারাজ একটু গাড়িতে চলো। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

দু জনে গাড়িতে উঠি। শৈলেশদা ফিস্‌ফিস্ করে বলেন, "খুব সাবধান। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই থলিটার পাশে বসে থাকবে।"

"কেন? ওতে কি আছে?"

"টাকা।"

"টাকা!"

"হ্যাঁ যাতে কেউ আঁচ করতে না পারে, তাই সমস্ত টাকা রেখেছি এই থলিতে। কাউকে বলবে না। খুব সাবধানে একটু এদিক ওদিক হলেই কিন্তু…"

॥ ৩ ॥

গাড়ি ছেড়েছে হরিদ্বার থেকে। কিন্তু নেই সেই গতিবেগ। দুন এক্সপ্রেস যদি হয় চার ঘোড়ার ফিটন, এ তাহলে নিঃসন্দেহে চার বেয়ারার পাল্‌কী। চলেছে হেলে দুলে মজলিশী চালে—সুড়ঙ্গ পেরিয়ে, ঝরণা ডিঙ্গিয়ে, শাল আর দেওদার বনের বুক চিরে।

চলেছি সবাই। ওরা হরিদ্বার দেখে যথাসময়ে ফিরে এসেছিল। হরিদ্বার নাকি আগের চেয়ে আরও বড়, আরও জম-জমাট হয়েছে। হবেই তো। কোন এক সময় হরিদ্বার ছিল শুধু তীর্থক্ষেত্র, ছিল তপোভূমি। সাধু সন্তরা এখানে আসতেন তপস্যা করতে। ভোলানন্দগিরি মহারাজ এখানেই তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আসতেন দলে দলে তীর্থযাত্রী—যেতেন গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী, কেদার-বদ্রী। তখনও কুম্ভমেলা হত এখানে কিন্তু ছিল না এত ধর্মশালা। যাত্রীরা রেললাইনের ধারে ছোট ছোট কুঁড়ে বানিয়ে বা তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটাতেন। মনে পড়ে ১৯৩৮-এর সেই ট্র্যাজেডীর কথা। তারিখটা ছিল ৭ই এপ্রিল। আগুন লেগে যাত্রীদের দু'শ কুটির ভস্মীভূত হয়েছিল।

সেই হরিদ্বার আর এই হরিদ্বার। সেদিনের সেই পর্ণকুটিরের জায়গায় আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে গগনচুম্বী প্রাসাদ। হরিদ্বার এখন আর শুধু তীর্থক্ষেত্র নয়, বানিজ্যকেন্দ্রও বটে। অদূর ভবিষ্যতে এখানে রাশিয়ার সহযোগিতায় স্থাপিত হবে হেভী ইলেকট্রিক্যাল্‌স্‌এর কারখানা। গঙ্গার অপর পারে গৌরী পর্বতশ্রেণী থেকে কুনাও বনবিশ্রাম গৃহ পর্যন্ত এই একশ মাইল বনভূমি-সংরক্ষিত হয়েছে, হাতি, হরিণ, বাঘ ও চিতা বাঘ প্রভৃতি বন্যজন্তুদের নিরাপদ বাসভূমি (Sanctuary) রূপে। কিছু দিনের মধ্যেই এটি একটি ন্যাশনাল পার্কে পরিণত হবে। তখন চণ্ডী পাহাড়ের মূল্য যাবে কমে। দেবী চণ্ডীকাকে দর্শন না করে তাঁর বাহনকে দর্শন করবে অনেকে।

অমূল্য সেন, ভানু ব্যানার্জী, নিতাই রায়, নিরাপদ মল্লিক, চঞ্চল মিত্র, বীরেন সরকার, শৈলেশ চক্রবর্তী, পিনাকী সিংহ, ডাঃ বিমল ঘোষাল, কমল গুহ, দেবীদাস দত্ত ও প্রাণেশ চক্রবর্তী

অমর সিং ও তার খচ্চর পড়ে যাবার পর অন্যান্য খচ্চরদের
ধরে ধরে ধস পার করা হচ্ছে।

উদ্ভিদবিজ্ঞানী উপেনবাবু প্রজাতি সংগ্রহ করছেন

ধাপে ধাপে ক্ষেত, পাহাড়ের গায়ে কি বিচিত্র আল্‌পনা।

নিথর নিস্পন্দ নিরুদ্বিগ্ন হেমকুণ্ড

গুরুদ্বার ও ঝুলা—গোবিন্দঘাট

জনহীন ঘাংরিয়ার বন্ধ বিপণি

দুর্গমগিরি নীলগিরি

নন্দন-কাননে ফুল সরিয়ে পথ চলা

পর্বতারোহণ শিক্ষা

"বলতেই সেই অতিকায় পালোয়ানটা জল থেকে উঠে এসে দু হাতে আমায় জড়িয়ে ধরল। আমার তো প্রাণপাখী খাঁচাছাড়া হবার যোগাড়। বলল..."

ওদিকে দেখছি অমূল্য বেশ জমিয়ে নিয়েছে। আমি কোথায় ভেবে চলেছিলাম হরিদ্বারের কথা, রায়ওয়ালার কথা। বলাই হয় নি, রায়ওয়ালায় গাড়ি দাঁড়িয়েছে। হরিদ্বার-ঋষিকেশ—দেরাদুন পথের জংশন এই স্টেশন। যখন ঋষিকেশের রেল লাইন হয় নি, তখন যাত্রীরা অনেকে এখানে নেমে পায়ে হেঁটে ঋষিকেশ যেতেন। ঋষিকেশের রেল লাইন হবার পর, রায়ওয়ালার মূল্য গিয়েছিল কমে। তাই বোধ করি সরকার রায়ওয়ালাকে একটি শিল্পনগরীতে পরিণত করে তুলছেন। রায়ওয়ালার কথা থাক। অমূল্য-কাহিনী শোনা যাক।

ওরা তখন হর-কি-প্যারীতে। সকলেই ছবি তোলার ফিকির খুঁজছে। হঠাৎ অমূল্য দেখে, পতিত-পাবনীর প্রবল স্রোতে এক জোড়া গোঁফ জলে ভাসছে। তার মনে পড়ে 'গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।' আর চেনা গোঁফ দেখতে পেয়েই অমূল্য চিৎকার করে ওঠে, "ঠিক হ্যায়।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চেনা গোঁফের অচেনা মালিক তার দৈত্যের মত দেহখানি নিয়ে জল থেকে ওপরে উঠে আসে। দু হাতে জড়িয়ে ধরে অমূল্যকে। বলে, "এক জাত্ কা মরদ্ দেখনেসে কিসকো না আনন্দ্ হোতা হ্যায়!"

অমূল্য হাফ ছেড়ে বাঁচে। এ তাহলে আনন্দ-বিগলিত আলিঙ্গন!

তারপর ঋষিকেশ। আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব সহ সাধুদি স্টেশনে এসেছেন। এখনও অনেক ফল মিষ্টি রয়েছে, তারই কিছু সাধুদিকে দিয়ে দিলাম। সাধুদি ভেবেছিলেন আমরা অন্ততঃ একটা দিন ঋষিকেশে থাকব। থাকব না শুনে মনে মনে একটু দুঃখ পেলেন। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলেন না। বারবার হাত দুখানি কপালে ছুঁইয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলেন—ওদের মনোবাসনা পূর্ণ করো। ওরা যেন সুস্থ শরীরে সবাই ঘরে ফিরে যায়।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই দেখি বাস দাঁড়িয়ে। বীরেন ও প্রাণেশ আমাদের জন্য বাস ঠিক করে রেখে গেছে। ব্রেক থেকে মালপত্র ছাড়িয়ে বাসে বোঝাই করা হল। সময় কম লাগল না। মাল তো কম নয়। সব মিলিয়ে প্রায় দু টন। আমরা কয়েকজন স্টেশনেই স্নান সেরে নিলাম। বাকি কজনকে নিয়ে চঞ্চল ঘাটে চলে গেল। ঠিক হল স্নান করে, বাজার সেরে, তারা পুরনো বাস

স্ট্যাণ্ডে ফিরে আসবে। সেখানে দেবীদাসের সুপরিচিত সুভাষ হোটেলে খাওয়া সেরে, আমরা যাত্রা করব।

সুভাষ হোটেলে পৌছনো গেল। গাড়ি থামতেই দেবীদাস গিয়ে হোটেলে ঢুকল। ডাক্তার, নিরাপদ, নিতাই ও শৈলেশদা গাড়িতে রইলেন। আমি ছুটলাম টুরিস্ট ও কালিকমলীর অফিসে—আমাদের বটানিস্টের খবর নিতে। তাঁর দেরাদুন থেকে এখানে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার কথা। খবর পেলাম তিনি এখনও এসে পৌছন নি। টুরিস্ট অফিসারকে বলে এলাম—আমরা রওনা হয়ে যাচ্ছি, জোশীমঠে তাঁর জন্য অপেক্ষা করব। ফিরে এলাম বাসে।

হোটেলের লোক এসে খবর দিল—খানা রেডি। হোটেলে ঢুকে দেখি, দেবীদাস বেশ সাজিয়ে বসেছে। কতক্ষণ আগে কে জানে! থলি বিভ্রাটের জন্যে শৈলেশদা বাসেই বসে রইলেন। আমরা তাঁর খাবার পাঠিয়ে দিলাম। ড্রাইভার জানিয়ে গেল বারোটায় শেষ গেট। আর মাত্র আধঘণ্টা বাকি। কিন্তু ওরা যে এখনও বাজার করে ফিরে এল না। আমরা তো খেয়ে নিই। ওরা না হয় পথে কোথাও খেয়ে নেবে। বারোটার গেট ধরতেই হবে। আমাদের খাওয়া হলে দেবীদাস বলে, "আপনারা যান আমি আসছি।"

ওরা বাজার সেরে ফিরে এল। বারোটা বাজতে আর বারো মিনিট বাকী। পিনাকী বলে, "বাস ছেড়ে দাও, আমরা ব্যাসীতে খেয়ে নেব।"

কিন্তু দেবীদাসের দেখা নেই। নিরাপদ ছুটল সুভাষ হোটেলে। বারোটা বাজতে আর মাত্র সাত মিনিট। ড্রাইভার ক্রমাগত অসহিষ্ণু ভাবে হর্ন দিচ্ছে। এই গেট ধরতে না পারলে একদিন এখানে বসে থাকতে হবে। গেট এখান থেকে মাইলখানেক।

নিরাপদকে একা ফিরতে দেখে আমরা উত্তেজিত। সমস্বরে চীৎকার করি, "সে কী, দেবীদাসের কি হল?"

হতাশ কণ্ঠে সে জবাব দেয়, "ড্রাইভার যত হর্ন দিচ্ছে, দেবীদাস তত ভাত নিচ্ছে।"

চার পাঁচ জনকে নিয়ে অমূল্য মরীয়া হয়ে ছুটল সুভাষ হোটেলে। দেবীদাসকে ধরে নিয়ে এল। বারোটার আর দু মিনিট বাকী।

না, আমাদের বারোটা বাজে নি। আমরা গেট পেলাম। গেট পেরিয়ে 'গঙ্গা মাঈ কি জয়' বলে ড্রাইভার নিশ্চিন্তে বাস ছেড়ে দিল। বাস ছুটল তীব্রগতিতে। নীলগিরি অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হল।

চড়াই উৎরাই অপ্রশস্ত পথ ধরে এগিয়ে চলল আমাদের বাস। বেলা প্রায় দুটোয় ব্যাসী পৌছলাম। অভুক্ত সহযাত্রীদের সঙ্গে দেবীদাস আবার খেতে বসে গেল। আমাদের তাড়ায় নাকি ঋষিকেশে তার খাওয়াই হয় নি।

বিকেল চারটেয় দেবপ্রয়াগ এলাম। দেবভূমি দেবপ্রয়াগ। হিমালয়ের পঞ্চ-প্রয়াগের শ্রেষ্ঠ প্রয়াগ। ভাগীরথী ও অলকানন্দার মিলনভূমি দেবপ্রয়াগ। আমরা ঋষিকেশ থেকে বিয়াল্লিশ মাইল এসেছি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আমরাও চিন্তান্বিত। সকালে রেডিওতে শুনেছি ওপরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। টিহরী যাবার রাস্তা পেরিয়েই লছমৌলীতে শুরু হল মুষল ধারায় বৃষ্টি। যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। একটু দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। ড্রাইভার খুব আস্তে আস্তে চালাচ্ছে। কীর্তিনগর পর্যন্ত এই ভাবেই চলতে হবে। রাস্তা ভাল নয়। কীর্তিনগর এখান থেকে দু মাইল।

সন্ধ্যার একটু আগে শ্রীনগরে পৌছলাম। এখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। বাস থেকে নেমে কোন রকমে টুরিস্ট হোমে ছুটে এলাম। বীরেনের অনুরোধে টুরিস্ট অফিসার শ্রী বি. ডি. নামগিয়াল আমাদের রাত্রিবাসের বেশ ভাল বন্দোবস্তই করে রেখেছেন। বসে রইলাম বৃষ্টি বন্ধের প্রতীক্ষায়।

গতবারে মানা অভিযাত্রীদের শ্রীনগর থেকেই হাঁটতে হয়েছিল। যথেষ্ট কুলি না পাওয়ায় তাদের নিজেদেরই মালপত্র বইতে হয়েছিল। ওরা সংখ্যায় ছিল কম, কিন্তু মালপত্র ছিল আমাদের প্রায় দ্বিগুণ। তাহলেও পথকষ্ট ওদের নিরুৎসাহ করতে পারে নি। আমাদেরও পারবে না। আমরাও প্রমাণ করব বাঙ্গালী ধৈর্যহীন নয়, কর্মবিমুখ নয়, কাপুরুষ নয়।

॥ ৪ ॥

প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। সারারাতই বৃষ্টি হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কবে থামবে কে জানে। তাই বলে আমরা থামি নি। আজ ২৫শে সেপ্টেম্বর—সকাল পাঁচটা পঁয়ত্রিশে আমাদের বাস শ্রীনগর থেকে ছেড়েছে। বাস চলছে বটে তবে রাস্তা রীতিমত ভয়াবহ। তাহলেও পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। উষার প্রথম আলোয় আকাশ আর পাহাড় আলাদা হয়ে গেল। অপরাজিতা, কৃষ্ণকলি ও সন্ধ্যামালতীর দল আত্মপ্রকাশ করল। মাঝে মাঝে ক্যাকটাসের বন, এক একটা

যেন ঝাড়লণ্ঠন। মেঘে ঢাকা পাহাড়—যেন ওড়না জড়ানো। গাছে ছাওয়া পাহাড়—যেন কোঁকড়ানো কালো কেশে মুখখানি ঢাকা।

রুদ্রপ্রয়াগের কাছে এসে বাস থামাতে হল। রাস্তা বন্ধ। ধস নেমেছে। পি. ডবলু. ডি-র লোক রাস্তা ঠিক করছে। আমরা নেমে তাদের সাহায্য করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তা মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল। ড্রাইভার ভগৎরাম খালি বাস নিয়ে এল এপারে। আমরা হেঁটে এসে বাসে উঠলাম।

অবশেষে রুদ্রপ্রয়াগ। রুদ্রপ্রধান-রুদ্রপ্রয়াগ। হিমালয়ের পঞ্চপ্রয়াগের দ্বিতীয় প্রয়াগ। অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর মিলনভূমি, দেবর্ষি নারদের তপোভূমি রুদ্রপ্রয়াগ। জিম্ করবেটের রুদ্রপ্রয়াগ।

জিম্ করবেটের স্বর্গীয় আত্মা যদি আজ এখানে আসেন, তা হলে নিঃসন্দেহে বিস্মিত হবেন। সে রুদ্রপ্রয়াগ আর নেই। সেই দড়ির ঝোলাটি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সেখানে এখন লোহার পুল।

রুদ্রপ্রয়াগ এখন রীতিমত শহর। এখানে তৈরী হচ্ছে হাইডেল পাওয়ার স্টেশন। তবে এখনও কেদার যাত্রীদের নামতে হয় রুদ্রপ্রয়াগে। অলকানন্দার পুল পেরিয়ে ওপার গিয়ে কুণ্ডচটির বাস ধরতে হয়। কিন্তু এই পায়ে চলা পুলের ওপরে বাস যাতায়াতের জন্য বড় পুল তৈরী করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে ঋষিকেশ থেকে একই বাসে পৌঁছনো যাবে কুণ্ডচটি কিম্বা তারও আগে।

আমরা ঋষিকেশ থেকে অষ্টআশী মাইল এসেছি। চা খেয়ে বাসে ওঠা গেল। সাড়ে আটটা বাজে। একটু বাদেই গেট খুলল। বাস চলল। কোন্ ফাঁকে আর একখানা বাস আমাদের আগে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এখন ধুলো ওড়াচ্ছে আর আমরা তাই খাচ্ছি। বাধ্য হয়ে আমরা আরও পেছিয়ে পড়লাম। তাহলেও আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু আর বুঝি এগনো যায় না। আগের সেই বাসটি বিকল হয়েছে। বিকল বলা ভুল। অচল হয়েছে। কদিন ধরেই এ অঞ্চলে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। কর্দমাক্ত পথে আগের সেই বাসের চাকা বসে গেছে। পথ বন্ধ।

আমরাও হাত লাগালাম। বহু কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত চাকা তোলা গেল। পাথর দিয়ে রাস্তা মেরামত করা হল। বাস সেই জায়গাটার উপর দিয়ে কোনমতে এপারে এল। দু ঘণ্টা বাদে আবার বাস চলল।

গৌচরে পৌঁছতে এগারোটা বেজে গেল। গৌচর রুদ্রপ্রয়াগ থেকে চোদ্দ মাইল। অল্পের জন্য আমরা গেট ফেল করলাম। পিছনের মিলিটারী ট্রাকটি

কিন্তু গেট পেল। পেল বলা ভুল। গেট খুলে দেওয়া হল। সীমান্তের পথ। মিলিটারীর বেলায় গেটের নিয়ম খাটে না। খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের বেলাতেই বা খাটবে না কেন? আমাদের বাসও তো সাধারণ যাত্রীবাহী নয়। কথাটা প্রথম খেয়াল হয় ভাস্বর। চঞ্চলও সমর্থন করে তাকে। বলে, "চলো, গেটম্যানের কাছে যাওয়া যাক।"

সব শুনে গেটম্যান বলে তার কোন আপত্তি নেই, যদি আমরা চামোলীতে ফোন করে ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে পারি।

"ফোন পাব কোথায়?"

"কেন, ঐ তো পোস্টাফিস।"

অনেক চেষ্টা করেও পোস্টমাস্টার চামোলীর লাইন পেলেন না। কোথাও হয়তো ধস নেমে টেলিফোনের তার ছিঁড়ে গেছে। ওপরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে এলাম। উপায় নেই। সাড়ে চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। গেট খুলবে সাড়ে তিনটায়। দু ঘণ্টার জন্মে বলতে গেলে সারা দিনটাই মাটি হল।

পিনাকী বলে, "এখানেই স্নান খাওয়া সেরে নিতে হবে।"

ভাস্বু বলে, "নিউজ-রিপোর্টটাও ডেসমণ্ডকে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার।"

স্টেট্‌স্‌ম্যানের সহকারী সম্পাদক ও বিখ্যাত পর্বতারোহী শ্রীডেস্‌মণ্ড ডয়েগ আমাদের এই অভিযানের প্রধান পরামর্শদাতা। স্টেট্‌স্‌ম্যান দু মাসের জন্ম এই অভিযানের ইংরেজী সংবাদ-স্বত্ব ক্রয় করেছেন। কিন্তু রিপোর্ট ও ফটো পাঠাবার দায়িত্ব আমরা নিজেরাই নিয়েছি। তাঁদের তরফ থেকে কোন সাংবাদিক বা ফটোগ্রাফার আমাদের সঙ্গে আসেন নি। এই অভিযান কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থার অর্থানুকুল্যে আয়োজিত হয় নি। সংবাদ ও ছবির বিনিময়ে স্টেট্‌স্‌ম্যানের কাছ থেকে কিছু অর্থ আমরা পেয়েছি। কিছু আমরা নিজেরাই দিয়েছি। অধিকাংশ অর্থ, ওষুধ এবং কিছু কিছু রসদ ও সরঞ্জাম বিভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আমাদের দান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকারও আমাদের অর্থ সাহায্য করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই, আমরা প্রয়োজনীয় অর্থ ও সামগ্রী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি—তথা জনসাধারণের সাহায্যে সংগঠিত ভারতের এই প্রথম পর্বতাভিযান সম্ভব হয়েছে।

"মহারাজ" নিরাপদ উত্তেজিত, "দেখে যান অমূল্যর কীর্তি।"

"কেন কী হল ?"

"বাধার পর বাধা। বাসে জোশীমঠ পৌছুতে পারব কিনা ঠিক নেই। আর সে কিনা লিডার হয়ে ঐ পাথরখানার আড়ালে গিয়ে চিঠি লিখতে বসেছে!"

"ওঃ এই কথা।"

"কেন ? এটাই কি কিছু কম হল ? কাকে লিখছে জানেন ?"

"কাকে ?"

"শবরীকে।"

"সে তো সেই ত্রেতা যুগের ব্যাপার।"

"না মহারাজ ত্রেতা নয় কলি, ঘোর কলি। ত্রেতা ও দ্বাপরের ঐ নামগুলো ফিরে এসেছে এযুগে। এ শবরী সে শবরী নয়।"

"তবে কে ?"

"কে আবার ? লিডারের কিছু হবে হয়তো।"

"বটেই তো। কোথায় বাড়ি ঘর ছেড়ে এসেছে। বাড়িতে কুশলসংবাদ দেবে, তা নয়। কে কবে কি হবে বসে বসে তার কাছে চিঠি লেখা। চলো অমূল্যর চিঠি সেন্সার করে আসি।"

পাথরখানির পাশে পৌছতেই অর্ধশায়িত অমূল্য সচকিত হয়ে উঠে বসে, "কি ব্যাপার মহারাজ ?"

"দেখি কাকে কি লিখছ।" অমূল্য কাঁচুমাচু। অর্ধসমাপ্ত চিঠিখানা নিরাপদ কেড়ে নেয় ওর হাত থেকে। কিন্তু চিঠিতে নজর বুলিয়েই সে যেন কেমন হয়ে যায়। নিরাপদ চলে যাবার পর অমূল্যর সুইট-শবরী স্নেহের-সর্বেশ্বর হয়েছে। অমূল্যকে জিগ্যেস করি, "কিন্তু আজ তো ভাই পয়লা এপ্রিল নয়।"

চঞ্চল, পিনাকী ও নিতাই এসে হাজির। পিনাকী বলে, "তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নাও। রান্না হয়ে এল।"

কখনই বা হোটেলে অর্ডার দেওয়া হল, আর কখনই বা রান্না চড়ল ? তবে পিনাকী যখন বলছে, তখন স্নান করে এলেই যে খাওয়া পাওয়া যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাসে ফিরে এলাম। কেউ কেউ কলতলায় ছুটল। আমরা জামা কাপড় তেল সাবান নিয়ে এগিয়ে চলি নদীর দিকে—অলকানন্দার তীরে।

ওপরে বৃষ্টি হলেও এখানে এখনও বৃষ্টি নামে নি। তবে সূর্য মাঝে মাঝেই

মেঘের পিছনে লুকিয়ে পড়ছে। ভ্রমণে মেঘলা আবহাওয়া সব সময়েই মনোরম। তাই ভাল লাগছে পথ চলতে। চলেছি গৌচরের সুদীর্ঘ সমতল প্রান্তর পেরিয়ে, হ্যাঁ সমতল বৈকি। একেবারে বাংলা দেশের মত সমতল। তবে উচ্চতা (৩০০০ ফুট)। গৌচর একটি উপত্যকা—চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে মোটর পথ। পথের ধারে সারি সারি দোকান, ধর্মশালা, নর্মাল-স্কুল, মেয়েদের জুনিয়ার হাইস্কুল, আয়ুর্বেদিক ঔষধালয়, ডাকঘর ও গান্ধী আশ্রম।

বৃটিশ আমলে গৌচর ছিল বিমানক্ষেত্র। তিব্বত রক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত। ভারতীয় বাহিনী তিব্বত ছেড়ে চলে আসার পর আমাদের কাছে সেই বিমানক্ষেত্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। সেদিনের বিমানক্ষেত্র আজ গোচারণের ভূমিতে রূপান্তরিত। আশ্চর্য, আজও গৌচর এবং অগস্ত্যমুনির সমতল প্রান্তরকে প্রয়োজনে লাগানো হচ্ছে না।

॥ ৫ ॥

বাস ছেড়েছে গৌচর থেকে। ইতিমধ্যে নেমেছে বৃষ্টি। এতক্ষণ টিপটিপ করে পড়ছিল। এবারে জোরে শুরু হয়েছে। যতই এগোচ্ছি ততই বেশী ধস চোখে পড়ছে। রাস্তার যা অবস্থা তাতে বাসে কতদূর যাওয়া যাবে, ড্রাইভার ভগৎ-রামও নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। একটু দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। ভগৎরাম মাঝে মাঝে বাস থামিয়ে চুপচাপ বসে থাকছে। বৃষ্টি একটু কমলে আবার আস্তে আস্তে চালাচ্ছে।

এমনি ভাবে বলতে গেলে প্রাণ হাতে নিয়ে আমরা পৌঁছেছি কর্ণপ্রয়াগ। কর্ণগঙ্গা ও অলকানন্দার মিলনভূমি, দাতা কর্ণের তপোভূমি, কর্ণধন্য-কর্ণপ্রয়াগ। হিমালয়ের পঞ্চপ্রয়াগের তৃতীয় প্রয়াগ। আমরা ঋষিকেশ থেকে একশ ন মাইল এসেছি। গৌচর থেকে ছ মাইল। এই ছ মাইল পথ বাসে আসতে দেড়ঘণ্টা লেগেছে।

এখন পাঁচটা বাজে। আর একটু দেরি হলে গেট পাওয়া যেত না। গেটম্যান গেট খুলে দিল, কিন্তু পথের খবর কিছুই দিতে পারল না। আমরা এগিয়ে যাওয়াই সাব্যস্ত করলাম। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে, কর্ণশিলার উদ্দেশে প্রণাম করে, আবার রওনা হলাম।

বৃষ্টি থেমে গেছে। স্বভাবতঃই আমরা উৎফুল্ল। বাসও অপেক্ষাকৃত জোরে চলেছে লংগাসু গ্রামের মধ্য দিয়ে। শান্ত সমাহিত সুন্দর একখানি গ্রাম। পথ জনশূন্য। বাদলা দিনে কেউ আর বাইরে বেরোয় নি। কেনই বা বেরুবে। ওদের ঘর আছে, ঘরনী আছে। ঘরছাড়া ডাক্তার বোধকরি তার ছেড়ে-আসা ঘরকে উদ্দেশ করে গান ধরেছে, 'এমন দিনে তারে বলা যায়…'।

না। ঐ তো একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। ওরও কি ঘর নেই। বাস থামাতে বলছে কেন? যে কারণেই বলুক, ভগৎরাম ব্রেকে চাপ দেয়। বাস থামে। লোকটি এগিয়ে আসে। বলে, "সামনেই রাস্তা ধসে গেছে। আপনারা নন্দপ্রয়াগ পৌঁছুতে পারবেন না। তার চেয়ে আজ রাতটা এখানেই থেকে যান। গ্রামের স্কুলে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এগিয়ে গেলে পথে রাত কাটাতে হবে।"

"কাটাতে হয় কাটাব। পথের নেশাতেই তো আমরা পথে বেরিয়েছি ভাই।" শৈলেশদা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ভানু বলে, "সঙ্গে তাঁবু রয়েছে ভাবনা কিসের?"

"যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। আমরা এগিয়ে যাব।" লিডার ঘোষণা করে। অতএব ভগৎরাম গাড়ি ছাড়ে। গাঁয়ের লোকটি পথ ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আমাদের চলন্ত বাসের দিকে।

গরীবের কথা বাসি হলে ফলে। গোঁয়ার্তুমীর ফল যে এমন হাতে হাতে পাব তা তখন বুঝতে পারি নি। লংগাসু ছাড়িয়েই শিউরে উঠলাম। এ যেন বর্ষাকালের পূর্ব-বঙ্গের মেটো পথ। মাঝে মাঝেই বাসের চাকা বসে যাচ্ছে। কখনও আমরা বাসে চড়ছি, কখনও বাস আমাদের ওপর চড়ছে। আমরা বাস থেকে নেমে ঠেলে-ঠুলে রথচক্রকে কর্দমমুক্ত করছি। কিন্তু এত করেও বেশী দূর এগনো গেল না। সঙ্কীর্ণ পথের একটা বিরাট অংশ সম্পূর্ণ ধসে গেছে।

পাশের পাহাড় থেকে অনবরত পাথর গড়িয়ে পড়ছে। দু একখানি আমাদের বাসের ছাদেও পড়ছে। ওদের আকৃতি আর একটু বড় হলে কি হবে বলা যায় না। কিন্তু সেকথা ভেবে অযথা শঙ্কিত হই কেন? প্রকৃতির হাতে বিনাশর্তে আত্মসমর্পন করেছি। ভয়-ভাবনা অলকানন্দায় বিসর্জন দিয়ে অলকানন্দার মতই উচ্ছল হয়ে উঠতে হবে। সহসা দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে অমূল্য আবৃত্তি শুরু করে—

'.........When life is dull,
Or when my heart is full
Because my dreams have frowned,
I wander up the rills,
To stones and tarns and hills—
I go there to be crowned.'

অমূল্য থামে। আমাদের মুকুট লোভী মন ভেসে চলে, অলকানন্দা পেরিয়ে নন্দনকানন ছাড়িয়ে—নীলগিরি শিখরে। ভানু কিন্তু আমাদের মত চুপ করে থাকে না। সহ-নেতা নেতার মতোই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে—

'That height and crown,
From whence you may look down
Upon trimuphed chance !'

পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড় ছাড়া কিছুই নেই এখানে। আছে, কিন্তু এখানে নয়, অনেক নীচে, অলকানন্দার তীরে। ছোট্ট একফালি সমতল প্রান্তর। কয়েকটি কুটির আর কিছু চাষের জমি। গাড়োয়ালী গ্রাম—হরকোটি। গ্রামের সীমা থেকে উঠে এসেছে খাড়া পাহাড়। সেই পাহাড় কেটে তৈরী হয়েছে পথ—মহাপ্রস্থানের পথ—আমাদের নীলগিরির পথ।

কোয়ার্টার মাস্টার পিনাকী ঘোষণা করে, "ব্যস—আজ রাতের ধর্মশালা এই ভগৎরামের বাস, আর মেনু শুকনো চিঁড়ে।"

"চিঁড়ে খেয়ে রাত কাটাতে হবে?" দেবীদাসের কণ্ঠে বিদ্রোহ।

"নান্যেব নান্যেব গতিরন্যথা।" চঞ্চল বলে।

"কেন ঐ গাঁয়ে গিয়ে দুধ আনা যায় না?"

বলা হয় নি—পিনাকী শৈলেশদা, ও ডাক্তার, দেবীদাস চা খায় না। পিনাকীর জল হলেই চলে। শৈলেশদা ও ডাক্তার গুঁড়ো দুধ পেলেই খুশী। কিন্তু দেবীদাসের নাকি খাঁটি ঘন ভয়সা দুধ না হলে অসুবিধে হয়।

ভানু বলে, "যাওয়া যায় না তা নয়, তবে যেতে যেতেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে। গেলে হয়তো দুধ খেতে পারবেন। কিন্তু খেয়ে দেয়ে ফিরে আসতে পারবেন কি?"

"কেন?"

"জিম্ করবেটের সেই ম্যান ইটিং লেপার্ডটার কথা মনে আছে তো? সে

যদিও কর্ণপ্রয়াগের এ দিকে আসত না কিন্তু তার আত্মীয় স্বজন নাকি প্রতিশোধের নেশায় মরীয়া হয়ে রাতের আঁধারে এ সব অঞ্চলেও ঘুরে বেড়ায়।"

"দরকার নেই মশাই গাঁয়ে গিয়ে। তার চেয়ে আসুন রান্নার ব্যবস্থা করা যাক।"

"কোথায় ?" চঞ্চল জিজ্ঞেস করে।

"কেন এই রাস্তার ওপর। দরকার হলে তাঁবু ফেলে।"

"বেশ, চেষ্টা করে দেখুন।" ম্যানেজার অনুমতি দেয়। শেরপাদের নিয়ে দেবীদাস নেমে পড়ে বাস থেকে।

আরও পাঁচখানি বাস অচল হয়ে আছে এখানে এসে। প্রায় সবকটিই বদ্রীযাত্রীতে বোঝাই। বুড়ো বুড়ীর সংখ্যাই বেশী। কিছু ছোট ছোট ছেলেমেয়েও আছে।

"ইস এরা না খেয়ে থাকবে কেমন করে ?" শৈলেশদা সবিশেষ চিন্তিত।

"কেন বুড়োদেরই কি কষ্ট কিছু কম হবে ?" ডাক্তার গম্ভীর কণ্ঠে বলে। শৈলেশদা আড়চোখে তাকে একবার দেখে নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকেন।

"বুড়োদের কথা ভাবছেন কেন ? দেখছেন না তারা চিঁড়ে ও ছাতুর পোঁটলা খুলে বসেছে। বরং বাচ্চাদের কিছু বিস্কুট দেওয়া যেতে পারে।" পিনাকীও দেখছি শৈলেশদার দলে।

"আমাদের অসুবিধো হবে না তো ?" শৈলেশদা বিচলিত।

"না অসুবিধের কি আছে ? আমাদের যেমন করে হোক চলে যাবে।"

পিনাকী শৈলেশদাকে অভয় দেয়, "এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া ঠিক নয়। কি বলো অমূল্য ?"

কিছুক্ষণ বাদেই সদলবলে দেবীদাস ফিরে এল। অনেকটা ওয়াটারলুর পর নেপোলিয়নের মত। "নাঃ। রান্নার জায়গা খুঁজে পেলাম না। পাহাড়ী পথে এত কাদা।"

পিনাকী চিঁড়ে ও গুড় পরিবেশন করল। দই নেই, জল নেই, শুকনো চিঁড়ে। খেয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। শুরু হল ভ্যারাইটি পারফর্ম্যান্স। কেউ গান, কেউ আবৃত্তি আর ডাক্তারের গীতা পাঠ।

আঁধার নেমে এসেছে এই পাহাড়ী পথে, ঐ হরকোটি গাঁয়ে। আর অলকানন্দার ওপারে। শাল ও দেওদারে ছাওয়া কৃষ্ণ কালো পাহাড়ে পাহাড়ে।

আঁধার ঘনিয়েছে সবার মনে। কেমন করে ঝড় বাদলের মধ্যে রাত কাটাব এই অজানা জঙ্গলাকীর্ণ পথে? অধিকাংশ যাত্রীরাই সশঙ্কিত। তা হলেও উপায় নেই। অপেক্ষা করতে হবে উষার। আশা করতে হবে সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতের। কিন্তু কি ভাবে এই কাল-রাত্রি কাটানো যায়? ঠিক হল—ভেতরে আলো জ্বেলে, দরজা জানলা বন্ধ করে, সবাই বাসের মধ্যে বসে থাকবে। কেউ একা নামবে না।

গান থেমেছে। আবৃত্তি শেষ হয়ে গেছে। গীতা পাঠও সমাপ্ত হয়েছে। শুধু চলেছে অলকানন্দার ক্রুদ্ধ গর্জন আর নীলগিরি অভিযাত্রীদের নাসিকা গর্জন। শুনছি আর ভাবছি—সেদিনের কথা, যেদিন বাস ছিল না। এই পথও ছিল না। অথচ কত শত যাত্রী মহাপ্রস্থানের পথ পাড়ি দিতেন। শীতে কষ্টে, ক্ষুধার তাড়নায়, রোগে ভুগে, বাঘের পেটে গিয়ে, অনেকের ভাগ্যেই বদ্রীদর্শন হয়ে উঠত না। যাঁরা ভাগ্যবান তাঁরাও সবাই ঘরে ফিরে আসতে পারতেন না। কিন্তু পুণ্যার্থীদের প্রবাহে ভাঁটা পড়ে নি। আর আজ একটা রাত বাসে কাটাতে হবে বলে সবাই বিরক্ত, বিচলিত ও ভীত। কারণ অনেকেই এসেছেন ঘোরার নেশায়। এসেছেন অবসর বিনোদন করতে। হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে। এমন কি যাঁরা পুণ্যসঞ্চয় করতে এসেছেন, তাঁরাও সবাই একাগ্রচিত্ত নন।

'পিণি তু সরাব সোয়া, পিনি তু সরাব।
দুনিয়া দোরঙ্গে হোগী মৌসুম খারাপ॥
এ গিরি তু বসন্ত কি ফুল কলা নীল পিলা।'

এই সঘন-গহণ রাতে, এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে, কারা আবার বসন্তের জয়গান গাইছে! কিন্তু কে এসে খবর দেবে আমাকে? ভগৎরাম ও তার সহকারীকেও দেখছি না। বাইরে বেরুব কি? সবাই যে নিষেধ করেছে। করুকগে, কি আর হবে? বৃষ্টির শব্দও পাচ্ছি না। এতক্ষণে হয়তো প্রকৃতি তার ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছে আর আমি প্রাণের ভয়ে বাসের মধ্যে বসে আছি? এতই যদি ভয়, তবে কেন এলাম এই দুর্গম পথে?

ট্রানজিস্টার কাঁধে ঝুলিয়ে একটা টর্চ হাতে নিয়ে বাস থেকে নেমে পড়ি। অন্তহীন কালো আকাশ তারায় ছেয়ে গেছে। আমার মনের আকাশেও আশার আলো জ্বলে ওঠে। কাল হয়তো আর বৃষ্টি নামবে না। শুধু আকাশে নয়, ঐ তো মাটিতেও আলো রয়েছে। আলো জ্বলছে হরকোটির গাঁয়ে। হয়তো বন্য-জন্তুদের হাত থেকে রক্ষা পেতে গ্রামবাসীরা আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। আকাশের

তারা আর মাটির আগুন, আশার আলো আর জীবনের আলো। দুয়ে মিলে এক হয়ে গেছে। আরও একটি আলো দেখতে পাচ্ছি। আলো নয়, আঁকা-বাঁকা একটি রূপোলী রেখা—উত্তাল উদ্দাম অলকানন্দা।

ওখানে আবার কান্না? দেখা যাক না কি ব্যাপার। এগিয়ে চলি। জনকয়েক ড্রাইভার ও তাদের সহকারীরা পাথর দিয়ে রাস্তা প্রশস্ততর করছে, যাতে কোন-রকমে একখানি বাস ঘোরানো যায়। এই ছখানি বাসকে এখান থেকেই ঋষিকেশ ফিরে যেতে হবে। তাই শীত, বর্ষা ও নিদ্রাকে উপেক্ষা করে এরা রাস্তা চওড়া করছে। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামরত মেহনতী মানুষের দল। এরাই তো বিশ্বকর্মা।

'শ্রাবনী কু গাজ সোয়া, শ্রাবনী কু গাজ।
অন্যাঙ্ক মুখরী তেরী কেঁওয়ে হোলা আজ॥
এ গিরি তু বসন্ত কি ফুল ফলা নীল পিলা।'

গান এখনও চলেছে। এগিয়ে চলি। হ্যাঁ, যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই। বাকি সব ড্রাইভার ও তাদের সহকারীরা তুরিয়ানন্দ হয়ে টলতে টলতে সঙ্গীত-সরস্বতীর আরাধনায় মত্ত। একটু আগে যাদের দেখে এলাম, এরাও তাদেরই মত মেহনতী মানুষ। ওরা মর্তের পথ প্রশস্ত করছে,—আর এরা…?

থাক। এখানে দাঁড়িয়ে কাজ নেই। পাছে দেখতে হয় যে আমাদের শান্তশিষ্ট নম্র-ভদ্র ভগৎরামও এদের দলে। তাই এগিয়ে চলি। বাঃ। এ বাসের যাত্রীরাই দেখছি সত্যিকারের ধার্মিক। আলোচনা চলেছে, 'যাহার চিত্তসংযম হইয়াছে, যাহার হস্তপদাদি সংযত আছে, অর্থাৎ যাজ্ঞা, অবৈধ দানগ্রহণ, কুৎসিত স্থানে গমন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপরিমিত আহার, ইন্দ্রিয় সেবন, ক্রোধাদি রিপুর অপব্যবহার কার্যাদি হইতে যিনি বিরত আছেন, যিনি তীর্থমাহাত্ম্যাদি অবগত আছেন, তিনিই তীর্থ-ফললাভের সম্পূর্ণ অধিকারী।' এঁরাও পথ প্রশস্ত করছেন—স্বর্গের পথ।

এগিয়ে চলি। শেষ বাসখানির পাশে পৌছে থমকে দাঁড়াই। ভেতর থেকে শিশুর কান্না ভেসে আসছে। ভেসে আসছে নারীকণ্ঠের ঘুমপাড়ানী গান। ক্লান্ত সন্তানকে শান্ত করতে চাইছেন শ্রান্তিহীনা জননী। জননী নয় বিষ্ণু। কি হবে স্বর্গে গিয়ে?

চলে আসি ধসের পাশে। পাহাড়ের গা থেকে ধস নেমেছে। রাস্তার একটা বিরাট অংশ ধসে গিয়ে অলকানন্দায় বিলীন হয়েছে। ধস নয়, সংহাররূপী রুদ্র।

আশে পাশে কোথাও কোন প্রাণের সাড়া নেই। সময়ের স্পন্দনও যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। কড়-কড়-কড়াৎ। ভয় পেয়ে পেছিয়ে আসি। না, এখানে নয়। ঐ পাহাড়ের গা থেকে আর একখানি পাথর ধসে পড়ল অলকানন্দায়। ঘড়ির দিকে তাকাই। রাত দুটো বেজে গেছে। এখনও ভোর হতে অনেক দেরি। একটু বসা যাক না এখানে। ধসের পাশে একখানি পাথরে বসে পড়ি। ট্রানজিস্টারটা খুলি। কাঁটা ঘোরাতেই—

'Of life immense in passion, pulse, and power,
Cheerful, for freest action form'd under the laws divine,
The Modern Man I sing.

পাশ্চাত্য সঙ্গীত। ইউরোপে এখন সবে সন্ধ্যে। ওরা ঐ অলকানন্দার মতই উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

আকাশের তারা আর মাটির আগুন, রুদ্রের তাণ্ডব আর বিশ্বকর্মা মানুষ, স্নেহময়ী জননী আর মাতাল ড্রাইভার, স্বর্গলোভী মানুষের শাস্ত্রালোচনা ও মর্তভোগী মানুষের রক্-এন্-রোল। বিচিত্র এই পৃথিবী।

॥ ৬ ॥

"মহারাজ। ম্যানেজ করেছি।"

চোখ মেলে তাকাই। দেবীদাস আমাকে ডাকছে। রাত ফুরিয়েছে—জীবনের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার রাত। আজ ২৬শে সেপ্টেম্বর। শেষ রাতে সেই ধসের পাশ থেকে উঠে এসে, ড্রাইভারের পাশের সীটে আশ্রয় নিয়েছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। দেবীদাসের ডাকে ঘুম ভাঙল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠতে পারি না। পা দুটো স্টিয়ারিং হুইলের ভেতর থেকে বের করে আনতে সময় লাগে। আমার সীট, ভগৎরামের সীট, হ্যাণ্ডব্রেক ও স্টিয়ারিং জুড়ে আমার সুখ-শয্যা। আশ্চর্য ব্যাপার। আমি তো বসে ছিলাম আমার সীটে। কখন এরকম হল? দেবীদাস তাড়া লাগায়, "তাড়াতাড়ি নামুন। জুড়িয়ে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে ম্যানেজ করেছি।"

"কী ম্যানেজ করেছেন?"

"এই যে।" ওর হাতে আধ মগ দুধ ও একখানি বিরাট দেশী বিস্কুট।

"একি মেড্ ইন্ হরকোটি ?"

"না। মেড্ ইন্ শুনলা।"

"সে আবার কোথায় ?"

"কাছেই। ধসের পরে বাঁকটা পেরিয়েই ছোট একটি গ্রাম। সারা রাতই খিদের জ্বালায় ছটফট করেছি। তাই ভোর হতেই বেরিয়ে পড়লাম। দেখি শুনলা ইন্সপেক্শান বাংলোর নীচেই একটি দোকান। সে যাই হোক। ওপারে বাস ঠিক করা হয়েছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। মাল বইতে হবে।"

কাল সন্ধ্যায় নেহাত বাঘের ভয়ে হরকোটি নামতে পারে নি। কিন্তু আজ সকালে ঠিক দুধ জোগাড় করে এনেছে দুগ্ধ-প্রিয় দেবীদাস দত্ত। তবে একার জন্যে নয়।

দুধ খেয়েই মাল বইতে শুরু করলাম। শেরপারা ইতিমধ্যে আইস-এক্স দিয়ে ধসের ওপরে একটি পায়ে চলা পথ তৈরী করে ফেলেছে। সেই সঙ্কীর্ণ পথরেখার ওপর দিয়ে মাল ঘাড়ে নিয়ে অতি সন্তর্পণে যাওয়া আসা করতে হচ্ছে আমাদের। শুধু আমরা নই, বদ্রীগামী ও বদ্রী-ফেরৎ যাত্রীদেরও তাই করতে হচ্ছে। এ ধস মেরামত করতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে। এ কদিন এভাবেই মহাপ্রস্থানের পথ চালু থাকবে।

নতুন বাসে মাল বোঝাই করা হল। কাল সন্ধ্যায় মাত্র দুখানি বাস এসেছিল ওপর থেকে। কিন্তু আজ সকালেও দুখানি বাস এসে গেছে। আরও নাকি আসছে। বাস বদল হল। বদল হল ভগৎরাম। শান্ত-শিষ্ট নম্র-ভদ্র ভগৎরাম। সেও আমাদের সঙ্গে মাল বয়েছে। কোন নিষেধ শোনে নি।

বেলা নটায় বাস ছাড়ল। জোর করেই ছাড়া হল। ড্রাইভার রাজী হচ্ছিল না। বেলা এগারোটায় নাকি নন্দপ্রয়াগের গেট। আগে পৌছলে দু শ টাকা ফাইন। সেই ঝুঁকি নিয়েই আমরা বাস ছাড়লাম। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অনিদ্রায় সকলেই অবসন্ন। তাছাড়া আবহাওয়াকেও বিশ্বাস নেই। সকাল থেকে বৃষ্টি নামে নি বটে কিন্তু রোদও ওঠে নি। আকাশ থমথমে।

ভগৎরাম এখনও দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। হাত নাড়ছে। হাতে আমাদের দেওয়া সার্টিফিকেট। পরম সমাদরে আঁকড়ে ধরে আছে। বিপজ্জনক পথ পেরিয়ে যাদের নিয়ে এসেছে এতদূর, তাদের এই সামান্য স্বীকৃতিটুকু ওর কাছে এত মূল্যবান কেন কে জানে ? ওর বড় আশা ছিল, আমাদের পৌছে

দেবে জোশীমঠ। আশাহত ভগৎরামের চোখের জল আমাদের চোখকেও সজল করে তুলেছে।

আবার বৃষ্টি নামল। মুষলধারে নয়, টিপটিপ করে। কর্দমাক্ত পথকে দুর্গমতর করে তুলছে। তাহলেও বাস এগিয়ে চলেছে ক্রুদ্ধ গর্জনে, ভয়ঙ্করী প্রকৃতির সকল বাধাকে উপেক্ষা করে। আমরা এগিয়ে চলেছি 'নীল দুর্গমের' দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নন্দপ্রয়াগ পৌঁছলাম। আমরা ঋষিকেশ থেকে একুশ বাইশ মাইল এসেছি। এসেছি মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গম, মহর্ষি কণ্বের ধ্যানে ধন্য, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলনতীর্থ নন্দরাজার নন্দপ্রয়াগে। কিন্তু এখন পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি কোন কৌতূহল নেই, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতিও কোন আকর্ষণ নেই। চোখে ঘুম, পেটে খিদে, মনে ভয়। শুধু পথ ভয়াবহ বলে নয়, নতুন একটি ভয় ঢুকেছে মনে। দু শ টাকা জরিমানার ভয়। ড্রাইভারের নিষেধ না শুনে, গেটের নিয়ম না মেনে, এগারোটার জায়গায় সাড়ে নটার সময় বাস নিয়ে এসেছি নন্দপ্রয়াগ। কাজটা যে ঠিক নয়, তা তখনও মনে ছিল। তবু ক্ষুৎপিপাসায় কাতর দেহের আবেদনে মন মানা শোনে নি। দূর থেকে নন্দপ্রয়াগকে দেখে উল্লসিতও হয়েছিলাম। নন্দপ্রয়াগে জল পাব, চা পাব, খাবার পাব। কিন্তু যতই এগিয়েছি, ততই সেই উল্লাসে ভাঁটা পড়েছে। দু শ টাকা জরিমানার ভয় আমাদের সবার মনকে ভারী করে তুলেছে।

বাস থামল, ইঞ্জিনের শব্দ বন্ধ হল। আমরাও শব্দহীন। এত আশার নন্দপ্রয়াগে এসেও কেউ বাস থেকে নামছে না। শুধু শৈলেশদা একা গজগজ করছেন, "যত সব গোঁয়ারের পাল্লায় পড়া গেছে। এক ঘণ্টার জন্যে দু শ টাকা।" শৈলেশদা টাকা গুনছেন। জরিমানার টাকাটা পকেটে পুরে তিনি আবার বল্লেন, "ওঠো আর বসে থেকে কি হবে? গোঁয়ার্তুমীর খেসারত দিয়ে, কিছু গিলে, রওনা হওয়া যাক।"

পুলিশটি একটু দূরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে। তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদের দেখছে। কি দেখছ? তোমার টাকা রেডী।

ড্রাইভারের জিম্মায় গাড়িতে সব মালপত্র রেখে, খালি হাতে একটা চায়ের দোকানের দিকে এগিয়ে চলি। শৈলেশদা চলেছেন সবার আগে। তবে খালি হাতে নয়। সেই সাদা থলিটি তাঁর হাতে রয়েছে বৈকি। শৈলেশদা আছেন অথচ তাঁর থলিটি নেই, এ অব্যবস্থা কল্পনাতীত।

পিনাকী চা ও ভাজির ফরমাশ দিল। দোকানদারটি বেশ চটপটে। বুঝতে পেরেছে, আমাদের আর তর সইছে না। সহসা শৈলেশদা বলেন, "মহারাজ! পুলিশ। টাকাটা নাও।"

শৈলেশদা ঠিকই দেখেছেন। দেখবেনই তো। তাঁর যে আগাগোড়া নজর ছিল ঐ দিকে। পুলিশ আসছে। তার মাথায় খাকি পাগড়ি, পরনে খাকি হাফ প্যাণ্ট ও হাফ সার্ট, হাতে বেটন। সে আসছে অস্থির পদক্ষেপে। আসছে আমাদের কাছে। চোখে স্থির দৃষ্টি, মুখে অমায়িক হাসি। সে এল। এসেই জিজ্ঞেস করল, "আপ সব কলকাত্তাকে পাহাড় চহড়নে ওয়ালে হ্যায়?"

"জী হাঁ।" সসম্ভ্রমে শৈলেশদা উত্তর দেন। সঙ্গে সঙ্গে সে স্যালুট করে শৈলেশদাকে। কি ব্যাপার? কোথায় তিনি ওকে সেলাম ঠুকবেন। আর ওই কিনা···আমরাও হাত তুলে নমস্কার করি।

সে দোকানদারকে ধমক লাগায়, "এ রামুয়া আচ্ছা করকে চায় বানাও। জায়দা পয়সা মাত্ লেও।" তারপর সুর নামিয়ে আমাদের বলে, "আপকো ড্রাইভারকো হাম বোলা, গাড়ি লাইনকা পহেলে লাগানে। সবসে পহেলে আপকো গাড়ি ছোড়েঙ্গে। ফিরভি আপকো কুছ তকলিফ হোগী—দেড়ঘণ্টা ঠহরনে পড়েগা।"

উপক্রমনিকা তো ভালই হল। এবার আসল কথাটি বলে ফেল তো বাছাধন। আমাদের নির্বাক দেখে একগাল হেসে সে আবার শুরু করে, "আপলোক বহুত জলদি চলা আয়া··· ।"

এইরে এইবারে বোধহয়···না, আবার স্যালুট ঠোকে সে। হেলে দুলে ফিরে চলে গেটের দিকে। আমরা 'পাহাড় চহড়নে ওয়ালারা' অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি সেই সরকারী প্রতিনিধির পদক্ষেপের দিকে। দুষ্মন্তও বোধ হয় শকুন্তলার লাজ-নম্র পদসঞ্চারের পানে এমন করে তাকিয়ে থাকে নি কোনদিন।

সবার আগে মুখ খোলে নিতাই, "ওকে এক গ্লাস চা খাওয়ালে হত।"

ঘুষ দেয়া ও নেয়ার বিষ আজ মিশে গেছে আমাদের রক্তে।

বাস চলছে বটে। তবে রাস্তার কথা না বলাই ভাল। এখনও বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। এখানে বৃষ্টি হচ্ছে কয়েকদিন ধরেই। সমস্ত নদীতে বান ডেকেছে। অলকানন্দার প্রবল স্রোতে অনেক গরু, ভেড়া ও ঘোড়ার মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে।

এখানেই এই, ওপরে না জানি কি। যাই হোক, আমরা থামব না। আমরা এগিয়ে যাব।

আজ কতটা যেতে পারব কে জানে। প্রতিদিনই আমাদের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত হচ্ছে। প্রথম আটত্রিশ ঘণ্টায় রেলে নশ উনত্রিশ মাইল এসেছি—কলকাতা থেকে ঋষিকেশ। পরশু ছঘণ্টায় ছেষট্টি মাইল—ঋষিকেশ থেকে শ্রীনগর। কাল সারাদিন ধরে বাস এগিয়েছে মাত্র সাঁইত্রিশ মাইল। আজ যদি পিপলকোঠি পৌঁছতে পারি, তাহলেই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করব। পিপলকোঠি হয়কোটি থেকে মোটে চব্বিশ মাইল।

অর্থ সংগ্রহের জন্য এমনিই আমাদের রওনা হতে দেরি হয়ে গেছে। আরও দেরি হচ্ছে। সামনে শীত। তার চেয়েও বড় কথা বাজেটের বেশী খরচ হয়ে যাচ্ছে। শুনছি পিপলকোঠির পরে আর বাস যেতে পারবে না। না পারলে পিপলকোঠি থেকে জোশীমঠ, এই উনিশ মাইল পথ, হেঁটে যেতে হবে। কুলিভাড়া, খাওয়া ও অন্যান্য খরচ বাবদ দুদিনে অন্তত দেড় হাজার টাকা বাড়তি খরচ হবে।

রাস্তা ক্রমেই ভয়ঙ্কর হচ্ছে। ডাইনে পাহাড়, বাঁয়ে খাদ—খাদের নীচে অলকানন্দা। বৃষ্টি পড়ছে। পাহাড়ের গা বেয়ে বৃষ্টির জল রাস্তায় পড়ছে। রাস্তার জল গড়িয়ে গড়িয়ে খাদে পড়ছে। জলে কাদায় পিচ্ছিল পথ। অজস্র ধস নেমেছে পাহাড় থেকে। ধসের জন্যে মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে। পি. ডবলু. ডি-র লোক রাস্তা সাফ করছে। তারা বলল—এ গাঁয়ের নাম মাথিয়ানা। আজ সকালেই লোহা লক্কড় বোঝাই একটা মিলিটারী ট্রাক এখানে কাদায় বসে গিয়েছিল।

রাস্তার পাশে বহু জায়গা ধসে গেছে। রাস্তা এত সঙ্কীর্ণ যে বাসের চাকার পাশে বড় জোর দুতিন ইঞ্চি জায়গা অবশিষ্ট থাকছে। কোন প্রকারে একটি চাকাও যদি তিন চার ইঞ্চি ওপাশে চলে যায় তাহলে…? থাক, তার চেয়ে আশা করা যাক—এই বৃষ্টি এখনই থামবে। আমরা বাসে বসেই জোশীমঠ পৌঁছতে পারব।

এই নতুন বাসের নতুন ড্রাইভারের নাম রামদাস। আগে ছিল ভগৎরাম। এখন রামের দাসানুদাস হনুমান। যোগ্য প্রতিনিধি। এই পথেও বেশ জোরে বাস চালিয়েছে। তার চোখ দুটি সব সময়েই রাস্তার দিকে, হাত এবং পা যে যার যথাযথ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু মুখখানিকে সে কখনই রেহাই দিচ্ছে

না। এতক্ষণ নানা প্রশ্ন করে আমাদের বকিয়েছে। এখন বোধহয় ওর সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়ে নিজেই বকতে শুরু করেছে—"গতবার ঠিক ওই জায়গায় একটা যাত্রী বোঝাই বাস অলকানন্দায় পড়ে গিয়েছিল।"

আঁতকে উঠি। ভয়ে ভয়ে জায়গাটা দেখে নিই। ওপারে বালাস্থতি নদী এসে অলকানন্দায় মিশেছে। জিজ্ঞেস করি, "যাত্রীরা?"

"একজন ছাড়া সবাই নিখোঁজ।" নির্বিকার চিত্তে রামদাস জবাব দেয়।

"কে সেই একজন?" আমাদের বাসটা এখন ঠিক সেই জায়গায়।

"আশ্চর্য ভাবে বেঁচে গেছে। পড়ে যাবার সময় সে কেমন করে যেন বাসের জানলা গলে বেরিয়ে এসেছিল। আর পড়তে পড়তে তার শাড়ি বেঁধে যায় এই গাছটার একটা ডালে। শাড়ি ধরে মেয়েটি ঝুলে ছিল অনেকক্ষণ। পি. ডবলু. ডি-র লোক এসে তাকে উদ্ধার করে।"

বাসের চাকা পিছলে যাচ্ছে। একেবারে পাহাড় ঘেঁষে বাস চলছে। হঠাৎ গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিল রামদাস। বকাটে রামদাস গম্ভীর হল। আমরাও শব্দহীন। ডাক্তার পকেট থেকে গীতা বের করল। কিন্তু গীতা পাঠের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। হয়তো নিঃশব্দে ভগবানকে ডাকছে। ঝুপ করে একটা শব্দ হল। চমকে পেছনে তাকাই। রাস্তার অনেকটা অংশ সম্পূর্ণ ধসে গিয়ে অলকানন্দায় পড়ছে। মিনিটখানেক আগেই আমাদের বাস ঐখানে ছিল। ধসটা এক মিনিট আগে নামলে, কিম্বা বাসটা আর এক মিনিট পরে আসলে, আমরাও ভবিষ্যত যাত্রীদের কাছে কাহিনীর বিষয় হয়ে থাকতাম।

গতবারে একজন বেঁচেছিল কিন্তু এবারে? আমাদের যে কারুরই পরনে শাড়ি নেই।

মনে মনে যে যাই ভাবি, কেউ কোন কথা বলছি না। সবাই তাকিয়ে আছি পথের দিকে—অতি পরিচিত পথ। পিনাকী এর আগে চারবার বদ্রীনাথ এসেছে, শৈলেশদা ও চঞ্চল তিনবার, আমি ও দেবীদাস দুবার। কিন্তু এ পথের এমন রূপ তো আর দেখি নি। আগে কেদারনাথের চেয়ে বদ্রীনাথের পথ সুগম ছিল। কিন্তু দিন দিন এ পথ দুর্গমতর হচ্ছে। অথচ এ পথের মূল্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই পথ এখন আর শুধু বদ্রীনাথের পথ নয়, জেলা সদর চামোলীর পথ। হোতি, নীতি, বরাহোতি ও মানা গিরিদ্বারের পথ—সীমান্তের সড়ক।

"ঐ দেখো ও পারে গোপেশ্বরের পথ।" শৈলেশদা সহসা বলে ওঠেন।

থমথমে আবহাওয়াটা খানিকটা কেটে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। নড়েচড়ে বসি। বলি, "তা হলে তো চামোলী এসে গেল।"

"হ্যা। চামোলীতে কিছু খেয়ে নিতে হবে।" যাক দেবীদাস এতক্ষণে নর্ম্যাল হয়েছে।

"গোপেশ্বর কোথায়?" পকেট-গীতা পকেটস্থ করে ডাক্তার জিজ্ঞেস করে।

"এখানে।" অমূল্য নিজেকে দেখিয়ে দেয়। হেসে পিনাকী বলে, "কেদারনাথ থেকে উখীমঠ হয়ে চামোলীর হাঁটাপথে একটা বড় গ্রাম।"

জগৎ পরিবর্তনশীল। এই চামোলী বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়েও বুঝতে পারছি। চারিদিকে তাকাচ্ছি আর অবাক হচ্ছি। নীচে অলকানন্দার তীরের সেই সঙ্কীর্ণ চাষের জমি উধাও হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য সরকারী কোয়ার্টার। বাস স্ট্যাণ্ডে বড় বড় দোকান, পাহাড়ের ওপর বড় বড় অফিস। ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা পথচারী। কেউ কেউ আমাদের বাসের ফেস্টুন পড়ছেন। আমাদের দেখছেন। এমন সময়, "এই যে মহারাজ, এসে গেলে তা হলে।"

কে? চারিদিকে তাকাই।

"আরে আমি…।" দাড়ি-গোঁফ-মণ্ডিত, স্বাস্থ্যবান একজন ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। গায়ে ওভারকোট, গলায় হাতে-বোনা মাফলার, মাথায় ফেল্টের টুপি, চোখে কালো চশমা, পায়ে বাটার হাণ্টার, কাঁধে ক্যামেরা ও ওয়াটার বট্‌ল্, হাতে লাঠি। একেবারে সেণ্টপার্সেণ্ট টুরিস্ট। চেনা চেনা মনে হলেও ঠিক চিনতে পারছি না।

"কিহে। এরই মধ্যে ভুলে মেরে দিলে? আমি চৌধুরী।"

"চৌধুরীদা।" আমরা চিৎকার করে উঠি। কি আনন্দ, আমাদের হিমালয়-পাগল চৌধুরীদা। বড় ঘরের ছেলে, বড়লোকের জামাই, বড় চাকুরে চৌধুরীদা। "ভালই হল। আজই 'ইনার লাইন' পারমিট পেয়ে গেছি। চলো একসঙ্গেই যাওয়া যাক।" বলেই তিনি কাকে যেন ইশারা করলেন। একজন কুলি তাঁর মালপত্র নিয়ে এল। সেগুলো বাসের ওপরে তোলা হল। আর এই ফাঁকে দেবীদাস ছুটে গিয়ে ডুঠোঙ্গা ভাজি নিয়ে এল।

বাস ছাড়ল। চৌধুরীদাকে জিজ্ঞেস করি, "পারমিট নিলেন কেন? কোথায় যাচ্ছেন?"

"লোকপাল-হেমকুণ্ড ও নন্দনকানন।"

"হুররে!" আমরা সমবেত কণ্ঠে বলে উঠি, "চৌধুরীদা তাহলে অনেকদিন আমাদের সঙ্গে থাকবেন।"

বাস চলেছে। দেবীদাসের ভাজি বিতরণ সমাপ্ত হয়েছে। আমরা ভাজি সহযোগে চৌধুরীদার গল্প শুনছি। হঠাৎ তিনি গর্জে উঠলেন, "এই রোক্কে।" কি ব্যাপার? আরে তাইতো। এযে প্রাণেশ আর টোপগে। ক্ষীণকায় প্রাণেশ ও স্বাস্থ্যবান টোপগে। আমাদের কনিষ্ঠতম সভ্য প্রাণেশ চক্রবর্তী ও নীলগিরি পর্বত সম্পর্কে অভিজ্ঞতম শেরপা টোপগে। ভাগ্যিস চৌধুরীদা দেখেছিলেন। কিন্তু ওরা এখানে এল কেমন করে? ওদের তো পিপলকোঠিতে থাকার কথা। যাই হোক ওদের তুলে নিয়ে আবার বাস ছাড়া হল। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ওরা। চলন্ত বাসের মধ্যে কোলাকুলি চলল। তারপরে প্রাণেশ জানাল, "কি চিন্তায় পড়েছিলাম আপনাদের জন্য। পিপলকোঠিতে নীচের কোন খবর নেই।"

"বীরেন কোথায়?" চঞ্চল জিজ্ঞেস করে।

"বীরেনদা কুলীর বন্দোবস্ত করতে জোশীমঠ চলে গেছেন। পিপলকোঠিতে কুলি পাওয়া যায় নি। আমরা বসে থেকে থেকে অধৈর্য হয়ে হেঁটেই চামোলী রওনা হয়েছিলাম। যাক জলে কাদায় ছ মাইল হাঁটা সার্থক হল। আপনারা এসে গেছেন।"

॥ ৭ ॥

"ম্যায় শের সিং সাব্।" বাস থেকে নামতেই সে আমাদের স্যালুট ঠোকে। বুটের শব্দে অপ্রস্তুত হই। লোকটি বেশ কেতাদুরস্ত বলতে হবে। গায়ে টুইডের গলাবন্ধ কোট, পরনে একই কাপড়ের সরু পায়জামা—একেবারে দিশী স্যুট। দেখে মনে হচ্ছে বয়স ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু বয়সের ভারে একটুও নুয়ে পড়ে নি। লম্বায় ছ ফুটের চেয়ে কিছু বেশী তবে রোগাই বলা চলে। এমন উজ্জ্বল চোখ সচরাচর বড় দেখা যায় না।

কিন্তু শের সিং···। নামটা খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। ও···মনে পড়েছে, নন্দাঘুন্টি অভিযানের মেট—অর্থাৎ কুলিদের সর্দার। এই কি সেই লোক? সে

যে শুনেছি,...আবার সেই শের সিং? কিন্তু উপায় কি? বীরেন যে ওকেই জোশীমঠ থেকে পাঠিয়েছে।

এইমাত্র আমাদের বাস কোনমতে পিপলকোঠি এসে পৌঁছল। এখন বেলা ঠিক বারোটা। যে ভাবেই হোক, যে কদিনেই হোক, পিপলকোঠি পর্যন্ত বাসে আসতে পেরেছি। আমরা ভাগ্যবান। খবর পেলাম, বাস আর ওপরে যাবে না। আমাদের হেঁটেই জোশীমঠ যেতে হবে। যেতে হয় যাব। এ পর্যন্ত তো আসতে পেরেছি। এই বা কম কিসের? বীরেন প্রাণেশ ও টোপগে পাঁচদিন আগে এখানে এসেছে। তখন থেকেই জোশীমঠের বাস বন্ধ। বহু চেষ্টা করেও ওরা এখানে কুলি যোগাড় করতে পারে নি। এ অঞ্চলের অধিকাংশ কুলিই এখন রাস্তা তৈরীর কাজে লেগেছে। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে সেনাবাহিনী মোটর পথ প্রসারিত করছেন। সে কাজে মজুরী কিছু কম হলেও খুব খারাপ নয়। কেন ওরা মাল ঘাড়ে করে আমাদের সঙ্গে বরফ আর ধসের ওপর ছুটে বেড়াবে? তাছাড়া কয়েকদিন আগে বাহাত্তর জনের এক শিখ তীর্থ-যাত্রীদল লোকপাল-হেমকুণ্ড দর্শন মানসে এখানে এসেছিলেন। তাঁরা বেশী মজুরী দিয়ে অবশিষ্ট সব কুলিদের সঙ্গে নিয়ে গেছেন। বীরেন বাধ্য হয়ে প্রাণেশ ও টোপগেকে এখানে রেখে জোশীমঠ গিয়ে এই শের সিংকে পাঠিয়েছে। কিন্তু শের সিং যদি সেইরকম করে? সে তখন দেখা যাবে। এখন যখন সেই আমাদের একমাত্র সহায়, তখন পরম সমাদরে তাকে বরণ করতে হবে। বলি, "তোমার কথা আমি শুনেছি নন্দাঘুন্টি অভিযাত্রীদের কাছে।"

শের সিং বিগলিত হয়, "আমাকে বাদ দিয়ে এ অঞ্চলে কি পর্বতাভিযান হয়, না হয়েছে? তবে জমিজমা সামলাতে কয়েকবার আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। আপনারা আর কি শুনেছেন? শুনেছে যারা টিলমন্ সায়েবের সঙ্গে কথা বলেছে।"

"তা তো বটেই।" অমায়িক হাসি হাসতে হয়।

"সরকার সাব মানা থেকে লোক আনাবার চেষ্টা করেছিলেন, পারেন নি। সুরানা সাব গোবিন্দঘাটের জশবীর সিংকেও চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু এত লোক সে পাবে কোথায়?"

"আমি যে জোশীমঠের ঈশ্বর সিংকে চিঠি দিয়েছিলাম?"

আবার শের সিং এর চোখ দুটি নেচে ওঠে, "আমি তারই মেট। ম্যায় শের সিং সাব।"

"যাক ভালই হল। তোমার মত একজন বিচক্ষণ, কর্মঠ ও অভিজ্ঞ লোককে আমরা পেলাম।"

"কী যে বলেন সাব্। টিলমন্ সাব্ বলতেন—শের সিং, পর্বতাভিযানে নসীবই হল আসল।"

"তা তুমি লোকজন সব নিয়ে এসেছ তো?"

"কোন ফিকির করবেন না। চব্বিশটা খচ্চর নিয়ে এসেছি। দশজন কুলি যোগাড় করেছি। কাল সকালেই রওনা হব। আপনারা মাল ভাগ করে ফেলুন।"

"মাল ভাগ?"

"হ্যা সব মাল খুলে নতুন করে প্যাকিং করতে হবে। চব্বিশটা দেড়মণ ও দশটা একমণ বোঝা করে ফেলুন। ফালতু জিনিস আলাদা করে রাখবেন। আমি এখানেই একটা দোকানে রেখে দেব।"

"তার পরেও যে প্রায় দশ মণ মাল থাকবে তা বইবে কারা?"

"আপনারা। বাকি মাল রুকস্যাকে ভরে আপনাদের বইতে হবে…। আচ্ছা আমি তাহলে চলি। খাওয়া দাওয়ার পর আবার আসব।"

শের সিং অদৃশ্য হল। ভাবি কে কুলির সর্দার? আমি না শের সিং?

খচ্চরগুলো আশে পাশেই বাঁধা রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। প্রয়োজনীয় কুলি না পেয়ে শের সিং খচ্চরের বন্দোবস্ত করেছে। ভালই করেছে। একটি এদেশীয় খচ্চর সাধারণতঃ দেড় জন মানুষের বোঝা পিঠে নিয়ে অক্লেশে চড়াই উৎরাই পেরুতে পারে। পাহাড়ে ওরা মানুষের পরম বন্ধু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে খচ্চরই ছিল ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর প্রধান সহায়। এই ভারবাহী পশুর দল আর্মি ট্রান্সপোর্ট কার্ট থেকে শুরু করে বন্দুক মেশিনগান গোলাবারুদ রসদ পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি আহত সৈনিকদের দুর্গম পথ পেরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত বহন করেছে। কোন কোন খচ্চর শত্রুর গোলাগুলিকে উপেক্ষা করে যেভাবে কর্তব্যপালন করেছে, তাতে মানুষ হলে তারা অনায়াসে ভিক্টোরিয়া ক্রশ পেত।

শুধু কষ্টসহিষ্ণু ভারবাহী বলে নয়, খচ্চর বুদ্ধিমানও বটে। অনেক সময় দেখা গেছে তার রক্ষকের চেয়ে খচ্চরের বুদ্ধি বেশী। টমি এ্যাটকিন্‌স্ নামে একজন বৃটিশ পদাতিক তার খচ্চরের পিঠে ভারী দু বাক্স গোলাবারুদ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত মনে শত্রুব্যূহের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। খচ্চর প্রথমে মৃদু আপত্তি জানাল। তারপর দুজনে কিছুক্ষণ ধরে টানাটানি চলল। অবশেষে খচ্চরেরই

জয় হল। এক ঝটকায় টমির হাত থেকে মুক্ত হয়ে সে বিদ্যুৎবেগে নিজের শিবিরে ফিরে এল। কম্যাণ্ডিং অফিসার তাড়াতাড়ি তার পিঠ থেকে মূল্যবান বাক্স দুটি নামিয়ে তাকে নিয়ে এলেন নিজের তাঁবুর পাশে। ভাল করে খাইয়ে তাকে সসম্মানে সেখানেই বেঁধে, দিবানিদ্রার চেষ্টায় তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। গর্বিত খচ্চর বোধ হয় আরও জোরালো অভিনন্দন আশা করেছিল। তাই সে এমন চিৎকার শুরু করল যে কম্যাণ্ডিং আফিসারের দিবানিদ্রার দফারফা। দু দিন বাদে ক্লান্ত অবসন্ন শ্রীমান টমি অতিকষ্টে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে শিবিরে ফিরে এল। এসেই জানাল—তার খচ্চর হারিয়ে গেছে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, খচ্চরও মানুষের মত অক্সিজেনের অভাব সইতে পারে। পথ তৈরি করে দিতে পারলে খচ্চর অনায়াসে পিঠ বোঝাই মাল নিয়ে এভারেস্ট জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে। একশ ফুট ওপর থেকে পড়লে নিদেনপক্ষে মানুষের হাত পা ভাঙে। কিন্তু তিনশ ফুট ওপর থেকেও পড়েও খচ্চর অক্ষত রয়েছে। তবে সব নিয়মেরই বোধকরি ব্যতিক্রম আছে। একবার একটি খচ্চর ক্রুদ্ধ হয়ে একজন সেপাইয়ের মাথায় পদাঘাত করে। চিকিৎসক পরীক্ষা করে বলেন, সেপাইটির কিছুই হয় নি। কিন্তু পশুচিকিৎসক বল্লেন, খচ্চরটি খোঁড়া হয়ে গেছে।

খচ্চরের আরেকটি প্রধান গুণ হল নিয়মানুবর্তিতা। ওরা সব সময় মাল পিঠে নিয়ে সারি বেঁধে একই গতিতে পাহাড়ের গা ঘেঁসে এগিয়ে চলে। চালক বাঁশী বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে আছে দাঁড়িয়ে পড়ে।

সীমান্ত রক্ষা ও সীমান্ত এলাকার উন্নয়নের জন্য খচ্চর তাই অপরিহার্য। কিন্তু ভাল জাতের খচ্চর যে সব অঞ্চল থেকে আসত, তা এখন ভারতের বাইরে। ফলে আমাদের বিদেশ থেকে খচ্চর আমদানী করে একটা মোটা অঙ্কের বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করতে হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত আমরা একটি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলাম। কিছুদিন হল ভারত সরকার সাইপ্রাস থেকেও খচ্চর আমদানীর ব্যবস্থা করেছেন।

উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মতে দু জাতীয় গাছের সংমিশ্রনে ভাল জাতের গাছ জন্মায়। কিন্তু প্রাণীবিজ্ঞানীদের মতে দু জাতীয় প্রাণীর সংমিশ্রনে যে প্রাণীর জন্ম হয় সে তার পিতামাতার কেবল দোষগুলিই পায়। এই নিয়মটি কিন্তু খচ্চরের বেলায় খাটে না। ঘোড়া ও গাধার সংমিশ্রনে হয় খচ্চর। সে ঘোড়ার কাছ থেকে পায় বুদ্ধি আর গাধার কাছ থেকে পায় কষ্টসহিষ্ণুতা। উপরন্তু সে

হয় অত্যন্ত সাবধানী। ঘোড়া বা গাধার মত তার পা ফস্‌কায় না।

অনেক স্ত্রী খচ্চরই প্রজনন-ক্ষমতাহীন। একমাত্র ভাল ঘোড়া ও গাধার সংমিশ্রনেই বড় ও ভাল জাতের খচ্চর জন্মলাভ করে। বছরে একবার এদের একটি করে বাচ্চা হয়। আর চার বছর বয়স না হলে কোন খচ্চর মানুষের কাজে আসে না। অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছাড়া খচ্চরের অভাব পূরণ করা সম্ভব নয়।

পিপলকোঠি অনেক বড় হয়ে গেছে, অনেক বদলে গেছে। বড় বড় বাড়ি-ঘর, বড় বড় দোকনপাট। টেম্পল্‌ কমিটির রেস্ট হাউস আর পি. ডব্‌লিউ. ডি-র ইন্সপেকশান বাংলো—কত কি। এসব কিছুই ছিল না কয়েক বছর আগে। তখন পিপলকোঠি ছিল বদ্রীনাথ বাস পথের টার্মিনাস। তারপরে টার্মিনাস হয়েছিল বেলকুচী এখন জোশীমঠ। আমাদের মন্দভাগ্য, এখান থেকেই হাঁটা শুরু করতে হবে।

বাস এগিয়ে যাওয়ায় কিন্তু পিপলকোঠির কোন ক্ষতি হয় নি। বরং ভালই হয়েছে। বাস পথ গাড়োয়ালের সমৃদ্ধি এনেছে। বছরে প্রায় সোয়া লক্ষ যাত্রী কেদার-বদ্রী ও পঁচাত্তর হাজার যাত্রী গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী দর্শনে আসেন। কম করেও দু কোটি টাকা তাঁরা গাড়োয়ালে খরচ করে যান। বাস যতই এগিয়ে যাবে, যাত্রীসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাবে। গাড়োয়াল সমৃদ্ধতর হবে।

এখন পিপলকোঠি বাস স্টেশনের ওয়েটিং হল আরও বেশী জমজমাট। তবে অধিকাংশ যাত্রীই ঘরমুখো। স্বভাবতঃই পথের কথা শুনে তারা উদ্বিগ্ন। উদ্বেগ জিনিসটা আবার সংক্রামক। তাই বলে আমাদের যেন এই সংক্রামক ব্যাধিতে না পেয়ে বসে। আমাদের ঘরে ফেরার অনেক দেরি।

বাস থেকে মালপত্র নামিয়ে আমরা ওয়েটিং হলে জড়ো করলাম। পিনাকী ছুটল খাবারের অর্ডার দিতে। চৌধুরীদা আগেই চিঠি লিখে ইন্সপেকশান বাংলোর ঘর ঠিক করেছেন। তিনি তাঁর ঘরে চলে গেলেন। ঘর ছাড়লেই কি ঘরের মায়া ছাড়া যায়?

খাওয়া শেষ হতে বেলা তিনটা বেজে গেল। বেশ ভালই খাওয়া হল। শ্রীনগর ছাড়ার পরে আর এরকম খাওয়া জোটে নি। স্বভাবতঃই খাওয়ার পর শরীরে অবসাদ জড়িয়ে এল। কিন্তু শুয়ে পড়লেন শুধু শৈলেশদা। শেরপাদের সাহায্যে নরম দেখে কয়েকটা কিটব্যাগ মাটিতে সাজিয়ে, তার সাদা থলিটিতে

মাথা ঠেকিয়ে শুয়ে পড়েছেন তিনি। টাকার বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমোচ্ছেন আমাদের কেশিয়ার।

ভানু চঞ্চল পিনাকী দেবীদাস ও প্রাণেশ, দার্জিলিং থেকে আনা সাজ-সরঞ্জামের কয়েকটা কিট খুলে বসল। পর্বতাভিযানে প্যাকিংয়ের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রথমতঃ বোঝাগুলি মোটামুটি সমান ওজনের হওয়া দরকার। উচ্চতা যতই বাড়বে, বোঝাও তত হাল্কা হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি বোঝার মধ্যে সব রকম জিনিস থাকা দরকার, যাতে যে কোন একটি খুললে খাবার থেকে ওষুধ পর্যন্ত সবই কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু এখন সে রকম প্যাকিং করার সময় নেই। জোশীমঠ ও বেসক্যাম্পে আবার নতুন করে প্যাকিং করতে হবে। এখন শুধু শের সিংএর নির্দেশ অনুযায়ী দেড়মণের চব্বিশটা ও এক মণের দশটা বোঝা তৈরী করে ফেলতে হবে। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিছু সাজসরঞ্জাম আমাদের রুকস্যাকে বোঝাই করে ফেলতে হবে। আইস-এক্স, মোজা সোয়েটার স্লিপিং-ব্যাগ ওয়াটার-বটল ক্যামেরা থালা চামচ ও মগ প্রভৃতি বের করে সবাইকে ভাগ করে দিতে হবে।

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। এমনিই ওরা এগারোজন হয়ে গেছে। এর ওপরে আবার আমরা যদি ওদের সাহায্য করতে যাই, তাহলে কাজের চেয়ে অকাজ হবে বেশী। তার চেয়ে বরং থালা মগ ও চামচগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। ওগুলোতে নাম লেখাতে হবে। যাতে বদল না হয়ে যায়। সবগুলোই দেখতে একরকম কি না। বেরিয়ে পড়লাম পথে।

নাম লিখতে যা সময় লেগেছে, তার দ্বিগুণ সময় আমরা ঘুরে কাটিয়েছি। ভালই লেগেছে। ভাগ্যিস আজ আর বৃষ্টি নামে নি। রোদের উত্তাপও বেশী নেই। মেঘলা আকাশ, ভেজা মাটি আর সবুজ পাহাড়। পুণ্যলোভী তীর্থযাত্রী আর রিক্ত গাড়োয়ালী। ওরাও তীর্থদর্শন করে কিন্তু দর্শনী দিতে পারে না। তাই বোধ হয় তীর্থের ফলও লাভ করতে পারে না। ভগবানের কাছে যারা রয়েছে তারাই ভগবানের প্রসাদ পাচ্ছে না।

বেলা গড়িয়ে এসছে। সোনালী সূর্যের আলো পড়েছে কাছে ও দূরের পর্বতশৃঙ্গের শিরে শিরে। ফিরে এলাম বাস স্টেশনে। এসেই আক্কেল গুড়ুম। পিনাকী মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে।

"কি ব্যাপার?"

"আর বলো কেন? লোকটার পাত্তা নেই।"

"কোন লোক ?" বুঝতে পারি না।

"আরে তোমার সেই শের সিং। বলে গেছে চারটের সময় আসবে। সাতটা বাজতে চলল। মালপত্র সব রিপ্যাকিং হয়ে গেল। এদিকে তারই দেখা নেই। এত মাল এখন কোথায় রাখি ? কি করি ?"

তাই বলে তো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। ঠিক হল এই অবেলায় আর টানা হেঁচড়া না করে মালপত্র সব এখানেই রাখা হবে। শেরপাদের সঙ্গে পিনাকী ও চঞ্চল এখানে থাকবে। তারা পালা করে রাত জেগে মালপত্র পাহারা দেবে। বাকি সকলে যাবে ইন্সপেকশান বাংলোয়। সেখানে প্রাণেশ একখানি ঘর নিয়েছে। সেই ঘরেই আমাদের রাতের শয্যা—শয্যাহীন শয্যা। এবারে আমরা বিছানাপত্র আনি নি। এমন কি তীর্থ পথের প্রধান সম্বল যে কম্বল, তা পর্যন্ত আনি নি। এ পথ তীর্থের পথ হলেও আমরা তীর্থযাত্রী নই। কম্বলের বদলে স্লিপিংব্যাগ সম্বল করে আমরা এবার বেরিয়েছি। কিন্তু স্লিপিং ব্যাগ ও এয়ার ম্যাট্রেসকে কি শয্যা বলা চলে ?

রাতের খাওয়া সেরে আমরা চললাম ইন্সপেকশান বাংলোয়। চঞ্চল পিনাকী ও শেরপাদের জন্য কষ্ট হচ্ছে। কাল সারারাত ওদের কেটেছে বাসে। আজ কাটবে বাস স্টেশনে।

॥ ৯ ॥

নাঃ, অমূল্যর হাঁক ডাকে আর শুয়ে থাকা গেল না। স্লীপিং ব্যাগ ছেড়ে উঠে বসলাম। অমূল্য কোন অন্যায় করে নি। সত্যি সকাল হয়ে গেছে। প্রাণেশ নিতাই ও নিরাপদ ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে নিয়েছে। বাকি সবাই প্রায় প্রস্তুত। আমিও হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। এমন সময়, "এই যে পাহাড় চহড়েনে-ওয়ালারা। আজ কতদূর চড়বে ?" চৌধুরীদা চড়াও হলেন।

"বেলাকুচী পর্যন্ত।"

"কখন রওনা হবে ?"

"কয়েকজন এক্ষুনি। তারা আগে গিয়ে বেলাকুচীতে আমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করবে।"

"তারা কারা ?"

"প্রাণেশ নিরাপদ ও নিতাই।"

"তাহলে ভাই দাড়িওয়ালা, তোমার এই নাবালক দাদাটিকেও সঙ্গে নাও।"

দাড়ি আমাদের সকলেরই বড় হয়ে গেছে এই পাঁচদিনে। কিন্তু আমাদের দাড়ির নেই কোন আভিজাত্য—নেহাতই পর্বতাভিযানের দাড়ি। দাড়িওয়ালা বলতে নিতাইকেই বোঝায়। ওর দাড়ি মেহনতের দাড়ি—বহু পরিশ্রমে লালিত বর্দ্ধিত ও কর্তিত। অথচ দাড়িওয়ালা বললে সে দারুণ ক্ষেপে যায়। তবে চৌধুরীদার দেখছি ভাগ্য ভাল। নিতাই মৃদু হেসে বলে, "বেশ তো চলুন না আমাদের সঙ্গে। আমরা তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব।"

"মানে?" সদাহাস্যময় চৌধুরীদা যেন একটু গম্ভীর হলেন।

"আপনি সঙ্গে থাকলে আমাদের সময়টা কাটবে ভাল। গল্প শুনতে শুনতে বেলাকুচী চলে যাব।"

"ওঃ। আমি বুঝি গপ্পবাজ।"

"আজ্ঞে না। গল্পকার।"

চৌধুরীদার গাম্ভীর্য মিলিয়ে গেল।

সাতটা বাজে। রুকস্যাক পিঠে নিয়ে ইন্সপেক্শান বাংলোর মায়া কাটিয়ে রওনা হলাম নীচে। আজও আকাশ বেশ পরিষ্কার। দোহাই বাবা বদ্রীনাথ! তোমার বরুণচন্দ্রকে একটু সংযত করো। আর যেন তিনি আমাদের কৃপা না করেন।

বাস স্টেশনে এসে চক্ষু স্থির। শেরপারা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে। চঞ্চল ওয়েটিং হলের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারী করছে। আর পিনাকী একটা কাঠের বাক্সের ওপর বসে সর্বহারার দৃষ্টিতে পথের দিকে তাকিয়ে আছে। শের সিং এখনও নিখোঁজ। রহস্যময় লোকের পাল্লায় পড়া গেছে! কিন্তু উপায় কি? শের সিং ছাড়া যে গতি নেই আমাদের। ধৈর্য হারালে চলবে না। প্রতীক্ষা করতে হবে।

নীচের দিক থেকে প্রথম বাস এল। তেমন ভীড় নেই। কয়েকজন স্থানীয় লোক ও মাত্র জন দশেক যাত্রী এসেছে। আমরা বাস স্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে চা ও খাবার খেয়ে শের সিংএর পথ চেয়ে বসে আছি। হোটেলের সামনেই একজন মুচি তার দোকান সাজিয়ে বসেছে। আমাদের শেরপারা ভীড় জমিয়েছে সেখানে। আর কিছুক্ষণ এ ভাবে চললে মুচি বেচারীকে বোধহয় বিদায় নিতে হবে এখান থেকে। হাতুড়ী নিয়েছে আং দাওয়া, সুই নিয়েছে আং টেম্বা,

বাটালি নিয়েছে আং ছুতার। নিজেরাই নিজেদের আধমনি জুতোগুলো মেরামত করে নিচ্ছে। মুচি নির্বাক দর্শক। এমন জুতো আর এমন জুতোর মালিক—দুইই তার কাছে নতুন ঠেকছে। সে অবাক হয়ে নির্বাক হয়ে গেছে। তিনজনের মধ্যে আং ছুতারকেই বড় ওস্তাদ বলে মনে হচ্ছে। সে একেবারে মুচির আসনে বসে গিয়েছে। আমাদের ভাগ্য ভাল। যোগ্য ব্যক্তিকেই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। জুতো সেলাই থেকে রান্না পর্যন্ত, সবই পারে। আং ছুতার আমাদের শেরপা-পাচক।

কতক্ষণ আর পাচকের মুচিগিরি দেখব। দোকানীর পয়সা মিটিয়ে আমরা উঠে পড়ি। ফিরে চলি বাস স্টেশনে।

আরে! একি কাণ্ড! এ যে স্বয়ং ডাক্তার। লিকলিকে লম্বা ফর্সা দেহটির অতি সামান্য অংশ গামছায় আবৃত করে পিপলকোঠির রাজপথে পায়চারী-রত!

"কি ব্যাপার?"

"চেষ্টা করছি।" উদ্বিগ্ন ডাক্তার উত্তর দেয়।

"তোমাকে যেন সকালেও একবার…"

"তুমি দেখছি রবার্ট ক্রস্‌কেও ছাড়িয়ে গেলে হে।" শৈলেশদার কথায় আমরা হেসে উঠি। কিন্তু স্বাস্থ্য-সজাগ ডাক্তার নির্বিকার। সময় নষ্ট না করে সে আবার পায়চারী শুরু করে।

আমরা ওয়েটিং হলে প্রবেশ করি। এমন সময় গরম প্যাণ্ট ও জ্যাকেট পরা একজন যাত্রী আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁর মাথায় ফেল্টের টুপি, চোখে চশমা, হাতে লাঠি। বেশ চোখা চেহারা—বাঙ্গালী বলেই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম তাই। তিনি কাছে এসেই বিশুদ্ধ বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের মধ্যে মহারাজ কে?"

"আমি, কেন বলুন তো?"

"নমস্কার। আমি ভট্টাচার্য, মানে বটানিক্যাল সার্ভে অভ ইণ্ডিয়ার…"

"ডক্টর উপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য। আসুন সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এই হচ্ছে অমূল্য সেন—লিডার…" শৈলেশদা আমাদের নেতৃত্ব করেন।

যাক ভদ্রলোক আমাদের সমবয়সী। দেখে বেশ মিশুকে বলেই মনে হচ্ছে। পিনাকী জিজ্ঞেস করে, "আপনার মালপত্রের ওজন কত হবে?"

"তা প্রায় মন ছয়েক। দেড়মনের মতো তো ব্লটিং পেপারই আছে।"

"ব্লটিং পেপার!" দেবীদাস বিস্মিত।

"স্পেসিস্ কালেক্শান বা প্রজাতি সংগ্রহের জন্যে।"

"ও সেগুলো বুঝি ব্লটিং পেপার দিয়ে মুড়ে আনতে হয়?"

"ঠিক মুড়ে নয়। ফুল বা পাতা দুটো ব্লটিং পেপারের মধ্যে রেখে দুদিক থেকে চাপ দিতে হয়। ব্লটিং পেপার রসটা শুষে নেয়। প্রজাতি নষ্ট হয় না।"

"আপনার সহকারী দুজন কোথায়?" ভানু জিজ্ঞেস করে।

"ঐ যে আমার মালপত্রের ওপর বসে আছে।"

"আপনি তা হলে আগেই আমাদের ধরে ফেললেন?" জিজ্ঞেস করি।

"হ্যাঁ। ভালই হল। ঋষিকেশে আপনাদের পেলাম না। তার পাঠালাম শ্রীনগরে। সেখানেও দেখা হল না। আপনার চিঠি পেলাম—জোশীমঠে দেখা হবে। মনটা একটু খারাপই হয়ে গিয়েছিল।"

শের সিংএর এখনও দেখা নেই। মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা আছে। আমরা সেই সীমায় এসে পৌছেছি। এমন সময় অমূল্য চিৎকার করে ওঠে, "এসেছে।"

"কে? শের সিং?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"ঐযে।"

ঠিকই দেখেছে অমূল্য। সেই কোট ও পায়জামা, সেই রোগা লম্বা সোজা শরীর। মুখে তেমনি অমায়িক হাসি। ধীর পদক্ষেপে এই দিকে আসছে। একা নয়, সঙ্গে জন দশেক লোক। ওরাই আমাদের মালবাহক। ওদেরই জন্যে আমাদের এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা। বাঁচা গেল। তবে এত দেরী করল কেন? থাক সে কথা আর জিজ্ঞেস করে দরকার নেই। নিজের থেকে বলে ভাল, নইলে কারণটা অজানাই থাক। দলবল সহ শের সিং ওয়েটিং হলে ঢোকে। সামনে এসেই স্যালুট ঠোকে। বিনয়ের অবতার। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে, "খবর ভাল? খচ্চরের পিঠে মাল সব বোঝাই হয়ে গেছে?"

"না সব হয় নি।" পিনাকী উত্তর দেয়।

"সে কী? খচ্চরওয়ালারা এতক্ষণ বসে করল কি?" বলেই সে হাঁক ডাক শুরু করে "হেই উধার কাহা? হাত চালাও। জল্দী করো।"

অনুচরবর্গ নিঃশব্দে খচ্চর বা নিজেদের পিঠে ইচ্ছেমত মাল বোঝাই করতে

লাগল। আমরা নিঃশব্দে শের সিংকে দেখছি। কিন্তু উপেনবাবু আমাদের মত নীরব নন। তিনি তাঁর ব্লটিং পেপার সম্বন্ধে বড় বেশী সচেতন। তাঁবু বিছানাপত্র পোশাক-পরিচ্ছদ খাবার-দাবার কে কোথায় কি ভাবে নিল, তা তিনি তাকিয়েও দেখলেন না। কিন্তু বেছে বেছে একটি তাগড়াই খচ্চরের পিঠে তিনি তাঁর ব্লটিং পেপার চাপাতে বললেন। শুধু খচ্চর নয়, খচ্চরের মালিকও বেশ শক্তপোক্ত। নাম অমর সিং। উপেনবাবুর নেক নজরে ধন্য হয়ে সে বুক ফুলিয়ে বলে, "একদম নয়া খরীদা সাব। দশ রোজভি নহি হুয়া। পুরা পানশ রুপিয়া লাগা।"

আধ ঘণ্টার মধ্যেই মাল বোঝাই শেষ হল। সূর্য এই ফাঁকে পিপলকোঠির মাথায় এসে উপস্থিত হয়েছে—পাহাড়ের ছায়া, ওয়েটিং হল ও আমাদের ছায়া, ছোট থেকে ছোট হয়ে প্রায় মিলিয়ে গেছে। 'বদ্রী বিশাল কী জয়' বলে সেই বাস চলাচলের অনুপযুক্ত জলসিক্ত কর্দমাক্ত বাস পথ ধরে আমরা রওনা হলাম। বদ্রীবিশালের চরণে নিজেদের সমর্পণ করতে নয়, নীল দুর্গমের সংঙ্গে সংগ্রাম করতে। এ সংগ্রাম প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম, দুর্গমের সঙ্গে দুর্বিনীতের সংগ্রাম, সভ্যতার শাশ্বত সংগ্রাম।

খচ্চরওয়ালারা চলেছে সবার আগে। ওদের পেছনে শেরপাদের সঙ্গে অমূল্য ভানু নিতাই নিরাপদ ও প্রাণেশ। শের সিংয়ের দেরী দেখে নিতাইদের আর আগে যাওয়া হয় নি। কিন্তু চৌধুরীদা রওনা হয়ে গেছেন অনেকক্ষণ। অমূল্যদের পেছনে চলেছে কুলীর দল। চলেছে বলা ভুল। শের সিং ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেরীর জন্যে আমরা তাকে কিছুই বলি নি। না-বলাটাই বুঝি ওকে আঘাত দিয়েছে সবচেয়ে বেশী। লজ্জিত শের সিং তাই তার অনুচরবর্গকে ক্রমাগত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তাদের জন্যই এই বুড়ো বয়সে কলকাতার সাহেবদের কাছে তার মান ইজ্জত সব গোল্লায় গেল। ব্যাটাদের সব পায়াভারী হয়েছে। থাকত সেই টিলম্যান সাহেবের যুগ, চাবুকের চোটে ঘর ছেড়ে মাল ঘাড়ে নিত। আর এখন কিনা তাকে খোশামোদ করে লোক জোগাড় করতে হচ্ছে। সারা সকাল বসে শের সিং যাদের খোশামোদ করেছে, তারা কিন্তু একেবারেই শব্দহীন। এমন কি নিজেদের মধ্যে পর্যন্ত কথা বলছে না। শের সিং সত্যিই শের।

খুব সাবধানে পথ চলতে হচ্ছে। আজ এখনও ধসের সম্মুখীন হতে হয় নি। শুনেছি পথে তিন জায়গায় বিরাট ও ভয়ঙ্কর ধস নেমেছে। রাস্তা মেরামত করতে

নাকি কয়েক সপ্তাহ লাগবে। বাস চলাচল তাই বন্ধ। ফলে আমাদের এই উনিশ মাইল বেশী হাঁটতে হচ্ছে।

মাথার ওপর পাহাড়ের গা থেকে ছাতার মত পাথর ঝুলছে—ছেঁড়া ছাতা। টুপ টাপ করে জল ঝরছে। পাহাড়ের জল ঐ সব পাথর বেয়ে আমাদের মাথায় পড়ছে। জল নয়, শান্তি জল। রৌদ্রদগ্ধ শ্রান্তদেহ ঐ জলে সিঞ্চিত হচ্ছে। অশান্ত চিত্ত শান্ত হচ্ছে।

অনেক দিনের অনভ্যাস। এ যাত্রায় এই আমাদের প্রথম পদযাত্রা। জীবনে মাল কাঁধে এই প্রথম পাহাড়ী পথ চলা। মালের ওজনটাও উপেক্ষা করার মত নয়—প্রায় পঁচিশ সের। এর আগে এরকম পথে কুলিরাই মাল বয়েছে। আমি ছড়ি হাতে হেলে দুলে পথ চলেছি। এ যাত্রার সঙ্গে সে যাত্রার পার্থক্য অনেক। এবারে গিরিতীর্থ দর্শনে যাচ্ছি না, যাচ্ছি নীল দুর্গমের স্বপ্ন-শিখর দর্শনে। এ যাত্রায় রুকস্যাক বইতেই হবে। যে নিজের মাল বইতে পারে না, তার পর্বতাভিযাত্রী হবার যোগ্যতা নেই। কাজেই যত কষ্টই হোক, সে কথা কাউকে বলা যাবে না। তাই মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে রুকস্যাক ঠেকিয়ে নিঃশব্দে জিরিয়ে নিচ্ছি। ফলে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছি। এ অবস্থা শুধু আমার নয়, তবে সকলেরও নয়। অমূল্যরা কেমন শেরপাদের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে। চলবেই তো, ওদের যে উঠতে হবে নীল দুর্গমের শিখরে।

সবাই আমরা এক সারিতে চলেছি। বারো বছর আগেও কেবলমাত্র ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত এমনি একটি সারি তথা কোন ভারতীয় পর্বতাভিযান ছিল কল্পনাতীত। হিমালয়ের আকর্ষণ ভারতের শাশ্বত। কিন্তু সে আকর্ষণ এর আগে অভিযানে পরিণত হয় নি। প্রথম ভারতীয় পর্বতাভিযান সংগঠিত হয় ১৯৫১ সালে শ্রীগুরুদয়াল সিংএর উদ্যোগে। তবে পর্বতাভিযানের প্রতি ভারতবাসীর সত্যিকারের আগ্রহের উন্মেষ হয় ১৯৫৩ সালে এভারেস্ট জয়ের পর থেকে। হিমালয়ের বিভিন্ন অভিযান ভারতভূমি থেকেই আরম্ভ হয়েছে। ভারতীয় শেরপা ও কুলিরা সে সব অভিযানে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে। ১৯৩১ সালের ২১শে জুন ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথের নেতৃত্বে গাড়োয়ালের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কামেট (২৫,৪৪৭ ফুট) আরোহণকারিদের মধ্যে লেওয়া ও কেশর সিং ছিলেন। কিন্তু ১৯৫৩ সালের সাফল্যের পরেই আমরা প্রথম উপলব্ধি করেছি, তাহলে তো আমাদের দেশেও তেনজিং আছেন। আমরাও পারব। কিন্তু তার জন্যে চাই উপযুক্ত শিক্ষা। সরকারের তরফ থেকে সুইস্ ফাউণ্ডেশান ফর এ্যালপাইন্

রিসার্চ-এর কাছে স্কীম চাওয়া হল। Rosenlauiয়ের সুইস মাউণ্টেনিয়ারিং স্কুলের অধ্যক্ষ আর্নোল্ড গ্যাট্‌হার্ড ভারতে এলেন। তিনি দার্জিলিংয়ের বার্চ হিল এ শিক্ষাকেন্দ্র এবং সিকিমের জোংরীতে (১৫০০০ ফুট) শিক্ষাশিবির নির্বাচনের পরামর্শ দিলেন। ১৯৫৪ সালে হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের জন্ম হল। মেজর এন. ডি. জয়াল হলেন অধ্যক্ষ এবং তেনজিং হলেন ফিল্ড-ট্রেনিংএর অধিকর্তা। সুইস ফাউণ্ডেশান পরামর্শ দিলেন, "A course of preparatory character should include lectures on geography, morphology, geology or physiology and climatology." এ পর্যন্ত দার্জিলিং থেকে ছশ নিরানব্বই জন ছেলে বেসিক ও উনয়াশী জন ছেলে এ্যাডভান্স ট্রেনিং নিয়েছে।

পরের বছরই ভারতীয় অভিযাত্রীরা পর্বতাভিযানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। মেজর জয়ালের নেতৃত্বে একই দিনে ৬ই জুলাই ১৯৫৫ কামেট (২৫,৪৪৭) ও আবিগামিন (২৪,১৩০ ফুট) বিজিত হল। এ পর্যন্ত হিমালয়ের আঠারোটি শৃঙ্গ ভারতীয় পর্বতাভিযাত্রীদের কাছে মাথা নত করেছে। আনন্দের কথা, এর মধ্যে দুটি শৃঙ্গ বেসরকারী বাঙ্গালী অভিযাত্রীদল জয় করেছেন।

পর্বতাভিযানের প্রতি আগ্রহ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কিছুদিন হল ইণ্ডিয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ফাউণ্ডেশান নামে একটি সরকারী সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। এদের প্রধান উদ্দেশ্য হল ভাল পর্বতারোহী তৈরি করা। ১৯৫৭ সালে ভারতীয় 'চো-উ' অভিযানের জন্য যে স্পন্সরিং কমিটি গঠিত হয়েছিল, তাই এই ফাউণ্ডেশানে রূপান্তরিত হয়েছে। এরাই দুবার এভারেস্টে অভিযান পাঠিয়েছেন। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের মানালীতে, দার্জিলিংয়ের মতো একটি সরকারী ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই নেফাতে ও আর একটি হবার কথা আছে। জনসাধারণও পেছিয়ে থাকেন নি। এখন সারা দেশে প্রায় কুড়িটি বেসরকারী পর্বতরোহণ সংস্থা গঠিত হয়েছে। গৌরবের কথা তার মধ্যে চারিটিই কলকাতায়।

পর্বতারোহণ কেবল মাত্র শারিরীক কৌশল নয়, একটি সুকুমার কলা। অজানাকে জানাই পর্বতারোহণের প্রধান উদ্দেশ্য। পর্বতরোহীর সঙ্গে পর্বত ও পার্বত্য মানুষের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পর্বতারোহণ দেহ ও মনকে সুস্থ ও স্নেহপরায়ণ করে তোলে। নিয়মানুবর্তিতা ও একতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়

পর্বতাভিযানে। অভিযাত্রী শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শ্রান্তি ও ভয়কে জয় করার শক্তি অর্জন করেন তাঁর অনুভূতি প্রখরতর হয়। ফ্রাঙ্ক স্মাইথ বলেছেন—'On a mountain-top a man feels himself to be no interloper on life's stage, no temporary improvisation to suit an obscure purpose, but an entity whose span is timeless, whose scope is magnificient beyond conception, whose birth and death are incidental milestones on a splendid road without beginning and without end.'

পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরা বহুকাল থেকেই পর্বতারোহণে আগ্রহশীলা। এই তো সেদিন ১৪ই মে (১৯৬২) কাউন্টেস্ ডরোথী গ্রাভিনা নামে একজন সাতান্ন বছরের ইংরেজ মহিলার নেতৃত্বে মেয়েরা পশ্চিম নেপালে কাঞ্জিরোবা হিমালয়ের (২২০০০ ফুট) একটি নামহীন শৃঙ্গ জয় করে গেলেন। তবে আমাদের মেয়েরা এতকাল গিরিতীর্থ দর্শনের মধ্যেই তাঁদের পর্বতাভিযানের আগ্রহকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এই সীমা প্রথম লঙ্ঘন করেন তেনজিংয়ের দুই মেয়ে নীমা ও পেম্‌পেম্ এবং ভাগ্নী ডোমা। ১৯৫৯ সালের অগাস্টে মেয়েদের চো-উ অভিযানে এঁরা অংশ গ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্যের কথা এই অভিযানে দুজন শেরপা সহ ৩৯ বৎসর বয়স্কা নেত্রী, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহিলা পর্বতারোহিনী ম্যাডাম এম. ই. ক্লদ কোগান ও ক্লদ ভ্যানডার স্ট্র্যাট্‌লেন মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁরা দক্ষিণ ফ্রান্সের নীস ও বেলজিয়ামের ব্রাসেল্‌স্ থেকে এসেছিলেন।

গত বছর থেকে দার্জিলিংয়ে মেয়েদের জন্য বেসিক কোর্স এবং এ বছর থেকে এ্যাডভান্স কোর্স খোলা হয়েছে। এ পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশটি মেয়ে বেসিক ও সাতটি মেয়ে এ্যাডভান্স ট্রেনিং নিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আমরাও বলতে পারব—ভারতে ম্যাডাম কোগানের মত মেয়ে আছেন।

"কিহে। কি ভাবছ? ওদিকে দেখো গড়ুর গঙ্গার পথ।" শৈলেশদার ডাকে চিন্তায় ছেদ পড়ে। কিন্তু পথ কোথায়? পথ যে ধস নেমে মুছে গেছে। যখন এই বাসপথ হয় নি তখন ওপরের ঐ ধসে যাওয়া পথ দিয়েই বদ্রীনাথ যেতে হত। কিন্তু অতীতের ঐ মহাপ্রস্থানের পথ আজ পরিত্যক্ত। তাই আর ধস পরিষ্কার করা হয় নি। একালের পথ সেকালের পথকে টুঁটি টিপে মারছে।

"বহুত নসীব সাব। লাটুদেবী বাচা দিয়া।"

কি হল? শের সিং বলছে লাটুদেবী নাকি বাঁচিয়ে দিয়েছে? কি বাঁচল?

কাকে বাঁচাল ? আমাদের ধার্মিক চিকিৎসক শ্রীবিমল ঘোষালকে। সত্যি খুব জোর বেঁচে গেছে। আর একটু হলেই অলকানন্দায়। অথচ শের সিং বার বার নিষেধ করেছে, 'কৃপা করকে কোই কিসিকো ওভারটেক মাত কিজিয়ে। অর্থাৎ যে যার পেছনে চলছে তাকে তার পেছনেই চলতে হবে। কিন্তু কথাটি ডাক্তারের মনে ধরে নি। তাই সে একটু এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমরা পথ ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু খচ্চররা শুনবে কেন ? লাথির চোটে ডাক্তারকে প্রায় ফেলে দিয়েছিল অলকানন্দায়। ভাগ্যিস বসে পড়েছিল, আর শের সিং ছুটে এসে টেনে ধরেছিল। বড় জোর বেঁচে গেছে ডাক্তার। বেঁচে গেলাম আমরা।

॥ ১০ ॥

হে দেবী তুমি জয়যুক্তা; জন্মাদিনাশিনী সর্বসংহারিণী, মঙ্গলদায়িনী। তুমি প্রলয়কালে ব্রহ্মাদির কপোলহস্তে বিচরণকারিণী, তুমি দুঃখপ্রাপ্যা, চিৎস্বরূপা, করুণাময়ী, বিশ্বধারিণী, তুমিই দেবোপক্ষিনী, পিতৃতোষিণী তোমাকে নমস্কার করি।

'মধুকৈটভ বিধ্বংসি বিধাতৃ বরদে: নম:।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥'

নিদ্রা গেল টুটে। রেডিও চলছে। চণ্ডীপাঠ হচ্ছে। তাই তো! আজ ২৮শে সেপ্টেম্বর, আজ যে মহালয়া। খেয়ালই ছিল না। কিন্তু ভুল হয় নি দেবীদাসের। সে ঠিক সময় মত উঠে, আমার রুকস্যাকের মধ্য থেকে ট্র্যানজিস্টারটা বের করে নিজের বিছানায় নিয়ে চালিয়ে দিয়েছে। সুপ্ত বেলাকুচী জেগে উঠেছে, মুখর হয়ে উঠেছে মহাদেবীর আগমন বার্তায়।

প্রায় সবারই দেখছি আমার আগে ঘুম ভেঙেছে। সবাই—শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শুনছে—

'সকল দেবতার শরীর হইতে সঞ্জাত ত্রিলোকব্যাপী অনুপম তেজরাশি একত্র হইয়া এক নারীমূর্তি ধারণ করিল।

মহাশম্ভু, বিষ্ণু, চন্দ্র, সূর্য, ইন্দ্র, পৃথিবী তথা ব্রহ্মা, বিশ্বকর্মা প্রভৃতির স্ব স্ব সৃষ্টি ক্ষমতায় সদৃশঃ তেজরাশিতে দেবীর নখাগ্র হইতে কেশ পর্যন্ত সমগ্র শরীরাংশ উদ্ভূত হইল…।'

আধো অন্ধকারেও দেখতে পেলাম, অমূল্য যেন হাতজোড় করে প্রণাম করল। আর অমূল্যর দেখাদেখি ডাক্তার ও শৈলেশদাও প্রণাম করলেন সকল দেবতার তেজরাশি সম্ভূতা মহালক্ষ্মীকে।

শুনতে খুবই ভাল লাগছে। কলকাতায় কি এত ভাল লাগত? হয়তো নয়। বাংলা থেকে পৌনে এগারো শ মাইল দূরে, মহাপ্রস্থানের পথের ধারে, হিমালয়ের পাদমূলে, ছোট্ট গ্রাম বেলাকুচীর চটিতে, বাংলা কথা, বাংলা গান, বাংলা সুর ভেসে আসছে। দূরকে নিকট করছে, ঘরকে কাছে আনছে। তাই বোধ হয় এত ভাল লাগছে।

ভাল লাগছে আরও একটি কারণে। মহালয়া বহন করে আনে মহামায়ার আগমনী সুর। মহালয়া আমাদের এক স্বর্গীয় আনন্দ ধারায় অবগাহন করায়, রণরঙ্গিনী বেশে দশভুজা চামুণ্ডার মহিষাসুরকে নিহত করার কাহিনী স্মরণ করায়। বাঙালীকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দেয়। আমাদের শক্তি পূজাও সবে শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে দুর্যোগের কবলে পড়ে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মহালয়া আমাদের প্রাণে আনল নতুন আশা, মনে আনল নতুন বল—আমরা সেই আশায় বুক বেঁধে সেই বলে বলিয়ান হয়ে এগিয়ে যাব…'অতএব…মাভৈ :— ভয় দূরীভূত হইয়াছে। অসুররূপ যে সমস্ত অশুভবৃত্তি, আমাদিগকে সত্যপথ হইতে বিচ্যুত করিতেছে, যে অপরাজ্ঞান আমাদিগকে পরাজ্ঞান হইতে সর্বদা বিপথগামী করিতেছে, তাহার হাত হইতে পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইতে স্বতঃস্ফূর্তচিত্তে… আমরা দেবী মহামায়াকে শুভ মাতৃলগ্নে স্মরণ করিয়া অভীষ্ট ফললাভ করি।'

আর দেরি নয়। এবারে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমরা অভীষ্ট ফললাভ করব, নীল দুর্গম জয় করব।

বেলাকুচী জায়গাটা নতুন হলেও একেবারে ছোট নয়। কয়েকটি দোকান ও অনেকগুলি চটি আছে। তারই একটির দোতালায় কাল রাত কাটিয়েছি। আমরা ঋষিকেশ থেকে ১৪৩ মাইল এসেছি। এখান থেকে জোশীমঠ পনেরো মাইল। এখানকার উচ্চতা ৪০০০ ফুটের কিছু বেশী। অথচ জোশীমঠ ৬১৫০ ফুট। আজ আমাদের প্রায় ২১০০ ফুট চড়াই ভাঙতে হবে। যেমন করেই হোক আজ জোশীমঠ পৌঁছতেই হবে।

"পথে কোথাও কিছু পাওয়া যাবে কিনা তার ঠিক নেই। এখানেই আমাদের পেট ভরে খেয়ে নিতে হবে, কি বলেন পিনাকীদা?"

"আচ্ছা দেবী! এটা কি নীলগিরি অভিযান, না খাদ্য আন্দোলন?"

শৈলেশদা রেগে ওঠেন। পাছে রাগারাগিতে সময় নষ্ট হয় তাই পিনাকী তাড়াতাড়ি একটা খাবারের দোকানে ঢুকে পড়ে। বিজয়ী দেবীদাস পরাজিত শৈলেশদাকে একবার দেখে নিয়ে, নিঃশব্দে পিনাকীর পেছনে পেছনে দোকানে ঢোকে। আপন মনে কি বকতে বকতে শৈলেশদাও দেখি দেবীদাসের পিছু নেন। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করি।

খচ্চর ও কুলির দল এগিয়ে গেছে। শের সিং গেছে ওদের সঙ্গে। ওদের কথা না ভেবে ভোরের আলোয় বেলাকুচীকে দেখা যাক। একটু দূরেই বিচিত্র একটি ঝরনা, বোধহয় পাতালগঙ্গা থেকে নেমে এসেছে। আজ কদিন ধরেই তো আমরা কত ঝরনা দেখেছি। কিন্তু এমনটি তো এর আগে কখনও চোখে পড়ে নি। অনেক ওপর থেকে অজস্র ধারায় জল পড়ছে—জল নয়, স্ফটিক গলে গলে পড়ছে। ভোরের মিঠে রোদ সেই স্ফটিকের বুকে সৃষ্টি করেছে অজস্র রামধনু। রংয়ের বন্যা জেগেছে প্রকৃতির প্রাণে—আমাদের মনে।

একটা পুল পেরিয়ে এলাম। অলকানন্দার এই পুলটি ভেঙে গিয়েছিল কিছু দিন আগে। পি. ডাবলু. ডি. নাকি দু মাস সময় চেয়েছিলেন। নীচে চিরবিক্ষুব্ধা অলকানন্দা। দুই তীরে ইস্পাতের মত কঠিন পাথরের খাড়া পাহাড়। সময় সাপেক্ষ বৈকী। কিন্তু মানুষ প্রয়োজনে অসম্ভবকে সম্ভব করে। দু মাস সময় দিলে যে কেবল এ বছরের মত বদ্রীর পথ রুদ্ধ হবে তাই নয়, সীমান্তও অরক্ষিত থাকবে। তাই বীর জওয়ানেরা অসাধ্য সাধন করেছেন। দু দিনে দু মাসের কাজ শেষ করেছেন। নতুন পুল তৈরী হয়েছে—বেলাকুচীর বেইলী ব্রীজ।

"গির গিয়া গির গিয়া···পড়ে গেল···খচ্চর···মানুষ" একটা সমবেত আর্ত চিৎকারে সচকিত হই। উদ্‌ভ্রান্ত হই। কে পড়ল, কেন পড়ল, কোথায় পড়ল? ছুটে চলি। সামনে একটা মারাত্মক ধস। বাসপথের কোন চিহ্ন নেই। পি. ডবলু. ডি-র লোক ধসের ওপর ফুটখানেক জায়গা দুরমুশ করে কোনমতে মানুষ চলাচলের উপযোগী করে দিয়েছে। সেই জায়গা পেরুবার সময় উপেনবাবুর ব্লটিং পেপার সুদ্ধ তাঁর এত সাবধানে বাছাই করা খচ্চরটির পা ফস্কে গেছে—৫০০ ফুট নীচে বিক্ষুব্ধ অলকানন্দায় বিলীন হয়েছে। আর তার সাধের নয়া খচ্চরকে বাঁচাতে গিয়ে অমর সিং···। সর্বনাশ এখন উপায়? পদ-যাত্রার দ্বিতীয় দিনেই দুটি প্রাণ ডালি দিতে হল!

আমরা বোবা হয়ে গেছি। তাকিয়ে আছি সেই সর্বনাশা ধসের দিকে,

তাকিয়ে আছে শেরপা ও কুলীরা, তাকিয়ে আছে খচ্চরগুলো—ভয়ার্ত নয়নে। পর্বতাভিযানের জন্তে আরও একজন মানুষ বিদায় নিল পৃথিবী থেকে। এমনি ভাবেই বিদায় নিয়েছেন ম্যালোরী ও তাঁর সহযাত্রী আর্ভিন, বিদায় নিয়েছেন হার্ম্যান বুল ও আরও অনেকে। কিন্তু সেই মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীরদের আত্মবলিদান বিফল হয় নি। পরবর্তী অভিযাত্রীরা তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁদের পথ দিয়েই এগিয়ে গেছেন—হিমালয় হার মেনেছে।

অমর সিংয়ের আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে তাই বিচলিত হলে চলবে না। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। নীলগিরি জয় করে এই মরণকে মহীয়ান করে তুলতে হবে।

একটা চিৎকার শোনা যাচ্ছে। শব্দটা নীচে থেকে আসছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপদ বলে ওঠে, "বেঁচে গেছে।"

"হ্যাঁ। ঐ তো শুয়ে আছে।" প্রাণেশও দেখতে পেয়েছে তাকে।

জয় বাবা বদ্রীনাথ। তাই যেন হয়। অমর সিং যেন বেঁচে যায়।

কেউ কিছু বলার আগেই সেই খাড়া ধস বেয়ে প্রাণ হাতে করে প্রাণেশ ও নিরাপদ নীচে নেমে গেল। আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে আছি ওদের দিকে। নাঃ, ওরা নির্বিঘ্নে নেমে গেছে। একটু বাদে টোপগে ছান্দু ও ছুতার দড়ি নিয়ে সেই ভাবেই নীচে নেমে গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে ব্লটিং পেপারের বোঝা সমেত অমর সিংকে সঙ্গে করে ওরা অন্য পথে উঠে এল ওপরে। আশ্চর্য! নীচে গড়িয়ে পাড়ার সময় খচ্চরের পিঠ থেকে কেমন করে যেন ব্লটিং পেপারের বোঝাটি খসে পড়েছে। একখানা বড় পাথরে আটকে ছিল অমর সিংয়ের মতই। নিজের জীবন দিয়েও খচ্চরটি নন্দন-কাননের প্রথম সরকারী উদ্ভিদ সমীক্ষাকে সম্ভব করে গেল।

অমর সিংয়ের আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে। একটা হাঁটুতে একটু চোট লেগেছে। বিমল তার প্রাথমিক চিকিৎসা করল। অমর সিংকে জিজ্ঞেস করি, "তুমি আস্তে আস্তে হেঁটে যেতে পারবে তো?"

এতক্ষণ সে কোন শব্দ করে নি। মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে ছিল। ভেবেছিলাম দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় হয়তো বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আমার কথা শুনেই সে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে। বলে, "মাতাজীকো মানা নেহী শুনা। অব্ ক্যায়সে উন্‌হে মুহ্ দেখাউ?"

শের সিং ও পান সিং ওকে সান্ত্বনা দিতে থাকে। পান সিং অমরের মামা।

সেও আমাদের মাল বইছে। পান সিং জানায় মাত্র কয়েকদিন আগে, জোতজমা বন্ধক রেখে তার দিদি অমরকে এই খচ্চরটি কিনে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন রাস্তা মেরামতের মালপত্র বয়ে অমর সেই দেনা শোধ দেবে। কয়েকদিন অমর রাস্তার কাজ করেছে। সে কাজে পরিশ্রম কম, বিপদ কম আবার পয়সাও কম। তাই কাজটা অমরের ঠিক মনে ধরছিল না। এমন সময় এল শের সিংয়ের আমন্ত্রণ। কিন্তু পাহাড়-চড়ার ব্যাপার শুনেই দিদি বললেন—দরকার নেই বাপু ওসবের মধ্যে গিয়ে। নতুন খচ্চর, এখনও পথ চলায় তেমন অভ্যস্ত হয় নি। শেষকালে একটা বিপদ আপদ হোক আর কি! অমর বলল—তোমার যত মিথ্যে ভয়। গাঁ সুদ্ধ সবাই যাচ্ছে। তুমি কিছু ভেবো না মা। মাও আর তেমন আপত্তি করেন নি। মাসখানেকের মধ্যেই অমর ফিরে আসবে। অনেক টাকা আনবে। মুনরীর বাবার দাবী মেটাবে।

"মুনরী কে?" পান সিংকে জিজ্ঞেস করি।

"আমাদের গাঁয়ের বুধন সিংয়ের মেয়ে। অমরের ছোটবেলার খেলার সঙ্গী। ওরা সাদী করতে চায়। কিন্তু দুশো টাকার কমে বুধন সিং মেয়ে দেবে না।"

খুব ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছে অমর। অনেক কষ্টে মা তাকে মানুষ করেছে। কত আশা, অমর একদিন বড় হবে, রোজগার করবে, রাঙা টুকটুকে বৌ আনবে। তিনি পা ছড়িয়ে দাওয়ায় বসে ফরমাশ করবেন। আজ পাঁচদিন হল সেই অমর ঘরে নেই। হয়তো তিনি সেই দাওয়ায় বসেই ভাবছেন—অমর কবে ফিরবে, কত টাকা নিয়ে আসবে, কবে মুনরী আসবে তার ঘরে?

অমর কোন দিনই খুব মিশুক নয়। খেলার সঙ্গী কোন কালেই তার বেশী ছিল না। যারা ছিল তাদের অনেকের সঙ্গেই তার আর যোগাযোগ নেই। এখন তার—সবার উপরে মুনরী সত্য, তাহার উপরে নাই। শৈশবসাথী জীবনসাথী হবে। সে হয়তো কলসী মাথায় সখীদের সঙ্গে চলেছে গাঁয়ের ঝরনায়। হাস্যে ও লাস্যে ঝরনার মতই উচ্ছল হয়ে উঠেছে। সহসা সখীর প্রশ্নে চমকে ওঠে, নিজের অলক্ষেই থমকে দাঁড়ায়। ভাবে—অমর এখন কোথায়? আজ পাঁচদিন হল অমরকে দেখে নি। আরও পঁচিশ দিন অদর্শনের এই যন্ত্রণা সইতে হবে। কিন্তু তার পর? মনে মনে হাসে—তার পর অমর আসবে অনেক টাকা নিয়ে। সেই টাকা দিয়ে সে তাকে কিনে নেবে। অবশেষে এক শুভদিনে শুভক্ষণে···

বদ্রীনাথ! তুমি না করুণার সাগর। তুমি কেন এমন করে মানুষের আশায় বাদ সাধো? অলকানন্দা! তুমি না অলকাপুরীর বিগলিত করুণা ধারায়

সঞ্জীবিত করছ এই মর্ত্যভূমিকে ? তুমি কেন এমন করে দুটি জীবনকে উষর মরুভূমিতে পরিণত করলে ?

"অমরকে কিছু টাকা দেওয়া উচিত।"

অমূল্যের কথায় বাস্তবে ফিরে আসি। "দেওয়া উচিত বৈকি। কিন্তু আমাদের পুঁজি যে বড়ই কম।"

চঞ্চল বলে, "তাহলে নিজেদের মধ্যে চাঁদা তোলা যাক আর অভিযান তহবিল থেকেও কিছু দেওয়া হোক।"

"আমি পঞ্চাশ টাকা দেব।" উপেনবাবু সবার আগে প্রতিশ্রুতি দেন।

ভানু বলে, "আমিও।"

শৈলেশদা অমরের মাথায় একখানি হাত রেখে সস্নেহে বলেন, "কেঁদো না ভাই। আমরা যথাসাধ্য তোমায় সাহায্য করব।"

শের সিং অমরের চোখের জল মুছে দেয়। ভানু তাকে হাত ধরে টেনে তোলে। হাসি ফোটে অমরের ঠোঁটে। এই হাসি সঞ্চারিত হবে তার মা'র ম্লান মুখে—মৃন্ময়ীর কালো-হরিণ চোখে।

এই হাসি আমাদের নীলগিরি পথের পরম পাথেয় হয়ে রইল।

॥ ১১ ॥

আট ঘণ্টা পদচারণার পর বেলা তিনটের সময় আমরা জোশীমঠ পৌছলাম। পথে শুধু অনিমঠে দুধ খাবার জন্যে কয়েক মিনিট থেমেছিলাম। দেবীদাসের কিন্তু শুধু দুধে তৃষ্ণা মেটে নি। সে একটি স্কুলের ছাত্রর সঙ্গে খাতির জমিয়ে তার ঝোলা থেকে বেশ বড় একটি শশা ম্যানেজ করেছিল। খুবই কঠিন পাকদণ্ডী পেরুতে হয়েছে আমাদের। দূরত্ব কমাবার জন্যে আমরা সেই সাততলা বাস-রাস্তা এড়িয়ে পাকদণ্ডী ভেঙেছি। লাভ হয়েছে কতটা জানি না। হয়তো ঐ পথ দিয়ে এলেও সময় বেশী লাগত। কিন্তু নিঃসন্দেহে পরিশ্রম অনেক কম হত।

এখনও জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। চোখে অন্ধকার দেখছি। তাহলেও আনন্দিত হয়েছি। আমরা সিংহদ্বারে পৌছেছি। জোশীমঠ এসেছি। বীরেনের উল্লাসে আমাদের সকল কষ্টের উপশম হল। অথচ বীরেন ধীর স্থির ও সংযমী। এমন মুহূর্তও আসে যখন মানুষ তার প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে যায়।

প্রাণেশ ও টোপগেকে পিপলকোঠিতে রেখে, এই দুর্গম পথ গাড়ি দিয়ে বীরেন একা জোশীমঠ এসেছে। কুলি যোগাড়ের জন্য ঝড় জল মাথায় করে পিচ্ছিল পাহাড়ী পথে পাগলের মত ছুটে বেড়িয়েছে। শের সিংকে পিপলকোঠি রওনা করিয়ে দিয়েও তার মন শান্ত হয় নি। আকাশের দিকে তাকিয়ে অধীর হয়েছে। অনেকেই তাকে নিরুৎসাহ করেছে। তাদের মতে—এই আবহাওয়ায় অভিযান চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু অভিজ্ঞ বীরেন নিরুৎসাহ হয় নি। বেস কমাণ্ডার মেজর উবেরয়ের সাহায্যে শ্রীনগর, কর্ণপ্রয়াগ ও পিপলকোঠির সঙ্গে ওয়ারলেশে যোগাযোগ করেছে। খবর পেয়েছে—আমরা অগ্রসর হচ্ছি। সে ধৈর্য সহকারে প্রতীক্ষা করেছে। আজ তার সেই প্রতীক্ষার অবসান হল। কেন সে উল্লসিত হবে না? কেন সে ছুটে আসবে না? আলিঙ্গনে আমাদের অস্থির করে তুলবে না? প্রশ্নবানে জর্জরিত করবে না?

হঠাৎ বীরেনের খেয়াল হল যে সকালে যা খেয়ে বেরিয়েছি, এখন তার কণামাত্রও আমাদের উদরে অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। বলে, "চলুন বিড়লা রেস্ট হাউসে যাওয়া যাক। দুখানা ঘর নিয়েছি। চৌধুরীদাও সেখানে আছেন।"

"জলযোগের ব্যবস্থা?" আমরা উৎকণ্ঠিত।

"চলুন। আমি সব ব্যবস্থা করছি।"

বিড়লা রেস্ট হাউসে আসা গেল। ফুল বাগানে ঘেরা সুন্দর একখানি দোতলা বাড়ি। আলোহাওয়াযুক্ত বেশ বড় বড় ঘর। দিবারাত্র কলের জল। আমরা একতলায় পাশাপাশি দুখানা ঘর পেয়েছি।

জোশীমঠ শুধু বদ্রীনাথ বাসপথের প্রান্তসীমা নয়, গাড়োয়ালের একটি সমৃদ্ধ জনপদ। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। জগদ্গুরু শঙ্করাচার্যের তপস্যাধন্য এই জোশীমঠ। এখানকার জ্যোতির্মঠ তাঁর প্রতিষ্ঠিত চারিটি মঠের অন্যতম। শত শত যাত্রী প্রতিদিন জোশীমঠ আসেন। যাতায়াতের পথে তারা এই মনোরম মহকুমা শহরে দু একদিন বিশ্রাম করে যান। ফলে এখানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য চটি ও চারিটি ধর্মশালা বা রেস্ট হাউস। যাত্রীদের বড় একটা স্থানাভাব হয় না এখানে কিন্তু এবারে ঘর পেতে নাকি অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে বীরেনকে।

তিব্বতের প্রধান দুটি পথ—মানা ও নীতি গিরিদ্বারের পথ এসে মিলিত হয়েছে এখানে। যুগ যুগ ধরে এই পথে ভারতের সঙ্গে তিব্বতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান চলেছে, অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য চলেছে। আজ জঙ্গী লালচীন গ্রাস করেছে

তিব্বত। নীতিজ্ঞানহীন সেই যুদ্ধবাজদের প্ররোচনায় শান্ত সীমান্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। পুণ্যতীর্থকে পরিণত করতে হচ্ছে প্রতিরক্ষা শিবিরে। জোশীমঠ আজ ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার রক্ষা-কবচ। ফলে যাত্রীদের স্থানাভাব ঘটেছে।

জওয়ানদের ভীড়ে ভরে গেছে বিড়লা রেস্ট হাউস। তীর্থদর্শন স্থগিত থাকতে পারে, কিন্তু ওদের আগমন স্থগিত হলে তীর্থ যাবে, ধর্ম যাবে, দেশ যাবে। তাই ওদের দাবী সবার আগে। মা-বোন স্ত্রী ও সন্তান সবাইকে ছেড়ে যাঁরা যাচ্ছেন তুষারাবৃত সীমান্তে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হানাদারদের রুখতে। জলবায়ু সয়ে নেবার জন্যে (Acclimatisation) এখানে থাকতে হচ্ছে কয়েকদিন। সৈন্য শিবিরে সবার ঠাঁই হচ্ছে না, তাই ওরা ঠাঁই নিয়েছেন এখানে। জওয়ানদের ভীড়ে ভরে গেছে রেস্ট হাউস।

তবু আমরা ঘর পেয়েছি। পেয়েছি মেজর উবেরয়ের চেষ্টায়। গত জুন মাসে, ক্যাপ্টেন জগজিৎ সিংয়ের নেতৃত্বে সেনাদল নীলগিরি জয় করতে পারেন নি। তাঁরা যা পারেন নি, আমরা তাই করতে যাচ্ছি শুনে মেজর উবেরয় বীরেনকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন—এই ঘর দুখানির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠল ভানু—সাড়ে চারটে বাজে। পাঁচটায় পোস্টাফিস বন্ধ। রিপোর্ট পাঠাতে হবে। গৌচরের পরে আর কোন খবর পাঠাতে পারি নি। অমূল্য ও চঞ্চলকে নিয়ে ভানু ছুটল পোস্টাফিসে।

শুয়ে বসে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেওয়া গেল। তারপর একসময় দেবীদাস বলল, "পিনাকীদা এবারে বেরিয়ে পড়া যাক।"

"চলো।" পিনাকী উঠে বসে, শৈলেশদাকে বলে, "বাজারে যেতে হবে। ফর্দটা সঙ্গে নিন।"

"আজীবা।" শৈলেশদা হাঁক দেন।

"সাব্।"

"বাজার জানে হোগা। টাইমকা অভাবমে কলকত্তাসে সব চীজ নেহী লে আনে সকা। ও সব চীজ কিন্‌নে হোগা।"

"জী সাব্।"

"তোমলোগকো হামারা সাথমে জানা হোগা। রেডী হো যাও।"

"হামলোগ তৈয়ার হ্যায় সাব্।"

"তব চলো।"

ওরা চলে গেল। জোশীমঠের পর আমাদের পথে আর কোন বাজার পড়বে না। কাজেই প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখান থেকে কিনে নিতে হবে। এছাড়া আরও অনেক কাজ রয়েছে আমাদের। এখানেই রিপ্যাকিংয়ের কাজ সেরে নিতে হবে। এর পরে আবার প্যাকিং হবে বেসক্যাম্প বা মূল শিবিরে। আরও কুলি যোগাড় করতে হবে এখানে। যে দশজন কুলি ও চব্বিশটি খচ্চর আমরা পেয়েছি, তারা যাবে ঘাংরিয়া পর্যন্ত—ষোল মাইল দূরে লোকপাল ও নন্দন-কাননের পথে একটি জনহীন উপত্যকা। সেখান থেকে নন্দন-কাননের পথ অতি দুর্গম—সে পথে খচ্চর অচল। শুধু খচ্চর নয়, পিপলকোঠির কুলিরাও সে পথে যেতে নারাজ। বীরেন ও প্রাণেশ শের সিংয়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল কুলি যোগাড়ের চেষ্টায়।

বদ্রীনাথ তীর্থপথের বাইরে কোথাও যেতে হলে চামোলী বা জোশীমঠে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ইনার লাইন পারমিট নিতে হয়। আমরা কলকাতা থেকে এখানকার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এইচ. দেবরালকে চিঠি দিয়েছিলাম। উত্তরে তহশীলদার শ্রী পি. ডি. পন্থ আশ্বাস দিয়েছেন, এখানে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেই আমরা পারমিট পেয়ে যাব। অমূল্যরা ফেরার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসবে।

জোশীমঠের মারফতই আমাদের কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। এর পরে আমাদের ঠিকানা—কেয়ার অভ্ পোস্টমাস্টার, জোশীমঠ। বেস-ক্যাম্প থেকে রানার ডাক এনে পোস্টমাস্টারের হাতে দেবে ও তাঁর কাছ থেকে আমাদের চিঠিপত্র নিয়ে ফিরে যাবে।

সন্ধ্যের পর অমূল্যরা ফিরে এল। জিজ্ঞেস করলাম, "এত দেরি হল যে ?"

"বাঃ আমরা যে বাজার ঘুরে তহশীলদারের সঙ্গে দেখা করে ফর্ম নিয়ে এলাম।" অমূল্য উত্তর দেয়।

"সেজন্যে এত দেরি হয় নি।" চঞ্চল প্রতিবাদ করে।

"কি জন্যে ?" জিজ্ঞেস করি।

"কম্পিটিশান চলছিল।"

"কিসের ?"

"লিপিলেখার।"

"কাদের মধ্যে ?"

"নেতা ও সহনেতার।"

"জিতল কে?"

"শেষ পর্যন্ত কাউন্ট করে উঠতে পারি নি। তবে খুবই কীন্ কন্টেস্ট হয়েছে।"

॥ ১২ ॥

"কৌন হ্যায়?"

"ম্যায় শের সিং সাব্।"

এই সাত সকালে আবার শের সিং কেন? কাল রাতেই তো কুলি সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কুলি এজেন্সির মালিক ঈশ্বর সিং নিজে এসে অগ্রিম নিয়ে, কাগজ পত্র সই করে দিয়ে গেছেন। আরও পনের জন স্থানীয় কুলি যোগাড় হয়েছে। ওরা অভিযান শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবে এবং ২০,০০০ ফুট পর্যন্ত মাল বইবে। বরফের ওপর কাজ করলে দৈনিক এক টাকা করে বাড়তি মজুরী পাবে। কিন্তু এখন আবার শের সিংয়ের আগমন কেন?

তাড়াতাড়ি দরজা খুলি।

"সাব। সব আদমী বিগড় গিয়া।"

আদমী মানে কুলি তা বুঝতে পারছি। কিন্তু তারা বিগড়ে গেল কেন? শের সিং জানায়,—"পুরা গরম পোশাক না পেলে ওরা এক পাও নড়বে না।"

"কিন্তু কাল যে টাকা নিয়ে সবাই টিপসই করে দিয়ে গেল?"

"টিপসই দিলে কি হবে সাব? যদি হাওয়া হয়ে যায়? কি করব? একা কজনকে সামলাব?"

"তুমি কি করতে বলো?"

"ওদের দাবী মেনে নিতেই হবে।"

"কত করে লাগবে?"

"আপনাদের কাউকে যেতে হবে দোকানে।"

"বেশ চলো।" আর সময় নষ্ট না করে পিনাকী শের সিংকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে চঞ্চল বলে, "তাহলে আজকের দিনটাও গেল।"

"তাই তো দেখতে পাচ্ছি। রেডিমেড তো আর পাওয়া যাবে না, সব তৈরী করাতে হবে।" নিরাপদ বলে।

"কত করে লাগবে মনে হয় হে ?" শৈলেশদা নিজের পোর্টফোলিও নিয়ে ব্যস্ত।

"পিনাকীদা এলেই জানা যাবে।" প্রাণেশ উত্তর দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে শৈলেশদা বলে ওঠেন, "তোমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না।"

প্রাণেশ চুপ করে থাকে। আমি বলি, "চলো প্রাণেশ একটু ঘুরে আসা যাক।"

"কিন্তু বৃষ্টি নেমেছে যে ?"

"না বলে ডাক্তারের ছাতাটা নিয়ে নাও।"

ডাক্তার আড়-চোখে আমার দিকে তাকায়। ছাতা মাথায় আমরা নেমে আসি বড় রাস্তায়। বাস স্ট্যাণ্ড পেরিয়ে এগিয়ে চলি সিংহদ্বারের দিকে। হঠাৎ থেমে যায় প্রাণেশ। জিজ্ঞেস করি, "থামলে কেন ?"

"আপেল কিনব।"

"আপেল নয়, এখানে বলে সেও। খুব টক হবে কিন্তু।"

"তা হলেও খেতে ভাল। খুব সস্তা। মাত্র দেড় টাকা সের।" বড় দেখে দুটি আপেল নিয়ে প্রাণেশ একটি আমার হাতে দেয়। বলে, "কিছু আপেল নিয়ে যাবেন নাকি আমাদের সঙ্গে ?"

"পিনাকী বলছে এক বাক্স নেবে।"

প্রাণেশ খুশী হয়। আমরা লক্ষ্যহীন ভাবে বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকি। মোটে আটটা বাজে। দশটার আগে পোস্টাফিস ও তহশীলদারের অফিস খুলবে না। বেরিয়েই যখন পড়েছি, ডাকের বন্দোবস্ত পাকা করে ও পারমিটগুলো যোগাড় করে রেস্ট হাউসে ফিরব। ঘুরে ফিরে এই দু ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দেওয়া যাক। প্যাকিংয়ের কাজ কাল রাতেই প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কেনাকাটাও প্রায় শেষ। কুলি সমস্যার সমাধান করতে পারলেই আমরা রওনা হতে পারি।

সিংহদ্বারের বাজার ছাড়িয়ে আমরা সেনানিবাসের দিকে হাঁটছি। নীচেই নতুন বাসপথ—প্রসারিত হচ্ছে বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্যন্ত। সে পথের দু ধারে ধাপে ধাপে ক্ষেত—পাহাড়ের গায়ে কি বিচিত্র আলপনা!

"আরে! এ যে দেখছি একটি হাতি। হাঁটু গেড়ে বসে আছে। কিন্তু হাতি পর্বত তো নন্দন-কাননের কাছে। আর হাতি পর্বত নাকি হাতির মত নয়। কাল আসার সময় তো পাহাড়টা দেখি নি।" প্রাণেশ বিস্মিত।

"কাল আসার সময় দেখার মত অবস্থা ছিল না প্রাণেশ। তাই খেয়াল কর নি।

এর আসল নাম কি বলতে পারি না। তবে স্থানীয় লোকেরা ওকেই হাতি পাহাড় বলে। ওপারে ঐ যে দুটি গ্রাম দেখছ—ওদের নাম চাই ও থাই। চীনারা ও গ্রাম দুটি দাবী করেছে।"

"আরে চীনাদের কথা ছেড়ে দিন। পাগলে কি না চায় ওরা তো বদ্রীনাথও চাইছে…"

"নীলগিরিও চেয়েছে।"

মিলিটারী পোশাক পরা এক ভদ্রলোক কিছুক্ষণ থেকেই আমাদের পেছন পেছন আসছিলেন। প্রাণেশের কথার মাঝেই তিনি হঠাৎ বাংলায় বলে ওঠেন।

আমরা অবাক হয়ে পিছনে তকিয়ে বলি, "চাইলেই পাওয়া যায় না।"

"নিশ্চয়ই। অন্যায় দাবীর একটা সীমা থাকা উচিত।" ভদ্রলোক উত্তর দেন।

"যদি তারা সে সীমা লঙ্ঘন করতে চায়?"

"উপযুক্ত শাস্তি পাবে।"

"কিন্তু আপনি…?"

"আমার নাম বিকাশ ভৌমিক। মাস দেড়েক হল এখানে এসেছি। আবার আজই চলে যাচ্ছি।"

"কোথায়?"

"হট স্প্রিংয়ে।"

"সে আবার কোথায়?"

"লাদাক তিব্বত সীমান্তের একটি ভারতীয় ঘাঁটি। সেখানে কয়েকটা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। চুশুল কিম্বা থয়েস বিমানক্ষেত্রে নেমে কিছুদূর জীপে গিয়ে তার পর হেঁটে যেতে হয়।" একটু থেমে ভদ্রলোক আবার বলেন, "চলুন না আমার তাঁবুতে। কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে। আর কতক্ষণই বা আছি এখানে।"

মাঝারি আকারের একটি তাঁবুতে এসে ঢুকলাম। কাঠের তক্তা পাতা। আসবাব-পত্র বলতে একটি খাটিয়া ও একটি টেবিল। টেবিলের ওপর কবিগুরুর একখানি বাঁধানো ছবি। সামনে কয়েকটি তাজা রঙীন ফুল। ধূপের স্নিগ্ধ সুবাসে আমোদিত হয়ে আছে তাঁবুর বাতাস। জিজ্ঞেস করি, "কোন বিশেষ কারণে আজই কবির প্রতি আপনার পক্ষপাতিত্ব, না এ আপনার নিত্যকর্মপদ্ধতি?"

"কবিতার সঙ্গে সম্পর্ক তো শেষ হয়ে গেছে। তাই কবিকে পুজো করে স্মৃতিটুকু বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছি।"

"যুদ্ধের ধ্বংসলীলার হাত থেকে আপনি কেমন করে সে স্মৃতিকে রক্ষা করবেন?"

"কেন? কাজী নজরুল পারেন নি? বায়রন ও ওয়েন পারেন নি?"

একজন লোক কফি ও বিস্কুট নিয়ে তাঁবুতে ঢোকে। পরিবেশন করে চলে যায়। বিকাশ বলে, "কিন্তু এই ঝড়জলের মধ্যে আপনারা পারবেন কি নীলগিরি জয় করতে?...আমাদের এ ব্যারাকেও কয়েকজন মাউণ্টেনিয়ার্স আছেন। তাঁরা তো বলছেন আপনারা দুঃসাহসী।"

"ঠিকই বলেছেন।" প্রাণেশ উত্তর দেয়, "দুঃসাহসী না হলে পর্বতারোহী হওয়া যায় না। নীলগিরি বম্বে মাউণ্টেনিয়ারিং কমিটিকে পরাজিত করেছে, আর্মি টিমকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বার বার তিনবার। এবার তাকে হার মানতেই হবে।"

"আপনাদের অভিযান সার্থক হোক। তবে আমি এই ঝড় জলের জন্যে ভয় পাচ্ছি।"

"কিন্তু জানেন তো—'জল ভরা মেঘ রয় না চিরকাল'...।"

আমার কথায় বিস্মিত হয় বিকাশ। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "চিরকাল বলতে গীতিকার কি বোঝাতে চেয়েছেন জানি না। তবে এই গান অনেকের জীবনেই সত্য নয়।" বিকাশ যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। প্রাণেশও কোন কথা বলছে না। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। এমন হাসিখুশী লোকটি হঠাৎ এরকম হয়ে গেল কেন?

বলি, "কবিগুরু ও কাজী যার জীবনের আদর্শ, তার কি এমন নৈরাশ্যবাদী হওয়া উচিত?"

"আমি নৈরাশ্যবাদী নই। হলে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতাম না। কিন্তু গানের ঐ কথাটি সবার জীবনে সত্য হয় না। আমার জীবনেও হয় নি।"

আমাদের অনুরোধে বিকাশ শুরু করে—বিকাশের বয়স যখন নয়, ছোট বোন বীথিকার ছয় তখন ওদের মা মারা যান। বাবা একটা মার্চেণ্ট অফিসে কাজ করতেন। নটা ছটা ডিউটি করেও ছেলেমেয়ের প্রতি যথেষ্ট নজর ছিল তাঁর। বহু যত্ন ও শ্রমে তিনি মানুষ করেছেন ওদের। গত বছর বি. এ. পাশ করার পর বাবা বীথিকার বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। বিকাশ সে বিয়েতে যেতে পারে নি। সে তখন সবে লেফ্‌টেন্যাণ্ট হয়েছে, ছুটি পায় নি। ছুটি পেয়েছে এক বছর বাদে গত জুলাই মাসে। তখন বীথিকার বরের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তবে আলাপ

জমাবার ফুরসুত পায় নি। বিকাশ ব্যস্ত ছিল নিজেকে নিয়ে—অনীতাকে নিয়ে। আর সবাই ব্যস্ত ছিলেন ওদের দুজনকে নিয়ে।

বাবার অনেক দিনের আশা। শুধু বাবার আশাই বা কেন? বাবার বন্ধু অনিমেষ বাবুর আশাই কি কম ছিল? তার ছোট মেয়ে অনীতার সঙ্গে বিকাশের ছোটবেলা থেকে জানাশোনা। বীথিকার সহপাঠী, এক পাড়ায় বাস, এক সঙ্গেই বড় হয়েছে দুজনে। যতই বড় হয়েছে, ততই বেশী কারণে অকারণে সময়ে অসময়ে বিকাশ গেছে অনীতাদের বাড়ি, অনীতা এসেছে তাদের বাড়ি। মুচকি হেসেছে বীথিকা, হয়তো বা দুই পিতাও। তবে খুশীই হয়েছেন তাঁরা। অনেকদিনের আশা বন্ধুত্বকে আত্মীয়তায় রূপান্তরিত করবেন।

বিকাশ আর অনীতার আশাই বা কিছু কম ছিল কি? বিকাশ যেবার ফোর্থ ইয়ারে, অনীতা ও বীথিকা সেবার এসে ভর্তি হল কলেজে। বহু কষ্টে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে ওরা বেরিয়ে আসত বাইরে। কফি হাউসের এক কোণে গিয়ে বসত দুজনে। সময় যেত বয়ে, কিন্তু কথা ফুরত না। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠত অনীতা। পাঁচটা বাজে।

বিকাশ ভাবত—পাঁচটা রোজই বাজবে। কিন্তু এমন লগ্ন যে আর আসবে না তাদের জীবনে।

আবার পরক্ষণেই নিজের নৈরাশ্যবাদী মনকে ধিক্কার দিয়ে মনে মনে বলত—এর চেয়েও মধুর লগ্ন আসবে তাদের জীবনে।

কবে? ভাবনার জট জটিল হত, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর মিলত না।

সে লগ্ন কিন্তু সত্যই এসেছে। তবে অনেক দিন বাদে—প্রায় চার বছর পরে। এর মধ্যে অনেক অদল বদল হয়ে গেছে। বি. এ. পাশ করে বিকাশ কমিশন পেয়ে যোগ দিয়েছে সেনাবাহিনীতে। সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট থেকে লেফটেন্যাণ্ট হয়েছে। অনীতাও বি. এ. পাশ করেছে। বছরে একবার বিকাশ কলকাতায় গিয়েছে। শুধু গতবছরই ছুটি পায় নি। তবে অনীতা নিয়মিত চিঠি লিখেছে। কিন্তু কথাটা জানায় নি তাকে। বিকাশ জানতেই পারে নি—সেই মধু-লগ্ন হয়েছে সমাগত।

গত জুলাই মাসে বিকাশ দু মাসের ছুটি পেয়ে কলকাতায় গেল। পাঠানকোট এক্সপ্রেস শেয়ালদায় থামল। তাড়াহুড়ো করে গাড়ি থেকে নামল। কিন্তু এত তাড়াহুড়োর প্রয়োজন ছিল না। স্বামীর সঙ্গে বীথিকা একা এসেছে স্টেশনে। অনীতা কোথায়? সে যে তাকে আসতে লিখেছিল। কেন এল না? এমন

তো কোনদিন হয় নি। একটা অজানা আশঙ্কায় মনটা কেঁপে ওঠে। তাহলেও বীথিকা ছোট বোন। সঙ্গে নতুন জামাই। হেসেই কথা বলতে হয়।

কিন্তু ধৈর্যের একটা সীমা আছে। ট্যাক্সীতে বসে আর কথাটা চেপে রাখতে পারে না সে। সকলের কুশল সংবাদ জানার ছলে একসময় জিজ্ঞেস করে ফেলে ওদের খবর।

বীথিকা যেন আকাশ থেকে পড়ে। নতুন জামাই বেচারা অরুণকে কিন্তু আকাশের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয়েছে।

বীথিকা পাল্টা প্রশ্ন করেছে—কেন বিকাশ কি অনীতার চিঠি পায় নি। তারপর বলেছে অনীতা ভাল আছে। আর কাকাবাবু কাকীমাকে তো এখন ভাল থাকতেই হবে। আগামী সোমবার যে অনীতার বিয়ে।

কার বিয়ে! নীতার! বিকাশ বিচলিত হয়েছে।

বীথিকা আর গম্ভীর থাকতে পারে নি। বলেছে—ভয় নেই। তার সঙ্গেই অনীতার বিয়ে।

অরুণ আকাশ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে বিকাশের দিকে তাকিয়েছে। আর তাকিয়েই নতুন পরিচয়ের ব্যবধান ভুলে হেসে ফেলেছে। বিকাশেরও হাসি ফিরে এসেছে। বুঝতে পেরেছে—বাবা ও কাকাবাবু কথাটা তাকে জানাবার দরকার মনে করেন নি।

সোমবারের তখনও চারদিন বাকি। দিন নয় যুগ—চার যুগ। অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত কাকাবাবু কাকীমার সঙ্গে দেখা করতে বিকাশ একবার ওবাড়ি গিয়েছিল। কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াস। অনীতা ছাড়া আর সবার সঙ্গেই দেখা হয়েছে।

অবশেষে শানাই বাজল। এল সেই বহু প্রতীক্ষিত লগ্ন। কত দিন বাদে দেখা। অথচ বিকাশের চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিল অনীতা। এ কি সেই চটুল চপল অনীতা? ওর দৃষ্টিতে এত লজ্জা, এত নম্রতা, এত গভীরতা তো আর কোনদিন দেখে নি বিকাশ। তার হাতের মুঠোয় অনীতার একখানি হাত থেকে থেকে কেবলি কেঁপে কেঁপে উঠেছে। এ কম্পন ছিল বহুক্ষণ। ছিল বিয়ে বাড়ির কল-কোলাহল মিলিয়ে যাবার পরেও। বিকাশের বুকে মুখ লুকিয়ে বারে বারে কেঁপে উঠছিল অনীতা—ঝড়ের হাওয়ায় যেমন করে কাঁপতে থাকে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। অনীতার মাথায় হাত বুলিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বিকাশ বলেছিল—এতদিনে সেই মধুর লগ্ন এসেছে। লগ্ন যে বৃথা বয়ে যাচ্ছে। তবু অনীতার

ভয় যায় নি, বোধহয় তার মনে হয়েছে—সেই আনন্দ, সেই সুখ, সেই পাওয়া—সবই স্বপ্ন। অত তার সইবে না।

অনেক কথা আর হাসি দিয়ে বিকাশ তার ভয় জয় করেছিল। অনীতা আগের মত উচ্ছলকণ্ঠে বলেছিল—সে সব সইতে পারবে, কিন্তু আর তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।

বিকাশ বুঝিয়েছে—তার যে ছুটি ফুরোলেই চলে যেতে হবে জোশীমঠ। জোশীমঠ তো ফ্যামিলী স্টেশন নয়।

অনীতা বোঝে নি। বলেছে—না হোক। কত অফিসার নন-ফ্যামিলী স্টেশনে বাড়ি ভাড়া করে ফ্যামিলী নিয়ে থাকেন। তারাও তাঁদের মত থাকবে। তাছাড়া জোশীমঠ চমৎকার জায়গা। বদ্রীনাথ খুবই কাছে। সুযোগ-মত দুজনে একবার বদ্রীনারায়ণকে প্রণাম করে আসবে।

এমনি কত আশা আর কত কল্পনার মাঝে সেই শ্রান্তিহীনা রজনীর মিলন মধুর প্রহরগুলো কোথায় হারিয়ে গেল, টের পেল না ওরা। হঠাৎ কে কড়া নাড়ে। ওরা চুপ করে থাকে। বিকাশ ভাবে—ঠানদি ও শালীর দল রাত না ফুরোতেই হামলা করতে এসেছে। কিন্তু শব্দটা ক্রমেই চলে বেড়ে। আর চুপ করে থাকতে পারে না। কদিন থেকেই বাবার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি দরজা খোলে বিকাশ। অরুণ দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে একজন পিয়ন। বিকাশের একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম এসেছে।

সই করে পিয়নের কাছ থেকে খামটা নিয়ে খুলে ফেলে বিকাশ। তার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অনীতা উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—কোন খারাপ খবর কিনা?

নিঃশব্দে বিকাশ কাগজখানি তার হাতে দেয়। অনীতা পড়ে—Leave cancelled stop report Joshimath immediately……

কাহিনী শেষ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে বিকাশ। হয়তো আরও কিছু আশা করেছিলাম, কিংবা আশঙ্কা। কিন্তু আর কিছুই বক্তব্য নেই তার।

মনে মনে কোথায় যেন একটা ছন্দপতন অনুভব করি। ক্ষণেকের বিরহ। অল্প কিছুদিনের। লড়াই বাধলে হয়তো বিপদ ঘটাতে পারে—কিন্তু সে তো একটা সম্ভাবনা মাত্র। তাতে এত বিচলিত হবার কী আছে।

সেই কথাই বলে আসি। আশ্বাস ও অভয় দিই, উৎসাহিত করি। বলি,

"কবিরা ঋষি, সর্বদর্শী। তাঁদের কথা সত্য বলে মনে করবেন। 'জলভরা মেঘ রয় না, রয় না চিরকাল'।"

॥ ১৩ ॥

হিস্…স্…স্…। কিসের শব্দ? অজগর নাকি? তাড়াতাড়ি স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসি। অমূল্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। জিজ্ঞেস করি, "কি একটা শব্দ হল?"

"হ্যাঁ, আপনার এয়ার-ম্যাট্রেসের হাওয়া বেরিয়ে গেল।"

"কেমন করে?"

"ছিপি খুলে। কাজটা এগিয়ে রাখলাম আর কি।"

"তার মানে তোমার কীর্তি?"

"পাঁচটা বাজে। ছটার মধ্যেই যে বেরিয়ে পড়তে হবে।"

অমূল্য একা নয়। চঞ্চল আর পিনাকীও ওর দলে! একই উপায়ে ওরা সবাইকে ঘুম থেকে তুলেছে।

আমরা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। একটু বাদেই সদলবলে শের সিং এসে হাজির হল। ওকে দেখে প্রাণে বল এল। ভয় ছিল আবার পিপলকোঠির মত না করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা মালপত্র নিয়ে রওনা হয়ে গেল। যাবার আগে শৈলেশদা ওদের উপদেশ দিতে ভুললেন না, "বিষ্ণুপ্রয়াগের আগে প্রায় শ খানেক ফুট রাস্তা ধসে গেছে। পিঠ থেকে মাল নামিয়ে খুব সাবধানে খচ্চরগুলোকে পার করবে—অমর সিংকা খচ্চরকা বাত্ ভুলো মাত্।"

এ উপদেশ দেবার অধিকার শৈলেশদার অবশ্যই আছে। রাস্তা ধসে গেছে খবর পেয়ে কাল বিকেলে নিতাইকে নিয়ে তিনি তদন্তে বেরিয়েছিলেন। জরীপ করে ফিরে এসেই অভয় বাণী দিয়েছেন, "যত সব বাজে গুজব। তেমন কিছুই নয়। যাওয়া যাবে।"

ঠিক ছটার সময় যে যার রুকস্যাক পিঠে নিয়ে বিড়লা রেস্ট হাউস থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এলাম বদ্রীনাথ মন্দির কমিটির ক্যান্টিনে। চা ও পুরী দিয়ে ব্রেকফাস্ট হল। ইতিমধ্যেই ক্যান্টিনের সামনে বেশ ভীড় জমে উঠেছে।

জানা অজানা বহু শুভানুধ্যায়ী আমাদের বিদায় জানাতে এসেছেন।

অবশেষে বিদায় নেবার পালা এল। সবার শুভেচ্ছা ও শুভাশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমরা হাসিমুখে বিদায় নিলাম। এ বিদায় চিরবিদায় নয়। আমরা আসব ফিরে। আসব বিজয়-মুকুট মাথায় পরে। ওঁরা আমাদের পথ চেয়ে থাকবেন, আমাদের ফিরে আসার দিন গুনবেন। সেই দিনকে ত্বরান্বিত করতে, আমরা ত্বরিত পদক্ষেপে চলেছি এগিয়ে। চলেছি নীল দুর্গমের দিকে।

এমনি করেই এগিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীগুরুদয়াল সিং ১৯৫১ সালে গাড়োয়ালের বিখ্যাত ত্রিশুল (২৩,৩৬০ ফুট) পর্বত শৃঙ্গের দিকে। যদিও তাঁর সঙ্গে রয়. ডি. গ্রীনউড নামে একজন ইংরেজ ছিলেন, তাহলেও এই অভিযানই প্রথম ভারতীয় পর্বতাভিযান। অভিযাত্রীদের অপর দুজন হলেন এন. ডি. জয়াল ও সুরেন্দ্রলাল। তাঁরা ২১শে জুন তুষারময় ত্রিশুল শৃঙ্গ জয় করে বিশ্বের পর্বতারোহণের ইতিহাসে ভারতের নাম লিপিবদ্ধ করলেন।

১৯৫২ সালে শ্রী পি. এন. নিকোরের নেতৃত্বে চারজনের এক ভারতীয় দল কুমায়ুনের পঞ্চুলী (২২,৬৫০ ফুট) শৃঙ্গে অভিযান চালিয়ে পরাজিত হন। কিন্তু নিকোরে এই পরাজয় মেনে নিলেন না। পুনরায় নতুন উদ্যমে অভিযান চালিয়ে পরের বছর ২৭শে মে সফলকাম হলেন। এই সাফল্য অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ। কারণ এর আগে (১৯৫০ ও ১৯৫১) সালে তিন দল বিদেশী অভিযাত্রীকে পঞ্চুলি পরাজিত করেছে।

১৯৫৩ সালে ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে একজন নতুন নেতার নাম লিখিত হল—মেজর এন. ডি. জয়াল। তাঁর নেতৃত্বে গাড়োয়ালের কামেট (২৫,৪৪৭ ফুট) ও আবিগামিন (২৪,১৩০ ফুট) অভিযান পরিচালিত হয়। ১৭ই জুন আবিগামিন বিজিত হল, কিন্তু কামেট রইল অপরাজিত। জয়াল হাল ছাড়লেন না। ১৯৫৫ সালে আবার যাত্রা করলেন। এবারে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হল—একই দিনে ৬ই জুলাই ঐ দুটি শৃঙ্গ জয় করে তিনি এক নতুন নজীর স্থাপন করলেন।

পরের বছর ১২ই জুন শ্রী কেকি বুনশা আবার ত্রিশুল জয় করলেন। একই সময় শ্রী গুরুদয়াল সিং পশ্চিম গাড়োয়ালের মৃগথুনি (২২,৪৯০ ফুট) জয়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দলের অন্যতম সদস্য শ্রী এন. চক্রবর্তীর আকস্মিক মৃত্যুতে এই অভিযান পরিত্যক্ত হয়। এই বছরই ২৫শে জুলাই মেজর জয়ালের নেতৃত্বে লাদাকের সাকাং (২৪,১৫০ ফুট) শৃঙ্গ বিজিত হল। আমাদের টৌপগে

সে শিখর-বিজয়ীদের অন্যতম।

তারপরই মেজর জয়ালের সেই বিখ্যাত নন্দাদেবী অভিযান। নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫ ফুট) ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। শের সিংএর টিলমন্ সাব্ (এইচ. ডবলু. টিলম্যান) ১৯৩৬ সালের ২৯শে আগস্ট প্রথম এই শৃঙ্গ বিজয় করেন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কবলে পড়ে মাত্র সাড়ে ছশ ফুট বাকি থাকতে জয়ালকে নন্দাদেবী থেকে ফিরে আসতে হয়। নন্দাদেবী নীলগিরির মত আজও ভারতীয় পর্বতারোহীদের কাছে অপরাজিত। কিন্তু জয়ালের এই গৌরবময় অভিযান চিরকাল আমাদের পরম উৎসাহ ও চরম উদ্দীপনার উৎস হয়ে থাকবে।

১৯৫৮ সালে তিনটি ভারতীয় অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র কুমারের পরিচালনায় স্থল ও নৌ বাহিনীর একদল অভিযাত্রী তৃতীয়বার ত্রিশূল জয় করেন। শ্রী গুরুদয়াল সিং ১৯শে জুন তারিখে মৃগথুনি বিজয় করে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এ বছরই কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকুল্যে পূর্ব নেপালের বিখ্যাত শৃঙ্গ চো-উ (২৬,৭৫০ ফুট) অভিযান আয়োজিত হয়। শ্রী কেকি বুনশা এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। ১৫ই মে শ্রী সোনম গিয়াত্সো ও পাসাং দাওয়া লামার সঙ্গে শ্রী বুনশা এই শিখরে আরোহণ করেন সত্য, কিন্তু তাঁদের বিজয়ের আনন্দ বিষাদের পরশে ম্লান হয়ে যায়। এই অভিযানে ভারত ডালি দিয়েছে তার তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বতারোহীকে—ভারতের পর্বতারোহণের ইতিহাসে যাঁর নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

'ইয়ে রাস্তা সির্ফ খালি খচ্চরকে লিয়ে।' সাইন বোর্ডটায় নজর পড়তেই চমকে উঠি। বাস্তবে ফিরে আসি। একি কাণ্ড! যে রাস্তা দিয়ে আমরা এতগুলো দ্বিপদ প্রাণী এতক্ষণ ধরে উৎরাই ভেঙেছি, সেই রাস্তা স্রেফ খালি খচ্চরের জন্যে। মাঝে মাঝে হামাগুড়ি দিতে হয়েছে বলে কি আমরা চতুষ্পদ হয়ে গেছি? চঞ্চল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়, "না না, মানুষের যেতে বাধা নেই। রাস্তা খারাপ বলে মাল সমেত খচ্চর যাওয়া নিষেধ। তবে খালি খচ্চর যেতে পারে। তাই এই সাইনবোর্ড।"

কর্তৃপক্ষের ভাষাজ্ঞানকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা সেই খালি খচ্চরের রাস্তা দিয়েই এগিয়ে চলি।

বাঁচা গেল। "আপাততঃ উৎরাই শেষ হল।" ডাক্তার হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আমরা ধৌলীগঙ্গা বা বিষ্ণুগঙ্গার তীরে এসে পৌঁছেছি। সামনেই বিষ্ণুগঙ্গার

ওপর ১৩০ ফুট লম্বা লোহার পুল। ফিকে নীল বিষ্ণুগঙ্গা এসে গৈরিক অলকানন্দায় মিলিত হয়েছে এখানে—এই বিষ্ণুপ্রয়াগে। হিমালয়ের পঞ্চপ্রয়াগের পঞ্চম প্রয়াগ—বিষ্ণুতীর্থ বিষ্ণুপ্রয়াগ।

"মহারাজ এই হচ্ছে সেই গাঁয়ের পথ।" পিনাকী বাঁ দিকের পাহাড়টা দেখিয়ে দেয়, "অবিশ্যি এখান থেকে দূর, আর গ্রামটা অনেক উঁচুতে। খুবই চড়াই পথ।"

সে এক মজার গ্রাম। নামটা মনে নেই পিনাকীর। তবে এমন গ্রাম ভূভারতে আছে বলে জানতাম না। প্রমীলার দেশের কথা পড়েছি। কিন্তু সে দেশেও অর্জুনের প্রয়োজন হয়েছিল। এ গ্রাম নাকি এখনও প্রমীলাবর্জিত। গ্রামের বাসিন্দারা সবাই পুরুষ। আর সকলেই অকৃতদার।

শৈলেশদা এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন সেই সঙ্কীর্ণ পথরেখার দিকে। সহসা আপন মনে বলে উঠলেন, "কতবার তো এই পথে গিয়েছি, কিন্তু এমন স্বর্গাদপি গরীয়সী গ্রামের কথা তো কখনও শুনি নি।"

তাহলে কি আমাদের অনুমান মিথ্যে নয়? এই অভিযানে আসা নিয়ে শৈলেশদার সঙ্গে বৌদির একটু মনোমালিন্য হয়েছে?

"শুনলে কি করতেন?"

"একবার গিয়ে দর্শন করে আসতাম সেই মহাপুরুষদের।"

আমার সঙ্গে কারও কোন মনোমালিন্য হয় নি তবু আমি ভাবি সেই মহাপুরুষদের কথা। পিনাকী বলেছে—তাঁরা সকলেই মধ্য-বয়সী। শৈলেশদার স্বর্গাদপি গরীয়সী গ্রাম যে কিছুকালের মধ্যেই জনশূন্য হয়ে যাবে।

বিষ্ণুগঙ্গার পুল পেরিয়েই বিষ্ণুমন্দির। মন্দিরের পেছনে সঙ্গম। প্রায় দেড়শ ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে সঙ্গমের জল স্পর্শ করতে হয়।

এখন সে অবকাশ নেই। কাজেই দেবর্ষি নারদের তপস্যাধন্য বিষ্ণুতীর্থ বিষ্ণুপ্রয়াগকে দূর থেকে প্রণাম করে আমরা এগিয়ে চলি। অনেক চড়াই ভাঙতে হবে। পৌঁছতে হবে গোবিন্দঘাট। এক ঘণ্টা হেঁটে আমরা মাত্র মাইল দুয়েক এগিয়েছি। এতক্ষণ আমাদের একটানা উৎরাই ভেঙ্গে প্রায় ১৭০০ ফুট নেমে আসতে হয়েছে। বিষ্ণুপ্রয়াগের উচ্চতা ৪৫০০ ফুট। এবারে আবার চড়াই। গোবিন্দঘাটের উচ্চতা ৬০০০ ফুট।

এক সময় রওনা দিলেও আর আমরা এক সঙ্গে চলছি না। বীরেন ও প্রাণেশ এগিয়ে গেছে। শৈলেশদাকে নিয়ে পিনাকীও এগিয়ে গেল। উপেনবাবু তাঁর

প্রধান সহকারী কারকিকে নিয়ে আসছেন সবার পেছনে। পথের দু ধারে গাছপালা দেখে তিনি লোভ সামলাতে পারেন নি। প্রজাতি সংগ্রহ শুরু করে দিয়েছেন।

গাছ ভালবাসলেও উপেনবাবু গেছো নন। গেছো বলতে বোধ হয় অমূল্যকেই বোঝায়। পথের ধারে একটি বড গাছে বসে আছে অমূল্য। ফুল পাড়ছে। কার জন্যে কে জানে।

অমূল্যকে তাড়াতাড়ি নেমে আসতে বলে এগিয়ে চলি। আবার ভাবতে থাকি মেজর জয়ালের কথা। তাঁর সাফল্যময় সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী চিরকাল ভারতের পর্বতারোহণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। শৈশবেই তাঁর অসাধারণ পর্বতপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে একটি সহপাঠীর সঙ্গে মেষপালকদের দুর্গম পথে ছ সপ্তাহ হেঁটে কোলাই হিমবাহ ও জোজিলা গিরিবর্ত (১১,৫৮০ ফুট) পার হয়ে অমরনাথ দর্শন করেন। ১৯৪২ সালে তিনি আর. এল. হোল্ডসওয়ার্থ ও জে. এ. কে. মার্টিনের সঙ্গে আরোয়া হিমবাহে (বদ্রীনাথের ওপরে) ১৯০০০ ফুট উঁচুতে শিবির স্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালে জ্যাক গিবসনের বন্দরপুছ (যমুনোত্রীর ওপরে) অভিযানে তেনজিংএর সঙ্গে ১৯,৪০০ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর। এই বছরই তিনি আর্মি কমিশন পান। তিনি একজন প্যারাশুটিস্ট ও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ১৯৪৯ সালে তিনি গুলমার্গের আর্মি স্কী স্কুলের শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালে তিনি মেজর পদে উন্নীত হন ও ফরাসী অভিযাত্রীদের সঙ্গে নন্দাদেবী অভিযানে (২২০০০ ফুট) পর্যন্ত আরোহণ করেন। পরের বছর তিনি বেঙ্গল স্যাপার্সের কামেট অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে কামেট ও আবিগামিন অভিযানের নেতৃত্ব করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি দার্জিলিং হিমলায়ান ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কর্মভার গ্রহণের আগে, সুইস ফাউণ্ডেশান ফর এ্যাল্পাইন রিসার্চের অমন্ত্রণে তেনজিং ও কয়েকজন শেরপা সহ সুইজারল্যাণ্ডে যান। সেখানে ট্রেনিং কোর্স (Aiguilles du Tour) এবং রক ক্লাইম্বিং কোর্স (Rosenlani) পাশ করে তিনি গাইডস ডিপ্লোমা ও ব্যাজ পেলেন। তিনিই প্রথম বিদেশী যাঁকে এই সুদুর্লভ সম্মানে ভূষিত করা হয়। পরের বছর কামেট আবিগামিন বিজয়ের পরে তিনি এ্যাল্পাইন ক্লাবের সভ্য নির্বাচিত হন এবং বিলেতে সফর করে আসেন। ১৯৫৬ সালে সাকাং জয় করেন। পরের বছর তিনি অস্ট্রিয়া থেকে স্কী টিচার্স

কোর্স পাশ করেন ও নন্দাদেবী অভিযানে নেতৃত্ব করেন।

তারপর ১৯৫৮। মেজর জয়াল চো-উ অভিযানে অংশ গ্রহণ করার আমন্ত্রণ পেলেন। পেলেন একেবারে শেষ সময়। তিনি ছুটে চললেন মূল শিবিরে। মাত্র একদিন সেখানে বিশ্রাম নিয়ে, জলবায়ু সহ্য হবার আগেই (১৮০০০ ফুট) উঁচুতে হিমবাহের ওপর স্থাপিত এক নম্বর শিবিরে রওনা হলেন। বেপরোয়া না হলে পর্বতাভিযাত্রী হওয়া যায় না। সে দিক থেকে তিনি হয়তো কোন অপরাধ করেন নি। কিন্তু প্রকৃতি এই বেপরোয়া বীরকে বরদাস্ত করতে পারল না। এক নম্বর শিবিরে পৌঁছেই তিনি নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হলেন। সহযাত্রীরা তাঁকে নীচে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু অভিজ্ঞ পর্বতারোহী বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে। তিনি তাদের নিরস্ত করলেন। তাকিয়ে রইলেন সেই অচল অটল ও উদ্ধত পর্বতশৃঙ্গের দিকে। তাঁর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে কি যেন বললেন—বোধহয় আশীর্বাদ করলেন সর্বকালের সকল পর্বতারোহীকে—'May (you) climb from peak to peak.'

চো-উ বিজিত হল। তবে ভারতীয় পর্বতারোহণের জনক মেজর এন. ডি. জয়ালের অকাল মৃত্যুতে ঐ অভিযানে ভারতের যে ক্ষতি হয়েছে তা আজও পূরণ হয় নি। কোনদিন হবে কি না কে জানে ?

কিন্তু জয়াল মৃত্যুহীন। তাঁর অন্তিম মুহূর্তের বাণীকে আমরা সার্থক করে তুলব। তাঁর মৃত্যুর পরে আজ পর্যন্ত চোদ্দটি পর্বত শিখর আমাদের কাছে মাথা নত করেছে। দুবার এভারেস্ট অভিযান হয়েছে এবং বিশ্বের এই উচ্চতম শিখর মাত্র ৩০০ ফুটের জন্যে অপরাজিত রয়েছে।

॥ ১৪ ॥

"মাছের ফ্রাই! আহা, কতদিন খাই নি গোবিন্দঘাটে মাছ পাওয়া যায় বুঝি।" নিতাইয়ের জিভে জল এসে গেছে।

আমরা ঘাট চটিতে একটি চায়ের দোকানের সামনে এসে বসেছি। নিতাই বেশ কিছুক্ষণ থেকেই খাই খাই করছিল। সুযোগ পেয়ে নিরাপদ বলেছিল "এখন তো চা আর পকোড়া খেয়ে নে। এর পর দেখ না গোবিন্দঘাটে গিয়ে কি হয়।"

"কী ?"

"সে এক এলাহী ব্যাপার। তাই তো পিনাকীদা আগে আগে চলে গেলেন। খিচুড়ী আলুর ঝোল মাছির ক্রাই ..." উত্তেজিত নিতাই মাছিকে মাছ শুনে লুব্ধ হয়েছে। তার জিভে জল এসে গেছে।

নিরাপদ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় না। উদাস দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিতাইয়ের থালা থেকে বেশ কয়েকখানা পাকোড়া তুলে নিয়ে ধীরে সুস্থে জানায়, "গোবিন্দঘাটে কেন ? দেখছিস না, এখানেও কত রয়েছে ? চারিদিকে ভন্ ভন্ করছে ?"

নিতাই সত্যি সত্যিই চারিদিক দেখে নেয়। তারপর রেগে গিয়ে বলে, "কোথায় মাছ ?"

"আমি তো মাছ বলি নি।"

"তবে কি বলেছিস ?"

"মাছি।"

কোন আব্‌হাওয়া বিশারদ আমাদের সঙ্গে নেই, তবুও ভেবেছিলাম বৃষ্টি বন্ধ হবে। প্রকৃতির ওপর মানুষের কোন হাত নেই জানি। কিন্তু ভগবান প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি এই শুভ প্রচেষ্টায় আমাদের সহায় হবেন—এ বিশ্বাস ছিল বলেই আমরা জোশীমঠ থেকে গোবিন্দঘাট যাত্রা করেছি। কিন্তু বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হয় নি। ঝির-ঝির ধারায় মাঝেমাঝেই বর্ষণ চলেছে। পিচ্ছিল পথ। কিছুক্ষণ আগেই একটা ঝরনা পেরুতে হিমশিম খেতে হয়েছে। অতি সন্তর্পণে পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে চলেছি। সেই মালবাহী খচ্চরের অতল সমাধির কথা এখনও আমাদের সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে আছে। হয়তো বা ভগবানই আমাদের প্রতি বিরূপ হয়ে প্রকৃতির এই অন্যায় অত্যাচারকে বরদাস্ত করছেন। কিন্তু কেন ? আমরা তো কোন পাপ করি নি।

পাপ না করলেও অনেক সময় প্রায়শ্চিত্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অন্ততঃ শের সিং এতক্ষণ ধরে তাই বোঝাতে চাইছে। বহু অভিযানে অংশ নিয়েছে সে। অভিজ্ঞ শের সিং প্রস্তাব করে, "প্রকৃতির এই অন্যায় অসহযোগিতা থেকে ত্রাণ পাবার একটি মাত্র উপায় আছে।"

আমরা চলা বন্ধ করে তার দিকে তাকালাম। শের সিং বলল, "লাটুদেবীর পুজো দিলে তিনি সদয়া হয়ে প্রকৃতিকে শায়েস্তা করবেন। মানা ও আগের

নীলগিরি অভিযাত্রী দল তাঁর পুজো দিয়ে যথেষ্ট সুফল পেয়েছিলেন।"

আমরা শের সিং-য়ের প্রস্তাবে রাজী হলাম। সে জানাল, "পুজো দিতে একটি পাঁঠা অর্থাৎ অন্তত পঞ্চাশটি টাকার দরকার।"

সামান্য পুঁজি সম্বল করে আমরা এই দুঃসাহসিক অভিযান শুরু করেছি। ইতিমধ্যেই হিসেবের বেশী খরচ হয়ে গেছে। তবুও এই বিরক্তিকর বর্ষণের হাত থেকে রেহাই পেতে আমরা পঞ্চাশ টাকা খরচ করতে প্রস্তুত। ঠিক হল, পথে ভুইন্দার গাঁয়ে পাঁঠা কিনে ঘাংরিয়ায় এই পুজোপার্বনের পালা সাঙ্গ করা হবে।

ভারি সুন্দর গোবিন্দঘাটের শিখ গুরুদ্বারটি সবুজ গম্বুজটি বহুদূর থেকে দেখা যায়। অলকানন্দার তীরে এক একতলা বাড়ি। সামনে মরশুমী ফুলের বাগান। চারিদিকের পাহাড়ে অসংখ্য ছোট ছোট ঝরনা। যেন রূপোর গহনা গায়ে হাস্যময়ী প্রকৃতি আমাদের দেখছে—কাছে ডাকছে। তাই তো আমরা এসেছি ছুটে—চলেছি নীলগিরির শুভ্র-শীতল স্বপ্ন-শিখরে।

ভুইন্দার গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম ছাড়িয়ে আমরা গোবিন্দঘাটে পৌছলাম। জোশীমঠ থেকে সাত মাইল এগিয়েছি। আজ ৩০শে সেপ্টেম্বর। এখন বেলা প্রায় দুটো। ঘাটচটি ও পাণ্ডুকেশ্বরের ঠিক মাঝখানে কয়েকবছর আগে গড়ে উঠেছে এই গোবিন্দঘাট। শিখগুরু গোবিন্দ সিংয়ের নামে এর নাম। লোকপাল-গামী শিখ তীর্থযাত্রীদের প্রয়োজনে তৈরী হয়েছে গুরুদ্বার।

সরকারী ডাকবাংলোটিও ছবির মত। চারিদিকে সুন্দর বাগান। বাংলোর গা ঘেঁসে চলে গেছে একটি আঁকাবাঁকা পথ—মহাপ্রস্থানের পথ। বদ্রীনাথ আরও বারো মাইল। এখান থেকেই আমাদের পথ পৃথক হয়ে গেল। আমরা যাব অলকানন্দার ঐ ঝুলা পেরিয়ে, দুর্গমতর চড়াই পথ দিয়ে ঘাংরিয়া। লোকপাল ও নন্দন-কানন পথের জংশন। এখান থেকে সাত মাইল।

আজ থেকে আমাদের হাঁড়ি চড়বে। হাঁড়ি নয় ডেকৃচি। আজ থেকে আমাদের স্বপাক শুরু। আং ছুতার রান্না চড়িয়েছে। ওর জুতো সেলাই দেখেছি। এখন দেখা যাক কেমন রান্না করে।

১লা আক্টোবর। আজ আমাদের সারাদিন চড়াই ভাঙ্গতে হবে। গোবিন্দঘাট থেকে ঘাংরিয়া। সাত মাইল (৪০৮৬ ফুট) ওপরে উঠতে হবে। গোবিন্দঘাট ডাক-বাংলোর নীচেই চেক-পোস্ট। সেখানে আমাদের ইনার লাইন পারমিট

দেখাতে হল। তারপরে শিখ গুরুদ্বার। গুরুদ্বারের সামনে জশবীর সিংয়ের সঙ্গে দেখা। আমাদের জন্য কুলি যোগাড় করতে পারে নি বলে সে খুবই লজ্জিত। তাহলেও আমাদের বিদায় জানাতে হালুয়া প্রসাদ হাতে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। জশবীর সিং এই গুরুদ্বারের সেবক। গুরুদ্বার ছাড়িয়েই অলকানন্দার ঝুলা। ঝুলা ছাড়িয়েই চড়াই শুরু। মরণ-পণ লড়াই করে এই চড়াই পেরোতে হয়। কিন্তু পথটি বেশ সুন্দর। ভুইন্দারগঙ্গা বা লক্ষ্মণগঙ্গার তীর দিয়ে পথ। এ নদী এসেছে নন্দন-কানন থেকে। ঠিক আছে এর উৎসের কাছাকাছি আমরা কোথাও বেস-ক্যাম্প ফেলব।

একি? শের সিং কাদের বাপান্ত করছে? যারা এই শীতে শেষ রাতে উঠে সবার আগে বেরিয়ে গেছে, তাদের কী? কিন্তু কেন? জিজ্ঞেস করতে শের সিং আরও ক্ষেপে যায়। বলে, "ওরা কি সাধে সাত সকালে বেরিয়ে পড়েছে? সব মেহনৎ চুরির ফিকির। অল্প মাল নিয়ে এগিয়ে গেছে। কিন্তু আমিও দেখে নেব। ম্যায় শের সিং সাব্।" মেহনৎ চোরদের দেখে নেবার জন্য শের সিং জোর কদমে এগিয়ে যায়।

দেড় মাইল এসে একটি গ্রাম—নাম পুনগাঁও। মাঝারী আকৃতির পাহাড়ী জনপদ। গোটা পঁচিশেক বাড়ি। লোকসংখ্যাও সামান্য—মাত্র দুশ পঞ্চাশ জন। বাড়িগুলো সহরের মত ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে নেই। বেশ দূরে দূরে একে অন্যের স্পর্শ বাঁচিয়ে যে যার মনে চুপচাপ বসে আছে। টিন, কাঠ ও স্লেট পাথরে তৈরি। প্রায় সব বাড়ির চালেই লাউ-কুমড়োর লতা। গ্রামবাসীরা শীতের ন মাস এখানে বাস করেন। গ্রীষ্মের তিন মাস অনেকেই চলে যান আরও ওপরে—প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে, ভুইন্দার গ্রামে। সেখানেও তাঁদের বাড়ি-ঘর আছে, জমি-জমা আছে। সে সব জমিতে শুধু গ্রীষ্মকালেই চাষ-আবাদ হয়। ওঁরা চাষ করতেই যান। পুনগাঁও-য়ের জমিতে বছরে দু বার ফসল ফলে। তাই সবাই ভুইন্দার যেতে পারেন না। কিছু লোক এখনও এখানে আছেন—এখনই ওঁদের গ্রীষ্মকাল। আর আছে কুকুর—অসংখ্য ভুটিয়া কুকুর এ পথে। আমরা নেহাত সংখ্যায় অনেক বলেই ওরা আমাদের আক্রমণ করছে না। দূরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করেছে। অত্যন্ত হিংস্র, শক্তিশালী ও প্রভুভক্ত এরা। এখন অধিকাংশ বাসিন্দারা ভুইন্দারে। ভালুকের হাত থেকে গ্রামের গরু ভেড়া ও শিশুদের রক্ষা করার ভার এখন ওদের ওপর।

ভালুকের বড় অত্যাচার এ অঞ্চলে। এবারে নাকি অত্যাচারটা আরও বেড়েছে। কয়েকদিন আগেও ভেড়া মেরেছে, পথচারীকে আহত করেছে। তাই গ্রামের মোড়ল শিকারীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। গ্রামের মোড়লকে বলে—মালগুজারদার। সবাই তাঁর কথা শোনে। তিনিও সব সময় সবার মঙ্গল চিন্তা করেন।

সাহসী ও শান্ত এখানকার অধিবাসীরা। খুব অতিথি-বৎসল এঁরা। গ্রামের অতিথিদের জন্য আলাদা একটি বাড়ি আছে। সেই বাড়িটিই সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ভাল। এঁরা বলেন—পঞ্চায়েত ঘর। এখন অনেক বাড়িই বন্ধ। কিন্তু পঞ্চায়েত ঘর খোলা আছে। রক্ষণাবেক্ষণের লোকও আছে। টিনের চাল, কাঠের দেওয়াল ও মেঝে। মেঝেতে শুকনো ঘাস বিছিয়ে রাখা হয়েছে। ঐ ঘাসের ওপরে বিছানা পাতলে বেশ গরম লাগে। এখানে ভুইন্দার থেকে শীত কম হলেও শীত নেই বলা চলে না। উঁচু যে প্রায় ৭০০০ ফুট। শীতকালে এখানেও বরফ পড়ে।

অরূপকৃষ্ণ নামে একজন উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী সন্ন্যাসী প্রায় ন বছর এখানে আছেন। গ্রামে সবাই তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। সারা জীবন হিমালয়ে ঘুরেও গিরিরাজের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কমে নি। বরং হিমালয়কে ভালবেসে তিনি হিমালয়ের ছেলে-মেয়েদেরও ভালবেসে ফেলেছেন। তাঁদের সেবা করাই এই উনসত্তর বছরের সন্ন্যাসীর একমাত্র সাধনা। পুনগাঁও পাণ্ডুকেশ্বর পোস্ট অফিসের অধীনে। স্বামীজী চেষ্টা করছেন এখানে একটি পোস্ট অফিস প্রতিষ্ঠা করতে। অদূর ভবিষ্যতে তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হবে।

এখানকার প্রধান ফসল আলু ও রামদানা বা ফলারী—ডাঁটার বীজের মত এক রকম রঙ্গীন শস্য। ফলারী দিয়ে লাড্ডু তৈরী হয়। খেতে নাকি খুব ভাল। খেলে শরীর বেশ গরম হয়। বলা তো যায় না—হয়তো দিল্লীকা লাড্ডুর মত খেলেও পস্তাতে হবে, না খেলেও পস্তাতে হবে। তার চেয়ে খেয়ে পস্তানোই ভাল।

চঞ্চলকে বললাম—"লাড্ডু খাব।"

ম্যানেজার চঞ্চলেরও লাড্ডু ম্যানেজ করতে কোন আপত্তি নেই। সে এগিয়ে গেল লাড্ডুওয়ালার দিকে। কিন্তু হায় অদৃষ্ট! কোথা থেকে ডাক্তার ছুটে এসে ধমক দিয়ে বলল, "তোমরা দেখছি একটা বিপদ না বাধিয়ে ছাড়বে না।"

চুপ করে থাকি। ডাক্তার আবার বলে, "ও লাড্ডু খেলে আর নীলগিরি

যেতে হবে না, জোশীমঠের মিলিটারী হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে ধুঁকতে হবে।"

অতএব আর বাক্যব্যয় না করে সেখান থেকে চম্পট দিলাম। শুধু আমি ও চঞ্চলই নয়—লাড্ডুর লোভে অমূল্য প্রাণেশ নিতাই নিরাপদ এমন কি ছাপ্পান্ন বছরের শৈলেশদা পর্যন্ত আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ডাক্তার কিন্তু সেখান থেকে নড়ল না। সবাই লাড্ডুওয়ালাকে ছাড়িয়ে আসার পরে সে সব শেষে রওনা হল ভুইন্দারের পথে। খাবার ব্যাপারে ডাক্তার কাউকে বিশ্বাস করে না। কর্তব্যপরায়ণ চিকিৎসক।

অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে পথ। উইলো, ওক ও আখরোট বনের মধ্য দিয়ে আমরা নীরবে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ কানে আসে, "আপলোক আগয়ে। বৈঠিয়ে।"

তাকিয়ে দেখি একটা ঝরনার ধারে ছোট একখানি ঝুপড়ি—চা দুধ ও পকোড়ার দোকান। দোকানদার আমাদের ডাকছে। ডাক্তারের ভয়ে এগোতে সাহস পাই না। কিন্তু একি কাণ্ড! ডাক্তারই যে গিয়ে দোকানের সামনে বসে পড়ল। আমরা পুলকিত হলাম।

দোকানী জানায় সে আমাদেরই জন্যে দোকান খুলে রেখেছে। চৌধুরীদা কাল ঘাংরিয়া যাবার পথে ওকে আমাদের কথা বলে গেছেন। তাই ও সেই বাহাত্তর জন তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে নেমে না গিয়ে আমাদের পথ চেয়ে বসেছিল। আমরাই ওর এ বছরের শেষ খদ্দের।

চৌধুরীদা একা বেরিয়েছেন। একাই পথ চলছেন। কিন্তু আমাদের প্রতি সবসময়েই তাঁর সজাগ দৃষ্টি।

চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আবার শুরু হল পথ চলা। আগের মতই অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে পথ।

বেশ ঘন জঙ্গল। স্থানীয়রা বলেন—ভালুকের জঙ্গল। আসল নাম—বাগডোর। দল বেঁধে ছাড়া কেউ চলে না এ পথে। উপেনবাবু জঙ্গল পেয়ে মহা খুশি। এতক্ষণ তিনি আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে এগোচ্ছিলেন। এবারে সহকারীদের নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন। ভালুকের ভয় ভুলে ওপরে উঠে প্রজাতি সংগ্রহ করছেন উপেনবাবু। চীরগাছের আশে-পাশে পথের দু ধারে বিচুটি আর তামাক পাতার ফাঁকে ফাঁকে, রয়েছে অসংখ্য স্যাণ্টোনাইন, জংলী গোলাপ, আইভী, অর্কিড ও রডোডেনড্রন গুচ্ছ আর

অজস্র ঝর্ণা। একটি শেষ না হতেই আর একটি। শুধু এখানেই নয়। লক্ষ্মণ গঙ্গার ওপারেও পাহাড়ের গা বেয়ে ঝির ঝির ধারায় ঝরছে শাশ্বতকালের সংখ্যাতীত সুন্দরী ঝর্ণা।

'ইয়ে ঘণ্টা বাবু হরিদত্ত ওভারশিয়ার
কুমায়ুনওয়ালানে চড়হায়া—সম্বত ১৯৯৭।'

বাবু হরিদত্ত এখন কোথায় আছেন জানি না। কিন্তু তাঁর ঘণ্টাটি আর অক্ষত নেই। আমরা একটি মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি—লক্ষ্মণের মন্দির। জায়গাটি বেশ মনোরম। পেছনে একটি পাহাড়ী নদী। স্থানীয়রা বলেন—কর্ণগঙ্গা। শের সিং জানাল—একটু বাদেই ভুইন্দার গ্রাম। সেখানে কর্ণগঙ্গা গিয়ে ভুইন্দারগঙ্গায় মিশেছে। কর্ণগঙ্গা এসেছে কাকভূষণ্ডী হ্রদ থেকে। সেখানে পুরাণের সেই অমর কাকটির দেখা মেলে কিনা জানি না, কিন্তু হ্রদটি নাকি অপরূপ। অনেকেই দেখতে যেতে চান। তবে এ পথে নয়। তাঁরা যান বিষ্ণুপ্রয়াগের পরের চটি ঝারকুলা থেকে। খুবই কঠিন পাকদণ্ডী। অধিকাংশ যাত্রীরাই পথকষ্টে কাতর হয়ে ফিরে আসেন। অথচ এই কর্ণগঙ্গার তীর দিয়ে গেলে যাওয়া নাকি অসম্ভব নয়। এ পথেই যাওয়া উচিত। কাকভূষণ্ডী কত সুন্দর জানি না; কিন্তু কর্ণগঙ্গা অনিন্দ্যসুন্দর। বীরেন তো মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে ঐ দিকে। কাছে যেতে বলল, "দেখ একটি চঞ্চলা চপলা কিশোরী উচ্ছল আবেগে নূপুর বাজিয়ে চলেছে কোন্ এক অদৃশ্যলোকে।"

একটু বাদেই ভুইন্দার। কর্ণগঙ্গা ও ভুইন্দারগঙ্গার সঙ্গমে ছোট একটা পাহাড়ী গ্রাম।

ঘোড়া দেখেই খোঁড়া। দোকান পেয়েই সবার গলা শুকিয়ে গেল। ডাক্তার এখনও পেছনে। এই ফাঁকে বসে পড়া যাক। কখন তার কি মতি হবে, কিছুই বলা যায় না।

নাঃ, ডাক্তার আর কোন ঝামেলা করল না। সেও এসে ঠেলেঠুলে আমাদের মধ্যে জায়গা করে নিল। কিন্তু ভগবান তার অদৃষ্টে বিশ্রাম লেখেন নি। ফলাহারীর লাড্ডু না খেতে দেবার ফল তাকে হাতে হাতে পেতে হল। দোকানীর অনুরোধে ডাক্তার তার অন্দরমহলে প্রবেশ করে। দোকানীর স্ত্রী খুব অসুস্থ। তাকে দেখা শেষ করে আসতে না আসতেই দোকানের সামনে ভীড় জমে উঠল। রোগীর ভীড়। ঢেঁকী স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে।

দেবীদাস কিন্তু ইতিমধ্যে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। কয়েকটি ছোট ছোট

পাহাড়ী ছেলে-মেয়ে উৎসুক নয়নে আমাদের চারিদিকে ঘুর ঘুর করছিল। তাদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে দেবীদাস নাচছে আর গাইছে—

'পতি টিপো, পতি টিপো বহিনি,

কি ভয় ?

জর ভয়।

তাওয়া টিল না গর।'

আর সকলে তালে তালে হাত তালি দিয়ে কনসার্টের কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। আমরাও কনসার্ট দলে যোগ দিলাম।

ভুইন্দারের বাড়ি-ঘর পুনগাঁওয়ের মত ছাড়াছাড়ি করে দাঁড়িয়ে নেই। এক জায়গায় জড়াজড়ি করে বসে আছে। বাড়িও কম। জায়গাটিও ছোট। গ্রামের শেষে দোতলা পঞ্চায়েত-ঘর।

ভুইন্দারের পরেই লক্ষ্মণগঙ্গা পেরোতে হল। পেরিয়েই শুরু হল মারাত্মক রকম চড়াই। শাল দেওদার ও চীরগাছের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ।

ভুইন্দারের পর থেকেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। চারিদিকের দৃশ্য আমাদের আলাদা করে দিয়েছে। যে যেখানে ইচ্ছা দাঁড়িয়ে প্রকৃতির অপূর্ব লীলা দেখছে, ছবি নিচ্ছে, গান গাইছে আর আপন মনে পথ চলছে। এক সময় দেখলাম আমি ও অমূল্য শুধু রয়েছি, আর সকলে চলে গেছে দৃষ্টির আড়ালে।

হঠাৎ কোথা থেকে কতকগুলো কালো মেঘ ছুটে এল আমাদের মাথার ওপরে। চারিদিকের সব আলো মিলিয়ে গেল, নেমে এল আঁধার। শুরু হল শিলা বৃষ্টি। দূরের ঝর্ণা অদৃশ্য হল। কাছের ঝর্ণার শব্দ হারিয়ে গেল বৃষ্টির গর্জনে। আমরা একটা গাছের নীচে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু এ তো আর বটগাছ নয় যে বর্ষাতির কাজ করবে। একটু বাদেই গাছের ছোট ছোট পাতার ফাঁক দিয়ে জল পড়তে শুরু করল। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে থাকলাম। বৃষ্টি তো রোজই হচ্ছে। বর্ষাতিগুলো ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হয় নি। সে যাই হোক এখন উপায় কি ? শীতে যে হু হু করে কাঁপছি। অমূল্য বলে, "চলুন দৌড়নো যাক।"

নেতার আদেশে বৃষ্টি মাথায় করে ছুটে চললাম পিচ্ছিল পাহাড়ি পথ দিয়ে। হঠাৎ দেখতে পেলাম একখানি পাথর কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—অনেকটা গুহার মত। ঢুকে পড়লাম সেখানে।

কিছুক্ষণ বাদে দেখি ছাতা মাথায় শের সিং এসে দাঁড়িয়েছে গুহার সামনে। কর্তব্যনিষ্ঠ মেট হেসে বলে, "এইখানে এসে একটু দাঁড়ান, দেখবেন আপনারা ডাকবাংলার সামনে বসেই বৃষ্টিতে ভিজছেন।"

বেরিয়ে এলাম। আরে! সত্যিই তো। ঐ যে ঘন জঙ্গলের মধ্যে একখানি বাড়ি—ঘাংরিয়া ফরেস্ট ডাক-বাংলো।

॥ ১৫ ॥

বরাত জোরে দু জন বেশী কুলি পাওয়া গেল। জোশীমঠে যে পনেরজন যোগাড় করতে পেরেছি, তাদেরই শুধু আমাদের সঙ্গে ওপরে যাবার কথা। পিপলকোঠির কুলি ও খচ্চরওয়ালারা মালপত্র সব নামিয়ে দিয়ে, পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে, পুরনো ধর্মশালায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শেষ। কাল ওরা ঘরে ফিরে যাবে।

দুজন কিন্তু ঘরের ডাকে সাড়া দেয় নি। অমর সিং ও পান সিং। পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেবার পরেও ওরা যে যেখানে ছিল, স্থির হয়ে দাড়িয়ে রইল। অমর বলল, "আমরাও আপনাদের সঙ্গে যাব।"

একি শুধুই ভদ্রতা? আমরা ওর মৃত খচ্চরের দাম দিয়েছি। অমর আবার বলে, "আমরা আপনাদের মাল বইব। শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকব।"

খুশী হয় শের সিং। খুশী হই আমরা। ওরা খুশীমনে গিয়ে কাজে লাগে। ভাবি, মানুষের কৃতজ্ঞতা বোধ তাহলে এখনও একেবারে মুছে যায় নি। শহরে যা আভিধানিক, এখানে তা ব্যবহারিক।

ঘাংরিয়ায় কোন স্থায়ী বাসিন্দা নেই। ডাক বাংলোর চৌকিদারও ভুইন্দারের লোক। আর এই গুরুদ্বারের চৌকিদার তো তার মাল বেঁধে ফেলেছে। আমরা রওনা হলেই সেও গোবিন্দঘাট রওনা হবে। এমন কি এখানকার ভালুকরাও কদিন পরে বাগডোরে নেমে যাবে।

ঘাংরিয়া একটি ছোট সমতল উপত্যকা। উচ্চতা ১০০৮৬ ফুট। এখানে বনবিভাগের ডাক বাংলো ও শিখ গুরুদ্বার আছে। ডাক বাংলোর একখানি ঘরে কাল থেকে চৌধুরীদা ঠাঁই নিয়েছেন। বাকি ঘরখানা তিনি আমাদের জন্যে ঠিক করে রেখেছেন। চৌকিদারের কাছ থেকে খবর পেয়েছি, চৌধুরীদা

আজ সকালে লোকপাল-হেমকুণ্ড দর্শনে গেছেন। গুরুদ্বারেও আমরা একখানি ঘর নিয়েছি। এখানেই আমাদের হেড কোয়ার্টার্স। রান্নার ব্যবস্থা করে পিনাকী মালপত্রের তদারকী করছে।

হন্তদন্ত হয়ে অমূল্য ছুটে এল, "সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"কি হল ?" এই তো ঘণ্টাখানেক আগে ওরা দিল খুলে আড্ডা দেবার লোভে ডাক বাংলোয় সটকে পড়েছিল। এর মধ্যে আবার কি সর্বনাশ হল ? আমরা ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

অমূল্য বলে "চৌধুরীদা এখনও ফিরে আসেন নি।"

"সেকি ? সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখনও ফিরে এলেন না।" চিন্তিত হই।

"একটু এগিয়ে দেখলে কেমন হয় ?"

"দেখতেই হবে।" বীরেন ও অমূল্যের সঙ্গে টর্চ ও আইস এক্স নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। অন্ধকার রাত। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ভুজ আর পাইন বনের মধ্য দিয়ে পিচ্ছিল পথ। অতিকায় পাথরে বোঝাই। টর্চের আলোয় যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। আমরা হোঁচট খেতে খেতে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছি। কোথায় চলেছি জানি না।

আলেয়া নয় তো ? হয় তো তাই ! নইলে আলোটা মিলিয়ে গেল কেন ? নাঃ চোখের ভুল নয়। অমূল্যও দেখেছে। আমরা এগিয়ে চলি। ঐ যে আবার সেই আলো। না, এ তো আলেয়া নয়। মানুষ। টর্চের আলো। আমরা টর্চ নাড়তে থাকি। ছুটে চলি। কাছে আসি। হ্যাঁ, চৌধুরীদা। কিন্তু উনি ওরকম টলছেন কেন ? আমরা তাঁকে একটা পাথরের ওপর বসিয়ে দিই। কুলিটিও বসে পড়ে। ওরা সত্যিই অবসন্ন। কিছুক্ষণ বাদে চৌধুরীদা আবার যে কে সেই, "আমি গিছলাম। দেখে এলাম। অপূর্ব। আমার জীবন সার্থক। কোনদিন ভাবতেও পারি নি, আমি পারব। বুঝলে মহারাজ ? আমি পেরেছি।"

"এবারে আস্তে আস্তে চলুন। ডাক বাংলোয় গিয়ে বিশ্রাম করবেন। শুনেছি এ জায়গাটা নাকি ভাল নয়।" অমূল্য বলে।

"থাক অমূল্য। এখন আমাকে ভালুকে খাক। বাঁচার আর ইচ্ছে নেই।"

আমরা বিস্মিত হই। কি বলছেন চৌধুরীদা ?

"আর আমার বাঁচার ইচ্ছে নেই। সুখের পর দুঃখ। হাসির পর কান্না। আনন্দের পর নিরানন্দ। এই তো জগতের নিয়ম। আজ যে আনন্দ পেয়েছি তার তুলনা নেই। এর পর আর দুঃখ পেতে চাই না।"

নন্দন-কাননের নন্দাবতী

রতবন পর্বত
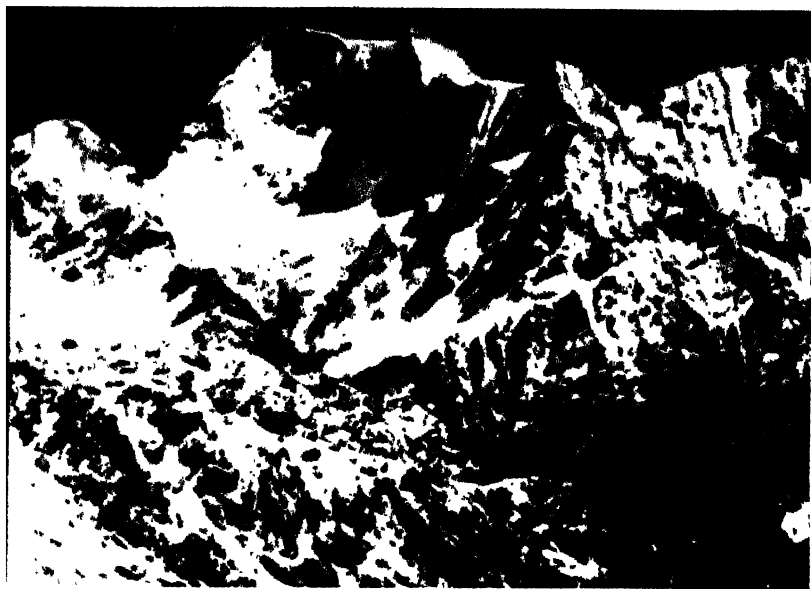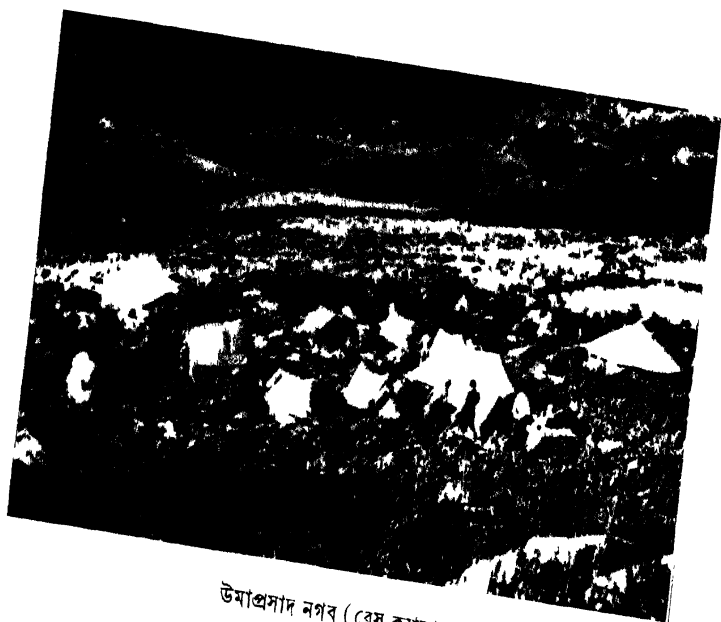
উমাপ্রসাদ নগর (বেস ক্যাম্প)
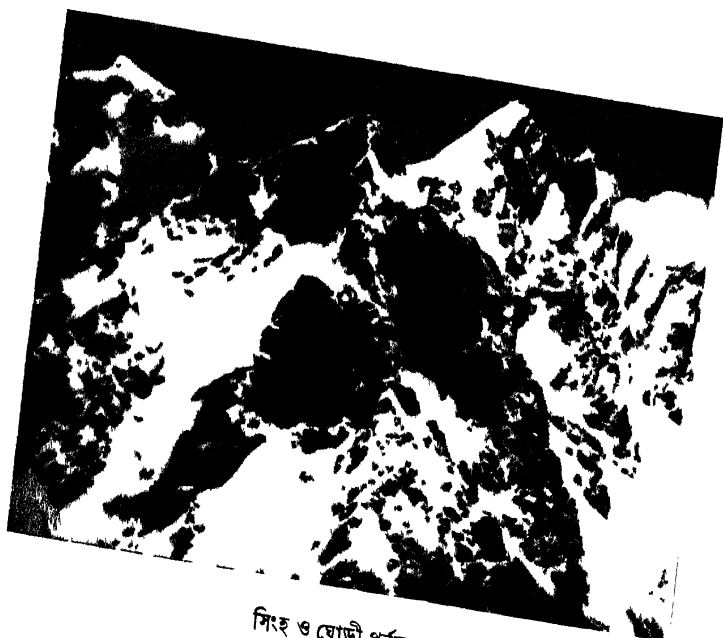
সিংহ ও ঘোড়ী পর্বত

অগ্রবর্তী মূল শিবির (চাকুলঠেলা)

খলিয়াঘাটাব পথে

খুলিয়াঘাটা গিরিবর্ত্ম

খলিয়াগার্ভিয়া হিমবাহ
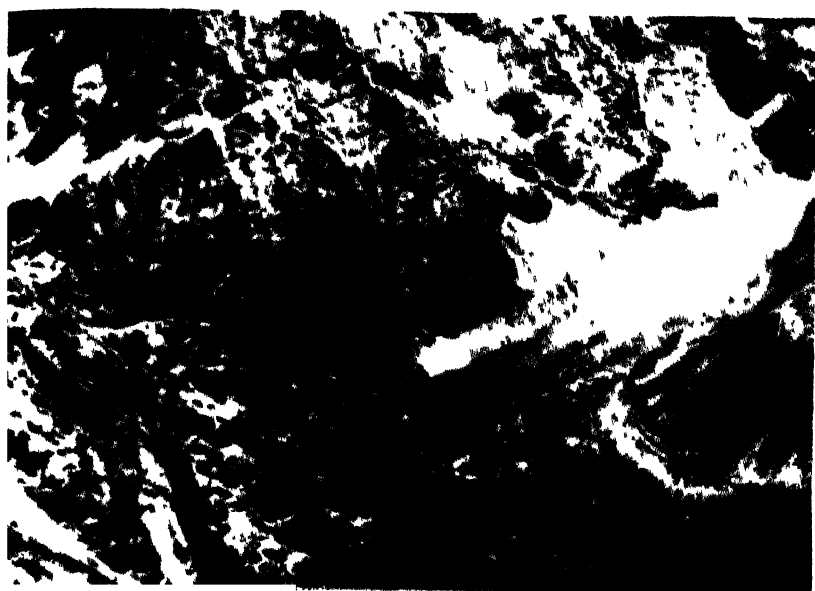
দু নম্বর শিবির

তিন নম্বর শিবির
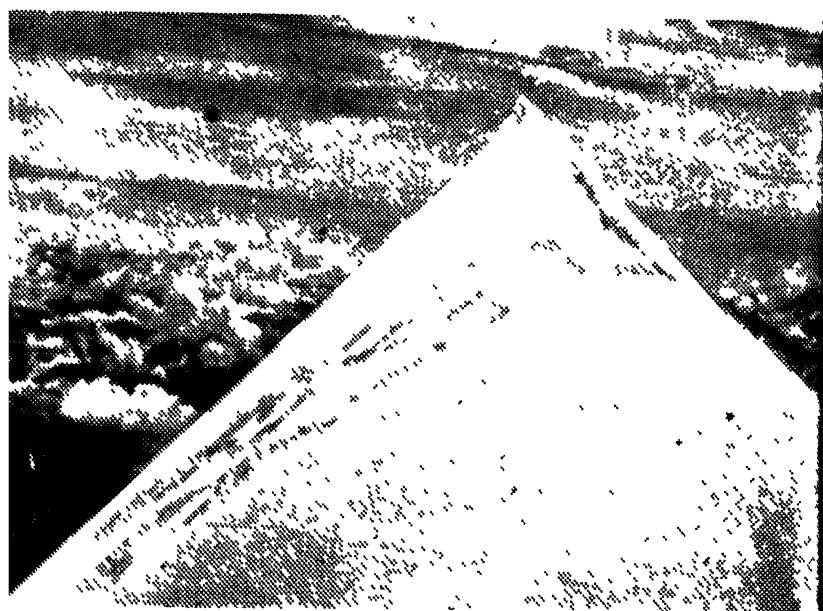
স্বপ্ন-শিখর

নীলমণি নীলগিরির শুভ্র শিখরে নিতাই একটি চুম্বন দিল এঁকে

শিখরে টোপগে — নীচে নিতাই

শিখরে জাতীয় পতাকা ধরে ভানু, পাশে ছান্দু, পেছনে
টোপগে, আজীবা, নিতাই ও আংটেম্বা

"আচ্ছা যে আপনাকে দুঃখ দেয় তাকে দেখে নেব'খন। এখন তো ডাক-বাংলোয় চলুন।" এক রকম জোর করেই অমূল্য তাঁকে টেনে নিয়ে চলে।

আর চৌধুরীদা বার বার বলতে থাকেন, "কী হবে কলকাতায় ফিরে গিয়ে। বাঁচার আর আমার ইচ্ছে নেই।"

চৌধুরীদাকে ডাক-বাংলোয় রেখে আমরা ফিরে এলাম গুরুদ্বারে। এসে দেখি থালা পড়েছে। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকল। বেশ শীত শীত করছে। করবেই তো। অক্টোবর মাস। চারিদিকে পাহাড। তাহলেও আমরা গৃহতলে রাত্রিবাস করছি। এর পরেই তাঁবু-জীবন। চঞ্চল নিরাপদ নিতাই টোপগে ও ছান্দুকে নিয়ে ভানু কাল সকালে মূল-শিবির বা বেস ক্যাম্প প্রতিষ্ঠার জন্য নন্দন-কাননের দিকে রওনা হচ্ছে। ওদের কাল থেকেই তাঁবু-জীবন শুরু। আজীবা, আং দাওয়া ও আং টেম্বা এখানেই থাকবে। ওরা পিনাকীকে রিপ্যাকিংয়ে সাহায্য করবে। আমাদের কুলি কম। চারদিন ধরে সব মাল মূল শিবিরে নিতে হবে।

আমরা কয়েকজন কাল লোকপাল-হেমকুণ্ড দর্শন করে আসব। তীর্থ দর্শনও হবে, আবার নতুন জলবায়ু সহ্য করার অভ্যাসও (Acclimatisation) হবে। জলবায়ু সয়ে নেওয়া প্রতি পর্বতারোহীর অবশ্য কর্তব্য। এই কর্তব্যে অবহেলা করে মেজর জয়াল অকালে মৃত্যুকে বরণ করেছেন। পর্বতারোহীর প্রধান সমস্যা—তার দেহে ও মনে উচ্চতার প্রভাব, অক্সিজেনের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অত্যধিক শীত, জলাভাব ও পুষ্টিশূন্যতা। এ সবই মানুষ সয়ে নিতে পারে। তবে তার জন্যে অভ্যাসের প্রয়োজন। তাই প্রতি অভিযাত্রীকে প্রকৃত অভিযান আরম্ভ করার আগে কিছুদিন সেই অঞ্চলে বাস করতে হয়। বারো তেরো হাজার ফুট হল এই অভ্যাসের আদর্শ স্থান। তবে চুপচাপ তাঁবুতে বসে থাকলেই চলবে না। প্রতিদিন আশ পাশের পাহাড়ে অন্ততঃ দু তিন হাজার ফুট উঠে আবার নেমে আসতে হবে। এতে যেমন পর্বতারোহণের অভ্যাস হয়, তেমনি জলবায়ুও সয়ে যায়।

প্রথম ভারতীয় এভারেস্ট অভিযাত্রীদল বারো হাজার ফুট উঁচুতে তিন সপ্তাহ বাস করেছিলেন। আমরাও ভেবেছিলাম মূল ও অগ্রবর্তী মূল শিবিরে দিন দশেক কাটাব। কিন্তু এদিকে অনেক দেরী হয়ে গেল। হয়তো আর অতদিন অপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। তবে অন্ততঃ পাঁচ সাতদিন থাকতেই হবে।

"আচ্ছা বিমলদা ভালভাবে acclimatised না হলে কি হয় ?" প্রাণেশ জিজ্ঞেস করে।

"Altitude sickness দেখা দেয়।"

"সে আবার কি রকম ?"

"নানা রকমের। যেমন—মাথাধরা, মানসিক অবসাদ, খিটখিটে ভাব, বুক ধড়ফড় করা, নিদ্রাহীনতা, অরুচি, পেশীর দুর্বলতা, বমি করা, দৃষ্টি বিভ্রম, শ্বাসকষ্ট··· ।"

"থাক যথেষ্ট হয়েছে। আর দরকার নেই। আচ্ছা আমরা যে ইণ্ডিয়ান অক্সিজেনের দুটো সিলিণ্ডার বয়ে নিয়ে চলেছি, তার দরকার হবে কী ?"

"নেহাত কারও নিমোনিয়া না হলে ও দুটোর প্রয়োজন হবে না। আমাদের পরীক্ষা করে ডাক্তার হীরালাল সাহা তো তোমার সামনেই বললেন বাইশ হাজার ফুটের নীচে আমাদের কারও অক্সিজেনের দরকার হবে না।"

"কিন্তু শুনেছি একুশ হাজার ফুটে মাত্র আট দিন কাটিয়ে বৃগেডিয়ার জ্ঞান সিং-য়ের পঁচিশ পাউণ্ড ওজন কমে গিয়েছিল ?"

"তা বটে। আবার সার জন হাণ্ট কি বলেছেন জানো ?"

"কী ?"

"Men like Pasang Dawa Lama can reach the top of Everest without oxygen."

"আচ্ছা এত উঁচুতে তো কোন রোগের জীবাণু বাঁচতেই পারে না। তাহলে নিমোনিয়া হয় কেন ?"

"এত উঁচুতে জীবাণু বাঁচে না সত্যি। তবে রোগী নিজেই তা বয়ে নিয়ে আসতে পারে। তাই দেখলে না ডাক্তার সাহা সেদিন আমাদের কত করে পরীক্ষা করলেন ?"

"আর এসব জায়গায় নিমোনিয়া হলে নাকি দিন দুয়েকের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যায় ?"

"তা হয় বৈকি। চিকিৎসার সময়টুকু পর্যন্ত পাওয়া যায় না। গত কয়েক বছরে ভারতের যে কজন পর্বতারোহী মারা গেছেন, তাঁরা সকলেই স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ ও যুবক—বয়স চব্বিশ থেকে ছত্রিশের মধ্যে। একমাত্র জয়াল ছাড়া অন্য সবাই তেরো থেকে পনেরো হাজার ফুটের মধ্যে নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দুদিনের মধ্যে মারা গেছেন। কিন্তু এঁরা সবাই সাবধান হবার সুযোগ

পেয়েছিলেন। যেমন ধরো আগের দুটি অভিযানে জয়ালের রক্তবমি হয়েছিল।”

“মিল গিয়া। তাগড়াওয়ালা মিল গিয়া। ম্যায় শের সিং সাব।” একগাল হাসি নিয়ে ঝড়ের বেগে শের সিং ঘরে প্রবেশ করে। খালি হাতে নয়, দড়ি হাতে। দড়ির অপর প্রান্তে নন্দন-কানন ফেরত ছাগ-নন্দন। জাগ্রতা লাটুদেবীর চলন্ত মানত।

শৈলেশদা হাঁক ছাড়েন, “কত নিল ?”

“আর বলেন কেন। সব বকরীওয়ালারা নীচে নেমে গেছে। বেটা সুযোগ বুঝে দাম চড়িয়ে দিল। অনেক পটিয়ে পাটিয়ে পঞ্চাশ টাকায় রাজী করিয়েছি।”

“পঞ্চাশ!” শৈলেশদা চেঁচিয়ে ওঠেন, “এই আধমরা বকরীর দাম পঞ্চাশ টাকা! দরকার নেই পুজো টুজোর। তোমার লাটুদেবী মাথায় থাকুন। এ বকরী তুমি ফিরিয়ে দাও।”

“এ কি বলছেন শেঠজী!” শের সিং আজ কদিন ধরেই শৈলেশদাকে শেঠজী বলে ডাকছে। বোধহয় ভেবেছে নতুন উপাধিতে বশীভূত হয়ে শৈলেশদা হিসেবের ফাঁস আলগা করবেন। কিন্তু ও তো জানে না যে ভবি ভোলবার নয়।

“ঠিকই বলছি। তিরিশ টাকার মধ্যে হলে পুজো হবে। নইলে হবে না।” শৈলেশদা নির্ভয়ে সাফ জবাব দেন।

“কিন্তু আপনারা মানত করে লাটু দেবীর···!”

“না না এটা ঠিক হচ্ছে না শৈলেশদা।” মাঝখান থেকে ডাক্তার বলে ওঠে।

“কিছু না জেনে কথা বলবে না বিমল।” শৈলেশদার ধমকে ধর্মপ্রাণ ডাক্তার চুপসে যায়। শৈলেশদা গজগজ করতে থাকেন।

অবস্থাটা ক্রমেই ঘোরাল হয়ে উঠছে দেখে শৈলেশদার পাশে গিয়ে আস্তে আস্তে বলি, “পুজো না দিলে কিন্তু অভিযান বন্ধ হয়ে যাবে।”

“কেন ?” শৈলেশদা আঁতকে ওঠেন।

“লাটুদেবীর মানত না মানলে কুলিরা এখান থেকে এক পাও এগোবে না।”

“তাই বলে জেনে শুনে পনেরোটা টাকা বেশী দেব ? আমি খবর নিয়েছি পঁয়ত্রিশ টাকায় দর ঠিক হয়েছে।”

নাঃ শৈলেশদাকে নিয়ে পারা গেল না। শের সিং-য়ের পেছনে টিকটিকি লাগিয়েছেন। বাধ্য হয়ে বলি, “শেঠজী তো রাজী হচ্ছেন না শের সিং। আমি বলি একটা কাজ করো।”

"কী ?"

"গোটা চল্লিশেক টাকার মধ্যে পুজোটা সেরে ফেল।"

"শেঠজী তবে তিরিশ বলছেন কেন ?"

যাক শের সিং তাহলে পাঁচ টাকা প্রণামীতেই রাজী হল। শৈলেশদাকে অনুরোধ করি, "ওকে চল্লিশটা টাকা দিয়ে দিন। আমাদের ভালোর জন্যই যখন করছে।"

হারিয়ে যাওয়া হাসি ফিরে এল শের সিং-য়ের মুখে। টাকা নিয়ে সেলাম ঠুকে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এবারে কম্বল মুড়ি দিয়ে সে লাটুদেবীর আরাধনায় বসবে। অনেক রাত অবধি চলবে সেই পুজোপাঠ। কাল ভোরে ছাগ-নন্দনকে বলি দেওয়া হবে। তার অক্ষয় স্বর্গ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অক্ষয় রৌদ্র লাভ।

॥ ১৬ ॥

ঘুম ভাঙল পাখীর ডাকে। না বৃষ্টির শব্দ পাচ্ছি না তো। তবে কি…। চোখ মেলে দেখি, বাইরের জগৎ সূর্যকিরণে পরিপূর্ণ। প্রভাত-সূর্যের উজ্জ্বল হাসিতে সমস্ত অঞ্চল উদ্ভাসিত। বিশ্বাস করাই কঠিন যে গত ক দিন অবিশ্রান্ত বর্ষণ হয়েছে। একি যাদু না মায়া! যাই হোক, আমরা ভাগ্যবান। ধন্য হলাম জাগ্রতা লাটুদেবীর এই অকৃপণ করুণায়।

অমূল্য সেনের অনেকটা শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা। কাল রাতে ঠিক হয়েছিল অমূল্য আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে আজ সকালে লোকপাল যাবে। চারজন শেরপাসহ আমাদের দু জন এখানে থাকবে। তারা অবশিষ্ট মালপত্রের তদারকী করবে ও সম্ভব হলে আরও কুলি যোগাড় করে বেস ক্যাম্পে মাল পাঠাবার চেষ্টা করবে। সেই দুজনের একজন পিনাকী। আরেকজন কে তা কাল ঠিক হয় নি। আজ দেখা যাচ্ছে পিনাকী ছাড়া আর কেউ এই ঘন জঙ্গলে ঘেরা ঘাংরিয়া গুরুদ্বারে বসে থাকতে তেমন রাজী নয়। পিনাকীর কথা আলাদা, তার মত নীরব কর্মী খুব কম চোখে পড়ে। কিন্তু তার একার পক্ষে তো সব দিক সামলানো সম্ভব নয়। আরও একজনের এখানে থাকা দরকার। কিন্তু সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে ? অমূল্যই জানে। তবে সবাই লোকপাল যেতে চাইছে।

আমরা অমূল্যর দিকে তাকিয়ে আছি। কাকে সে থাকতে বলবে?

"তোমাদের কাউকে থাকতে হবে না। ভানুরা রওনা হয়ে গেলে, তোমরাও বেরিয়ে পড়ো লোকপালের পথে। বীরেনের জানা জায়গা। আজ সে-ই তোমাদের নেতা।"

"তুমি?"

"আমি পিনাকীদার সঙ্গে এখানেই থাকব। নীলগিরি জয় করতে পারলে, ফেরার পথে লোকপালজীকে প্রণাম করতে যাব।"

অমূল্য আমাদের অনেকের চেয়েই বয়সে ছোট, তবু সে আমাদের নেতা। নেতৃত্বের প্রথম প্রয়োজন ত্যাগ। ত্যাগে তাকে সবার বড় হতে হবে।

নিতাই নিরাপদ চঞ্চল টোপগে ও ছান্দুকে নিয়ে ভানু রওনা হয়ে গেল নন্দন-কাননের পথে—বেস ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করতে। শের সিং ওদের পথপ্রদর্শক। কুলিরা যতটা সম্ভব মালপত্র নিয়ে আগেই রওনা হয়ে গেছে।

ওদের রওনা করিয়ে দিয়ে আমরাও তৈরি হয়ে নিলাম। দেরি করা ঠিক হবে না। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসতে হবে। দূরত্ব বেশি নয়—মাত্র সাড়ে তিন মাইল। কিন্তু সাড়ে চার হাজার ফুট চড়াই ভাঙতে হবে।

লোকপালের লোকপালজী বা লক্ষ্মণের ছোট মন্দিরটি বিশ্বের উচ্চতম দেবালয়। এখন অবশ্য লোকপাল শিখতীর্থ হিসেবেই পরিচিত। ওঁরা বলেন—গুরু গোবিন্দ সিং গত জন্মে তপস্যা করেছিলেন ওখানে। তবে লোকপাল বহু প্রাচীন হিন্দুতীর্থ। 'রহস্যময় রূপকুণ্ড'-য়ের লেখক আমাদের বীরেনও তাই বলে।

আজ দিনের আলোয় পথে বেরিয়ে বুঝতে পারছি, ঘাংরিয়া একটি ছোট উপত্যকা। চারিদিকেই পাহাড। ডাক-বাংলো থেকে পথটি ফার্লংখানেক বেশ সমতল। তার পরেই ক্ষীণকায়া খরস্রোতা হেমগঙ্গা বা লক্ষ্মণগঙ্গা। আমরা এরই উৎস দর্শনে চলেছি।

একটি কাঠের সাঁকো পেরিয়ে পথটি দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে—বাঁ দিকে নন্দন-কাননের পথ, ডান দিকে লোকপাল। কিছুটা হেঁটেই দেখি হেমগঙ্গার তরল জলে তুষারের ছোঁয়া লেগেছে। দুদিকে বরফ মাঝে জল—হেমগঙ্গা বয়ে চলেছে। ডান দিকে একটি অনিন্দ্য-সুন্দর ঝর্ণা। পথ ধীরে ধীরে চড়াই হচ্ছে। পাথর ভেঙে পথ তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। পাথরগুলো মোটেই বিশ্বাস-যোগ্য নয়। পা দিতেই সব শুদ্ধ নড়ে উঠছে। আইস্ এক্স দিয়ে কোনরকমে সামলে নিচ্ছি। তবু যা হোক, এখন একটা পথ হয়েছে। বীরেন বলল—দু বছর

আগে নাকি এও ছিল না। তখন আগাগোড়া পাকদণ্ডী ভেঙে লোকপাল পৌঁছতে হত। মামুলী পাকদণ্ডী নয়—হয় গাছের শিকড়, নয় ডাল ধরে সোজাসুজি পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠে যাওয়া। পাকদণ্ডীর প্রতি বাঁকে পাহাড়ের গায়ে কিম্বা গাছের ডালে একটি লাল নিশানা বাঁধা থাকত—পথের নিশানা। কয়েকটি নিশানা আজও অক্ষত রয়েছে। যাত্রীরা যেমন করে হোক এক নিশানা থেকে আরেক নিশানায় লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে যেতেন।

ভূর্জ গাছের এত ঘন জঙ্গল এর আগে আর দেখি নি। গাছগুলো ছবির মত—পরগাছায় বোঝাই। ঠিক সাধারণ পরগাছা নয়। অনেকটা ঝুরির মত—পাতায় ছাওয়া লতা ডালে ডালে দুলছে।

শুধু গাছ নয়, পাতা নয়—লতা নয়, ফুলেরও ছড়াছড়ি এ পথে। উপেনবাবু উল্লসিত। উল্লসিত আমরাও। আমরাও ফুল তুলছি—তুলছি হিমালয়ান ব্লু পপি, হলুদ সূর্যমুখী—আরও অনেক নাম-না-জানা ফুল। ভাবছি—এখানেই যদি এত, তাহলে নন্দন-কাননে না জানি আরও কত? ভাবতেও ভাল লাগছে।

ভূর্জবন শেষ হয়ে গেছে। অনেক ওপরে উঠে এসেছি। ক্রমাগত চড়াই ভাঙছি। ভীষণ চড়াই। দম ফুরিয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই জিরিয়ে নিচ্ছি। বুঝতে পারছি চৌধুরীদা কাল কেন ওরকম করছিলেন এখনও ঘাংরিয়া দেখতে পাচ্ছি। নন্দন-কাননের পথটিও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সঙ্কীর্ণ আঁকা-বাঁকা। যেন সমতল একটি পথ—আমাদের নীলগিরির পথ।

ভূর্জবন শেষ হলেও সবুজ শেষ হয় নি। পথের দুদিকে ছোট ছোট ঝোপ। উপেনবাবু বলেন এ্যালপাইন্ শ্রাব্। গোল ঘাস—অনেকটা পেঁয়াজ কলির মত। প্রায় সারা বছরই বরফ পড়ে এখানে। তাই ওদের এমন মোটা-সোটা চেহারা।

থমকে দাঁড়ালাম। একটা গুহা—একটু দূরে, বেশ উঁচুতে। যখন ঘাংরিয়াতে গুরুদ্বার ছিল না, তখন এই গুহাটিই ধর্মশালা হিসেবে ব্যবহৃত হত। নাম ছিল নারাথোর। কেন জানি না কয়েক বছর আগে টিহরীর এক সন্ন্যাসী ওখানে এসে বহুদিন ছিলেন।

মিশর তো বহুদূর! তবে আমাদের সামনে স্ফিংস এল কেমন করে? অনেকটা স্ফিংসের মত নিকষ কালো পাথরের একটি পাহাড়। কত বিচিত্র গড়নের বিচিত্র ধরণের পাহাড় আছে এ পৃথিবীতে। আমরা কতটুকুই বা জানি এই জগতের।

হেমগঙ্গা বরফে রূপান্তরিত—অনেকটা হিমবাহের মত। বরফের সঙ্গে মিশে আছে অজস্র পাথর। দুটি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে হিমবাহটি নেমে এসেছে। আমাদের ওপারে যেতে হবে। কাজটি খুব সহজ নয়। একটু জিরিয়ে নিলে কেমন হয়? হঠাৎ প্রাণেশ চিৎকার করে উঠল, "মহারাজ ঐ দেখুন।"

"সত্যিই তো। তবে আর দেরী নয়। চলো তাড়াতাড়ি ওপারে চলো। কিন্তু ওগুলো কি ফুল?"

"ব্রহ্মকমল"। উপেনবাবু বলেন। আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন শৈলেশদা। আনন্দিত আমরাও। ক্ষিপ্র পদক্ষেপে মরীয়া হয়ে হিমবাহ পেরিয়ে এলাম। এলাম স্বপ্নে দেখা ব্রহ্মকমল বনে। ব্রহ্মকমল নয় দেবদুর্লভ পারিজাত। যে পারিজাতের জন্যে সত্যভামা কেঁদে কেটে একশেষ, যে পারিজাত নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রের সেই প্রচণ্ড সংগ্রাম, এই সেই পারিজাত।

আহা! কি গন্ধ! কি রং, কি অপূর্ব রূপ! হাল্কা হলুদ রংয়ের বড় বড় ফুল। একটি নয় দুটি নয়—শত শত। হাওয়ায় দুলছে, গন্ধ ছড়াচ্ছে। আমরা আমোদিত হচ্ছি। পথশ্রম ভুলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছি।

আমরা ব্রহ্মকমল তুলছি। উপেনবাবু দরদী কণ্ঠে বললেন, "দেখবেন যেন গাছের গায়ে চোট না লাগে। হিমালয়ের কয়েকটি অঞ্চলে কেবল এই ফুল হয়। এদের বংশবৃদ্ধিও কম। কাজেই গাছ নষ্ট হলে এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

ইচ্ছে ছিল না ওদের ছেড়ে পথ চলি। তবু পথ চলতে হচ্ছে। নইলে সন্ধ্যের আগে ফিরে যেতে পারব না। ঘাংরিয়াতে পাঁচটার আগেই সন্ধ্যে নেমে আসে। পথে মাঝে মাঝে বরফ পড়ে রয়েছে। এ যাত্রায় বরফের ওপর এই আমাদের প্রথম পথ চলা। কিন্তু বরফের কথা এখন থাক।

চড়াই শেষে একটি পতাকা। বাতাসে উড়ছে। লোকপালের নিশানা। আমরা এসে গেছি। ছোট একটি উপত্যকা—লোকপাল। প্রায় সবটা জুড়েই একটি স্বচ্ছ সরোবর—হেমকুণ্ড। সোয়া মাইল পরিধিবিশিষ্ট, ডিম্বাকৃতি একটি হ্রদ। নিথর নিস্পন্দ নিরুদ্বিগ্ন। ঢেউ নেই স্রোত নেই, এমন কি বুদ্বুদ পর্যন্ত নেই। এত স্থির ও এত শান্ত যে এক টুকরো কাপড় জলে ফেলে হেঁটে গেলে সেটা অনুসরণ করে। জল গভীর নয়, তবে ভীষণ ঠাণ্ডা। জল জমে কঠিন হবার সময় সমাগত। কয়েক দিন পরেই হেমকুণ্ড বরফের হ্রদে রূপান্তরিত হবে। তিনদিকেই বরফের পাহাড—সপ্তশৃঙ্গ। পাহাড় থেকে বরফের প্রবাহ নেমে এসেছে হেমকুণ্ডের জলে। প্রবাহের আশে পাশে কোথাও কোথাও এখনও

খয়েরী রংয়ের শ্যাওলা আছে জমে। কদিন পরে ওরাও যাবে বরফে ঢেকে।

কথিত আছে পাণ্ডু রাজা এখানে তপস্যা করে দিব্য-দেহ ধারণ করেছিলেন। লক্ষ্মণও নাকি এখানে তপস্যা করেছিলেন। আগে একে লোকপাল সরোবর বা দণ্ড সরোবর বলত। হেমকুণ্ড নাম হয়েছে ১৯৩৬ সালে, দিয়েছেন সোহন সিং—একজন ওভারসিয়ার। তিনিই প্রমাণ করেছেন এই সরোবরের তীরেই গুরু গোবিন্দ গত জন্মে পঞ্চাশ বছর তপস্যা করেছিলেন। তখন তার নাম ছিল কলগী ঘর।

'সপ্‌ত্‌ শৃঙ্গ শোভত হ্যায় জাঁহা
হেমকুণ্ড নাম হ্যায় তাঁহা।'

সপ্তশৃঙ্গের এপাশে হেমকুণ্ড ওপাশে নন্দন-কানন। রতবন ঘোড়ী প্রভৃতি যে সব পর্বত নন্দন-কাননের উত্তর দিক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারা এই পর্বতশ্রেণীরই অন্য অংশ। এখান থেকে কাকভূষণ্ডীর শিখর দেখা যায়। আকাশ পরিষ্কার বলে নীলকণ্ঠ শিখরও চোখে পড়ছে। সপ্তশৃঙ্গের মত মাথা উঁচু করে সেও আমাদের আশীর্বাদ করছে। এমন শান্ত সুন্দর স্বর্গীয় পরিবেশ বড় একটা চোখে পড়ে না। অথচ এই অপূর্ব পরিবেশের মাঝে ভগ্নদূতের মত এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে কতগুলো আবহাওয়া নিরুপণ যন্ত্র। কোন আব্‌হাওয়া অফিস বা অফিসার নেই। যন্ত্র আছে যন্ত্রী নেই। যন্ত্রীহীন যন্ত্র।

প্রথমেই শিখ ধর্মশালা, বেশ বড় কাঠের বাড়ি। চওড়া বারান্দা। নতুন তৈরী হয়েছে। ধর্মশালার দরজা খোলা। রান্নার বাসনপত্রও রাখা রয়েছে। কিন্তু কোন লোকজন দেখছি না। ধর্মশালার সামনে একখানি সাইনবোর্ড—এইখানে জুতো খুললে তবে এগোনো যাবে। ঘাংরিয়ার পরে চামড়ার জুতো পরে এ পথে আসা নিষেধ। আমরা কাপড়ের হান্টার শু পরে এসেছি। সে জুতোও খুলতে হল এখানে। পায়ে খুবই ঠাণ্ডা লাগছে। তাহলেও উপায় নেই।

ধর্মশালা পেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে শিখ গুরুদ্বার। খুব পুরনো নয়। মাত্র বছর বিশেক আগে তৈরী হয়েছে। ভেতরে কি আছে বুঝতে পারছি না। দরজায় তালা।

একটি ক্ষীণ ধারা বেরিয়ে যাচ্ছে কুণ্ড থেকে। এই ধারাটিই হেমগঙ্গা। এখান থেকে সৃষ্ট হয়ে ঘাংরিয়াতে ভুইন্দার গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে পথে হেমগঙ্গাকে জমে যেতে দেখেছি। অথচ এখানে এত জল। একটি নদীর উৎস হয়েও হেমকুণ্ড শুকিয়ে যাচ্ছে না। তবে কি এই কুণ্ডের নীচে কোথাও প্রস্রবণ আছে?

সেই ক্ষীণ ধারাটিকে ডিঙিয়ে আমরা এপারে এলাম্। কয়েক পা হেঁটেই অতি প্রাচীন একটি ক্ষুদ্র মন্দির। পাথরের দেওয়াল, স্লেটের চাল। কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে একজন লোক ভেতরে ঢুকতে পারে। ভেতরে লক্ষ্মণমূর্তি। শিখরা বলেন লোকপালজী। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে পদ্মাসন বুদ্ধের প্রতিমূর্তি। আরও একটি মূর্তি রয়েছে মন্দিরে—দেবী চণ্ডিকার মূর্তি। মন্দিরের সামনে কালিকমলীর পুরনো ধর্মশালা। শিখ ধর্মশালার চেয়ে ছোট। তাহলেও কোন এক সময়ে এইটিই ছিল যাত্রীদের একমাত্র আশ্রয়।

এখানে জন্মাষ্টমীতে লোকপালজীর মেলা হয়। নীতি, গামশালী, মানা, পুন, ভুইন্দার প্রভৃতি গ্রাম থেকে বহু যাত্রী তখন এখানে আসেন। কিন্তু রাতে কেউ বড় একটা এখানে থাকেন না। বীরেনের কথা আলাদা। গতবার সে গুরুদ্বারের কাছে ঐ তপশিলার ওপরে একা বসে ছিল সারারাত। কি দেখেছে তা সে-ই জানে। তবে পুণ্যার্থীদের বিশ্বাস ধর্মশালার বাইরে এখানে রাত্রিবাস করলে এই পুণ্যভূমি কলুষিত হবে। গভীর রাতে স্বর্গের দেব-দেবীরা অদৃশ্য সিদ্ধ-পুরুষরা হেমকুণ্ডের পবিত্র বারিতে অবগাহন করতে আসেন। তাঁদের জ্যোতিতে লোকপাল জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে।

একটি ঘণ্টা ও একটি পেতলের প্রদীপ মন্দিরে পড়ে আছে। উপকরণ রয়েছে। যাঁর যে ভাবে ইচ্ছা, যতক্ষণ ইচ্ছা, পুজো করতে পারেন। পুরোহিতের প্রয়োজন নেই, আচারের বিচার নেই, ধর্মাধর্মের বিভেদ নেই। প্রসাদের আড়ম্বর নেই, দক্ষিণার দরকার নেই, এমনকি মন্ত্রেরও আবশ্যক নেই। ভক্ত ভক্তিভরে আপন মনে আপন পদ্ধতিতে ভগবানকে ডাকুক। ভগবান সে ডাকে সাড়া দেবেন। ভক্ত ও ভগবানের মিলনতীর্থ এই মন্দির।

॥ ১৭ ॥

'আসমুদ্র হিমাচল যখন মহাত্মাজীর পুণ্য জন্মতিথি উদ্‌যাপনে ব্যস্ত, তোমরা যখন রমণীয় হেমকুণ্ডের রহস্য উন্মোচনে ব্যস্ত, আমরা তখন বেস ক্যাম্পের স্থান নির্বাচনে ব্যস্ত ছিলাম। সকাল নটায় ঘাংরিয়ায় তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, প্রায় মাইল সাতেক হেঁটে, বেলা দুটোর সময় আমরা মনোমত জায়গা খুঁজে পেয়েছি। তিনটি তাঁবুই ফেলেছি। আশে পাশে তাঁবু ফেলার মত

আরও জায়গা আছে। একটু আধটু সমান করে নিতে হবে।

সামনেই রত্তবন তার নীচেই কাটা খাল বা ভুইন্দার গিরিবর্ত্ম—রত্তবন ও নীলগিরির জলবিভাজিকা। কিন্তু এ পথে নীলগিরির চূড়ায় ওঠা সম্ভব নয়। কুলিরা এ জায়গাটাকে বলে মুলা সিউয়াচাঁদ। আমরা কিন্তু নাম দিয়েছি উমাপ্রসাদ নগর। হিমালয়ের পথে পথে যিনি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন, স্যার আশুতোষের সেই সুযোগ্য পুত্র, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সেজকা ছাড়া আর কার নামে এই অভিযান-নগরীর নামকরণ করব বল? প্রাণহীন প্রান্তরে আমরা প্রাণ সঞ্চার করেছি।

পাশেই প্রচণ্ড গর্জনে বয়ে চলেছে ভুইন্দার গঙ্গা। আমরা তার তীর ধরেই এখানে এসেছি। তোমরাও তাই আসবে। প্রান্তর প্রাণহীন, কিন্তু ভুইন্দার গঙ্গা প্রাণচঞ্চল।

প্রচণ্ড হাওয়া বইছে এখানে। ভয় হচ্ছে তাঁবু না উড়িয়ে নিয়ে যায়। শীতও করছে খুব। করবেই তো, জায়গাটা তো উঁচু কম নয়—১৩,৭০০ ফুট। তাছাড়া চারিদিকে তুষারাবৃত চূড়া। তাই বলে নীলগিরি নেই এর মধ্যে। সে লুকিয়ে আছে। তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

বাবুলালকে রেখে দিলাম। তোমাদের আরও একজন কুলী কমে গেল। কাল ওকে এখানে রেখে, নিতাই নিরাপদ ও ভানুর সঙ্গে আমি এ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পের জায়গা খুঁজতে যাব। এখানে চোরের ভয় নেই জানি। তবুও একজনের থাকা উচিত। চোর না থাকলেও ভালুক আছে।

আজ এখানেই থাক। সব ঠিক আছে তো?'

চঞ্চলের চিঠিটা ফিরিয়ে দিলাম অমূল্যকে। চিঠিটা কাল সন্ধ্যে বেলাই এসেছে। কিন্তু কাল আর আমার পড়া হয়ে ওঠে নি। লোকপাল থেকে ফিরে বড়ই পরিশ্রান্ত বোধ করছিলাম। চিঠিটা পকেটে গুঁজে অমূল্য বলল, "আপনাকে ও উপেনদাকে ডাক্তার আজ বিশ্রাম নিতে বলেছে। আপনারা আমার সঙ্গে এখানে থাকুন। ওদের সবাইকে নিয়ে পিনাকীদা বেরিয়ে পড়ুক বেস ক্যাম্পের দিকে।"

শৈলেশদা দেবীদাস বীরেন পিনাকী ও প্রাণেশ তৈরি হয়ে নিল। ওদের রওনা হতে বেলা প্রায় নটা বেজে গেল আমি ও অমূল্য ওদের সঙ্গে সেই পুল পর্যন্ত এলাম। ওরা চলে গেলে। আমরা ফিরে এলাম।

আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। সকাল থেকে একবারও বৃষ্টি নামে নি।

তিন জন শেরপা ও শের সিং পাশের ছোট্ট মাঠে পয়সা দিয়ে তাস খেলছে। ওদের কাছেই একটি ঘোড়া ও তিনটি ভেড়া চরছে। অমূল্য কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে চলে গেল। গিয়ে বসল একটি বিরাট পাথরের ওপর। ওখানে রোদ পড়েছে।

উপেনবাবু আজ আর ঘর থেকে বেরোন নি। কাল নামার সময় তাঁর হাঁটুতে ব্যথা হয়েছে। চারিদিক চুপচাপ। পাখী নেই, হাওয়া নেই। গাছ-গুলোও পাথরের মত স্থির। আমার বড় কথা বলতে ইচ্ছে করছে। একবার চৌধুরীদার কাছে যাওয়া যাক। ওঃ। সেদিন রাতের পরে তো আর চৌধুরীদার কথা বলা হয় নি। কাল তিনি নন্দন-কানন দেখে এসেছেন। দেখেই সোজাসুজি এখানে এলেন। বল্লেন, "কিহে হেমকুণ্ড কেমন দেখলে?"

"অপূর্ব।" আমরা সমস্বরে বলে উঠেছি।

"কি? আমি কি কিছু বাডিয়ে বলেছি?"

"না না। যথার্থ বলেছেন। সেখানে গেলে আর ঘরে ফেরার বাসনা থাকে না।"

ডাক্তার শেষ করার আগেই অমূল্য যোগ করেছে, "বাঁচতেও নাকি আর ইচ্ছে করে না।"

"তাহলে?" চৌধুরীদা আনন্দে প্রায় চিৎকার করে ওঠেছেন, "অথচ দেখো শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে, আমি নাকি সব কথাই বাড়িয়ে বলি।"

"খুব অন্যায়। আচ্ছা আমরা ফিরে গিয়ে বৌদিকে বারণ করে দেব।" অমূল্য একটু থেমে আবার বলেছে, "দাদা। যদি কিছু মনে না করেন..."

"আরে বলেই ফেলো না। মনে করার কি আছে। এখানে আমরা সবাই বন্ধু।"

"আপনি কি বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়েছেন?"

চৌধুরীদা হো হো করে কিছুক্ষণ হেসে নিয়ে তারপর বলেছেন, "তোমরা বোধহয় ভেবেছ, তোমাদের বৌদি খুব ঝগড়াটে?"

"আজ্ঞে না।" অমারা লজ্জা পেয়েছি।

"মোটেই ঝগড়াটে নয় হে। তবে আত্মীয়-স্বজন এই ঘুরে বেড়াবার জন্তে আমাকে পাগল বলে।"

"তাই বুঝি আপনাকে আসতে দিতে চান নি?"

"ঠিক তার উল্টো। বলেছে, পুরুষ মানুষ আবার কবে ঘরে বসে থাকে?"

কিন্তু একি কাণ্ড? আর যে চৌধুরীদার সঙ্গে গল্প করা হল না। তালা ঝুলছে তাঁর ঘরে। চৌকিদার জানাল—তিনি ফিরে গেছেন।

কোন রকমে দিনটা কাটিয়ে দিলাম। বিকেল চারটেয় পিনাকী এল কুলীদের নিয়ে। ঠিক হল কাল আমরা বেস ক্যাম্পে যাব।

আজ ৪ঠা অক্টোবর। সকাল দশটায় আমি উপেনবাবু ও অমূল্য রওনা হলাম। শেরপা আং টেম্বা আং দাওয়া ও ছুতারকে নিয়ে শের শিং একটু আগে রওনা হয়েছে। কুলিরাও মাল নিয়ে গেছে। আজও সব মাল যায় নি। তাই আজীবাকে নিয়ে পিনাকীকে থাকতে হল ঘাংরিয়াতে।

নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অতি সঙ্কীর্ণ পথ। মাঝে মাঝেই নিচু হয়ে চলতে হয়। কোথাও বা গাছের ডাল, কোথাও বা পাথর। আমাদের প্রত্যেকের পিঠেই রুকস্যাক্—প্রায় পনেরো সের। খচ্চরওয়ালারা ঠিকই বলেছে। এ পথে খচ্চর অচল।

একটা পুল পেরিয়ে ভুইন্দার গঙ্গার পরপারে এলাম। জঙ্গল আরও গভীর হল। একটু চড়াই ভেঙেই দেখি, দুটি পথ দুদিকে চলে গেছে। ভানুরা সেদিন এখানে এসেই ভাবনায় পড়েছিল। আজ অবশ্য আর কোন অসুবিধে নেই। গত তিন দিন ধরে আমাদের কুলিরা রোজ দুবার করে এ পথে যাতায়াত করছে। এখন সহজেই পথ চিনে নেওয়া যায়।

বাগডোরের মত এখানেও সেই ওল জাতীয় গাছ দেখতে পাচ্ছি। পাহাড়ীরা এই গাছের মূল শুকিয়ে গুঁড়ো করে আটার অভাব মেটায়। এর রুটি নাকি খুবই পুষ্টিকর। জানা রইল—আটা কম পড়লে আমাদেরও কাজে লাগবে। আরও একরকম ফল দেখতে পাচ্ছি। ওরা বলে শ্বেত ফল। খেতে অনেকটা কুলের মত। হৃদরোগের মহৌষধ। আমাদের হৃদয়ের রোগ নেই। তাহলেও আমরা খাব। সরস্বতী পুজোর আগে কুল, পেলে কে ছাড়ে?

জঙ্গল পাতলা হয়েছে, তবে শেষ হয় নি। অসংখ্য ঝোপ-ঝাড় ও লতাপাতা চারিদিকে। তাতে ফুটে আছে ছোট ছোট নানা রকমের ফুল। অধিকাংশই হলুদ। পাহাড়ের গা থেকে শুরু করে ভুইন্দার গঙ্গায় গিয়ে শেষ হয়েছে। ঝিঁঝি পোকার দল অবিরাম ডেকে চলেছে। দিনের বেলায় এমন ঝিঁঝির ডাক বড় একটা শোনা যায় না। আর ডাকছে একটা নাম না জানা পাখী। ভারী মিষ্টি সুর। কিন্তু কোথায়?

"মহারাজ। সর্বনাশ, ধস নেমেছে। আর পথ নেই।"

উপেনবাবুর ডাকে এগিয়ে যাই। আমরা একটা প্রশস্ত ধসের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। এমনি একটা ধস পেরোতে গিয়েই অমর সিংয়ের খচ্চরটা অলকানন্দায় পড়ে গিয়েছিল। স্বভাবতঃই উপেনবাবু উদ্বিগ্ন। কিন্তু অমূল্য নির্বিকার। চারিদিক দেখে নিয়ে বলে, "একটু ওপরে উঠে গেলেই হবে। আমি আইস এক্স দিয়ে পথ করে দিচ্ছি।"

বড় বড গাছ কমে এসেছে। ঝোপঝাড় রয়েছে দুধারে। কিছু কিছু ফুলও আছে। তবে অধিকাংশই শীতের আক্রমণে মরে গেছে। এখানে সেপ্টেম্বর থেকেই শীত। নন্দন-কাননে আসার প্রকৃষ্ট সময় জুলাই ও আগস্ট—আগেও নয়, পরেও নয়। আমাদের বাঁয়ে বদ্রীনাথের নর পর্বত। কিন্তু ঠিক দেখা যাচ্ছে না—ঢাকা পডেছে কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়ে। পাহাড় থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের প্রবাহ নেমে এসেছে এখানে। একটি নয়—পর পর তিনটি—খোকওয়া-খডক, কাঠেলি খডক ও উজলা খড়ক। খড়ক শব্দের অর্থ হিমবাহ। কিছুদিন পরেই পাহাড থেকে তুষারের প্রবাহ নেমে আসবে ভুইন্দার গঙ্গায়, ঐ পাথরের ওপর দিয়ে। তখন এই পাথরের প্রবাহ রূপান্তরিত হবে বরফের প্রবাহে—হিমবাহে।

উজলা খড়ক ধরে পাহাডের ওপর উঠে গেলে পৌঁছানো যাবে নাগতালে। ছোট একটি হ্রদ—হেমকুণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

পাথর ডিঙিয়ে আমরা পথ চলছি। পাথরের নীচে ফুটে আছে ফুল। তুষারের সঙ্গে লুকোচুরি করে ছোট ছোট দুষ্টু ফুলগুলো লুকিয়ে আছে পাথরের আডালে। ভয়ে ভয়ে ফুটেছে বলে খুব বড নয়। পাতাগুলো আরও ছোট। ফুল ক্ষণিকের। কিন্তু পাতাকে বেঁচে থাকতে হয় অনেক দিন। পাতার রং সবুজ। সবুজ ফুলও আছে, তবে অধিকাংশই হলুদ কিম্বা বেগুনী।

ভুইন্দার গঙ্গা বাঁক নিয়েছে ডান দিকে। বাঁকের আগে একটা বরফের পুল। ওপরে বরফ নীচে জল।

পথটি বেঁকেছে বাঁয়ে। সামনের ধোলা বারনানী পাহাড় থেকে একটি জলধারা এসে মিলেছে ভুইন্দার গঙ্গায়। এই জলধারাই দ্বারী নদী। নন্দন-কাননের দ্বার রক্ষক। সঙ্গমকে ডাইনে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম উত্তর-পশ্চিমে একটু এগিয়েই দ্বারীর ওপরে একটা সাঁকো—ভুজগাছের ডাল ও পাথর দিয়ে তৈরি। খুব পিপাসা পেয়েছে। রুকস্যাকগুলো পিঠ থেকে খুলে

পাথরের আড়ালে রাখলাম। যা হাওয়া চলেছে, নইলে জিনিসপত্র সব উড়ে যাবে। গামছা হাতে নিয়ে নেমে এলাম নদীর তীরে। জল উড়ছে—নদীর জল। প্রবল বেগে নেমে আসছে জল। পাথরে প্রতিহত হয়ে জল উড়ছে। উড়ন্ত জলে লেগেছে রামধনুর পরশ।

হিম-শীতল জলে তৃষ্ণা মিটিয়ে, কাকস্নান সেরে উঠে এলাম ওপরে। রুটি ও আলুসেদ্ধ দিয়ে জঠরাগ্নির জ্বালা নিবারণ করলাম।

সাঁকো পেরিয়ে খানিকটা হেঁটে আমরা চাঁদনী চকের সামনে এসেছি। ভুইন্দার উপত্যকার চাঁদনী চক চকবাজার নয়, চাঁদের আলোতেও চক চক করা একটি চূড়া। খুব উঁচু নয়, তবে সব সময়েই ওর চূড়ায় বরফ থাকে। কোন সময়েই ধস নেমে কালো হয় না। সারাদিন রোদে জ্বলে। রাতে চাঁদ থাকলে তো কথাই নেই, তারার আলোতেও চিক্ চিক্ করে।

পথের পাথর ছোট হয়েছে। কিন্তু এই অতিকায় পাথরটা এখানে এল কেমন করে? কাছে এসে দেখি ঠিক সাধারণ পাথর নয়। নীচের দিকটা ফাঁকা—অবিকল গুহার মত। অথচ পাহাড় বেশ দূরে। গুহার মুখে কিছু পোড়া কাঠ পড়ে রয়েছে। ভেতরে ঘাস বিছানো। ভেড়া ওয়ালারা বোধহয় এখানে রাত্রি বাস করে। সামনে আগুন জ্বালিয়ে রাখে ভালুকের হাত থেকে নিস্তার পেতে।

সামনেই একটা পাথরের প্রাচীর। আমরা নন্দন-কাননে এসেছি। অনেক কষ্ট করে, অনেক ঝুঁকি নিয়ে এসেছি। নীলগিরির সহজ পথ মানা গ্রাম দিয়ে। আমাদের সম্বল সামান্য, তবুও অসামান্য সৌন্দর্যের আকর্ষণে এই কষ্টকর পথ বেছে নিয়েছি। এই সৌন্দর্যের পসরা সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ফ্রাঙ্ক স্মাইথের মত আমরাও বলতে পারব, '…in dark winter days, I wandered in spirit to these flowerful pastures with their clear running streams set against a freeze of silver birches and shining snow peaks Then once again I saw the slow passage of the breeze through the flowers, and heard the eternal note of the glacier torrent coming to the camp fire through the star filled night.'

শুনেছি ভেড়ার মুখ থেকে নন্দন-কাননকে রক্ষা করার জন্যে বন-বিভাগ থেকে এই পাথরের প্রাচীর তৈরী করা হয়েছে। প্রাচীর আছে কিন্তু প্রহরী নেই। প্রাচীর অর্থহীন।

উত্তরে দেওমাংরী ও উইলডুঙ্গা, দক্ষিণে সপ্তশৃঙ্গ, পূবে ধৌলা বাহ্ননালী, চাঁদনীচক, বামনিধর ও রুপিনধর, পশ্চিমে রত্নবন, সিংহ ও টিপরা খড়ক। প্রায় সাত বর্গ মাইল জুড়ে এই ভুইন্দার উপত্যকা। তারই মাঝে মাইল তিনেক দীর্ঘ ও মাইল খানেক প্রস্থ একটি প্রায় সমতল প্রান্তর—এই অংশটিই নন্দন-কানন। নানা রকমের গাছে বোঝাই। সব গাছেই ফুল হয়। তবে বেশীর ভাগ ফুলই এখন শুকিয়ে গেছে। তাহলেও উপেনবাবু আশা করেন শ চারেক প্রজাতি সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। স্মাইথ এডিনবার্গ বটানিক্যাল গার্ডেনের জন্যে ১৯৩৭ সালে আড়াইশ প্রজাতি সংগ্রহ করেছিলেন। স্মাইথের মত আমাদেরও ফুল সরিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। এত ফুল এক সঙ্গে কোনদিন দেখি নি। সাদা এ্যানাফেলিস ও পলিগোনাম, নীল জেরানিয়াম ও জেন্সিয়ান, সবুজ রুমেক্স, বেগুনী পোটেন্টিলা। তাছাড়া রয়েছে রডোডেনড্রন, প্রুনাস্ ও ভূর্জ গাছ। আরও কত গাছ, কত ফুল—উপেনবাবু শুধু নোট নিচ্ছেন।

ফুলের গন্ধ আছে জানি, কিন্তু গন্ধহীন ফুল পেলেও আমরা ফেলে দিই না। গন্ধহীন ফুল তো দূরের কথা, এখানে দেখছি অধিকাংশ পাতারও গন্ধ আছে। ভারী মিষ্টি গন্ধ—কোনটির বা পাকা কলার মত, কোনটির বা পাকা আপেলের মত। সবার সেরা গন্ধ হল জুনিপারের—এক রকমের ফুলহীন লতা।

গাড়োয়ালীরা একে বলে ধূপ গাছ। ওরা এই গাছের পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে ধূপের কাজ চালায়। পুজো-পার্বণে ব্যবহার করে। এর ঘন সবুজ ছোট ছোট পাতাগুলো কাঁচাই জ্বলে। ভূর্জ গাছ ও রডোডেনড্রন গাছও কাঁচা জ্বলে। তাই আমরা নন্দন-কাননের কাছে বেস ক্যাম্প করেছি। কিছু কেরোসিন আমরা বার্মাশেল ও এসোর কাছ থেকে পেয়েছি। কিন্তু সে তেল দিয়ে বেস বা এ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে রান্না করব না—পাঠিয়ে দেব ওপরের শিবিরে।

আমরা খুণ্ড নদীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। নদী না বলে ঝর্ণা বলাই ভাল। বাঁ-দিকের খুণ্ড খড়ক থেকে নেমে এসে ভুইন্দার গঙ্গায় গিয়ে মিলেছে। বাঁ দিকে আমাদের সঙ্গে চলেছে সীমাহীন পর্বতশ্রেণী—তারই মাঝে রুপিনধর ও বামনিধর পর্বত। খুণ্ড খড়ক মনে হচ্ছে রুপিনধর থেকেই নেমে এসেছে। আর বামনিধরের পাশে রয়েছে একটি গিরিবর্ত্ম। এই গিরিবর্ত্মের ওপর দিয়েই তৈরী হবে নতুন পথ। নন্দন-কানন থেকে হনুমান চটি তথা বদ্রীনাথ।

খুণ্ড নদীতে সাঁকো নেই। কয়েকখানি বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে আমরা এপারে এলাম। এলাম নন্দন-কাননের সুন্দরতম অংশে। জুলাই-আগষ্ট মাসে

এই অংশটি ছেয়ে যায় বড় বড় ফুলে। পথিক পাগল হয় এখানে এসে। পাগল হয়েছিলেন কিউয়ের রয়েল বটানিক্যাল গার্ডেনের একজন বট্যানিস্ট—জোয়ান মার্গারেট লেগী।

আর একটি পাহাড়ী ঝরনা পেরিয়ে ঢালু জমির ওপর দিয়ে আমরা চললাম ভুইন্দার গঙ্গার দিকে। দূরে আরও একটি বরফের সাঁকো দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ভুইন্দার গঙ্গা। স্বর্গের সুনীল আকাশ নেমে এসেছে মর্তের মাটিতে। তার আনন্দ ধারায় নন্দন-কাননকে সঞ্জীবিত করে ছুটে চলেছে—কখনও এক ধারায় কখনও বহু ধারায়। জাহ্নবীও এত উচ্ছল নয়, যমুনাও এত নীল নয়। এমন পাগল করা নদী জীবনে দেখি নি। ভাবছি—কোন কবি কি কোনকালে আসে নি এখানে? ভাবে নি—নন্দন-কাননের এই সুহাসিনী স্রোতস্বিনীর নাম 'নন্দাবতী' হল না কেন?

In loving memory

of

Joan Margaret Legge

Feb, 21st. 1885

July 4th 1939

'I will lift up mine eyes unto the hills

From whence cometh my help'

জীবন ও মৃত্যু দুটি সমান্তরাল রেখা। নন্দাবতী জীবনের স্পন্দন, লেগীর সমাধি মৃত্যুর নিশান। নন্দাবতীর তীরে, ফুলের বনে, অন্তিম শয়ানে জোয়ান মার্গারেট লেগী। লণ্ডনের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। ফুলের জন্যই মরণকে বরণ করেছেন তিনি। স্মাইথের Valley of Flowers পড়ে ছুটে এসেছিলেন এখানে। ফুলের গন্ধে আকুল হয়ে পাগলের মত ছুটোছুটি করেছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন, নন্দন-কাননে পাথর আছে। আর সে পাথর ফুলের মত কোমল নয়। ফুল তুলতে গিয়ে পা ফস্কে পড়ে গিয়েছিলেন নীচে, মৃত্যুকে ডেকে এনেছিলেন নিজে। হয়তো অন্তিম মুহূর্তে চারদিকের অগণিত পর্বত-শৃঙ্গের পানে চেয়েছিলেন করুণ নয়নে, কিন্তু তারা এগিয়ে আসে নি। ক্ষতি হয় নি কিছু। এই কাননের ফুলের ডাকে সব ফেলে, সবাইকে ছেড়ে, ছুটে এসেছিলেন তিনি। আর ঘরে ফিরে যান নি। প্রিয়, ফুলবনেই শেষ-শয্যা পেতেছেন।

এ তো ইচ্ছা মৃত্যু। জীবনকে ভালবেসে জীবনদান। এ মৃত্যু তাঁকে শান্তি

দিয়েছে, সুন্দর করেছে। এই তো তাঁর উপযুক্ত সমাধিস্থল—'The Valley of Flowers, a valley of peace and perfect beauty where the human spirit may find its repose.'

॥ ১৮ ॥

'বনে বনে ফুল ফুটেছে দোলে নবীন পাতা—
কার হৃদয়ের মাঝে হল তাদের মালা গাঁথা ?
বহু যুগের উপহারে বরণ করি নিল কারে ?
কার জীবনে প্রভাত আজি ঘোচায় অন্ধকার ?'

ঘুম ভেঙ্গে গেল। কেউ গান গাইছে। বোধ হয় বিমল। এখন তো তার পাঠের সময়। হয়তো মূল শিবিরের স্বর্গীয় নীরবতায়, আকাশ-মাটির মিলনের আকুলতায়—গীতা ছেড়ে গীতালির গীত গাইছে।

গতকালের পদযাত্রার কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে নন্দন-কাননের স্বর্গীয় সৌন্দর্যের কথা, সৌন্দর্যের পূজারী স্বর্গগতা মার্গারেট লেগীর কথা।

মার্গারেটের মৃত্যুর পরে কত কাল কেটে গেছে। এই সুদীর্ঘ কালে যাঁরাই নন্দন-কাননে এসেছেন, তাঁরা সবাই আমাদের মত শ্রদ্ধাবনতশিরে একবার ওখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের মত তাঁদেরও কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছে, চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছে, বার বার মনে হয়েছে—আমরা ধন্য, ধন্য আমাদের জীবন, ধন্য এই নন্দন-কানন।

কিন্তু আমরা অভিযাত্রী। যাত্রাপথে হৃদয়াবেগকে প্রাধান্য দেবার অধিকার নেই আমাদের। তাই আমরা মার্গারেটের সমাধিকে প্রণাম করে এগিয়ে এসেছি। পর পর পাঁচটি ঝর্ণা পেরিয়েছি। ঝর্ণাগুলো বাঁদিকের দেওমাংরী বাঁক থেকে নেমে এসে নন্দন-কাননকে সিক্ত করে নন্দাবতীতে মিশেছে। বাঁদিকে আমরা প্রথম যে গিরিশ্রেণীটি পেয়েছিলাম, দেওমাংরী বাঁক কিন্তু ঠিক সে গিরিশ্রেণীতে নয়। সে গিরিশ্রেণীটি বেঁকে সোজা উত্তরে চলে গেছে। ঐ বাঁককে বলে উইলডুঙ্গা বাঁক। ঠিক ঐখানেই আরেকটি গিরিশ্রেণী উত্তর থেকে এসে একটু বেঁকে পূবে প্রসারিত হয়েছে। এই বাঁককেই দেওমাংরী বাঁক বলে। নীলগিরি এই গিরিশ্রেণীরই ওপারে। আমরা এপারে বেস ক্যাম্প করেছি।

প্রথম নজরে মনে হয় নন্দন-কানন সমতল। কিন্তু সত্যিই তা নয়। বেশ উঁচু-নীচু। আমাদের ক্রমাগত ওঠা-নামা করতে হয়েছে। নন্দন-কানন শেষ হলেও এই ওঠা-নামা শেষ হয় নি, বরং বেড়েছে। নন্দন-কাননের পরে একটা বিরাট প্রান্তর—প্রায় মাইল দেড়েক দীর্ঘ। বড় বড় পাথরে বোঝাই। পাথর পেরোতে দম ফুরিয়ে আসে। ওখানে ফুল নেই কিন্তু আছে ভূজ ও রডোডেনড্রন। ওদের মাঝে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। একজন থাকলে আরেকজন থাকবেই। অনেকটা আমাদের শৈলেশদা ও প্রাণেশের মত। হোক না একজনের ছাপ্পান্ন ও আরেকজনের বাইশ। বছর দিয়ে কি মনের ওজন মাপা যায়!

স্লিপিং ব্যাগের জীপ খুলে বেরিয়ে আসি। অমূল্য অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক। এর পরে রাতের পর রাত হয়তো তাকে বসে কাটাতে হবে। এ তাঁবুটিতে আমরা দুজনেই থাকি। এই রকম পাঁচটি, চারজনের বাসোপযোগী একটি ও একটি মেসটেন্ট অর্থাৎ বড় তাঁবু আমরা নিয়ে এসেছি। একটি ভাস্বর ও একটি পিনাকীর, বাকি পাঁচটি আমরা এনেছি দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের জয়াল মেমোরিয়াল ফাণ্ড থেকে। পর্বতারোহণের অন্যান্য সরঞ্জামও নামমাত্র ভাড়ায় তাঁরাই আমাদের দিয়েছেন। অবশ্য এজন্যে আমাদের অনেক ঝামেলা সইতে হয়েছে। কোন এক অভিযাত্রী দল নাকি সাজ সরঞ্জামের পুরো ভাড়া মিটিয়ে দেন নি। ফলে কর্তৃপক্ষ আমাদের সাজ-সরঞ্জাম দিতে ইতস্ততঃ করেছিলেন। কিন্তু ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কর্ণেল জসওয়ালের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ত্বরিৎ হস্তক্ষেপে আমরা শেষ পর্যন্ত সব কিছুই পেয়েছি।

তাঁবু ছাড়াও তৈরী করা হয়েছে গুদাম, রান্নাঘর ও কুলিদের কোয়ার্টার। ভেড়াওয়ালাদের পরিত্যক্ত পাথরের চারটি দেওয়াল—দরজার জন্য একটু ফাঁকা। তারই ওপর আই সি আই-য়ের দেওয়া এ্যালকাথিন শীট বিছিয়ে গুদাম ও তেরপল দিয়ে রান্নাঘর বানানো হয়েছে। কুলিদের নিয়ে শের সিং চলে গেছে একটু দূরে। বিরাট একখানা পাথরের আড়ালে ভূজগাছের ডাল ও এ্যালকাথিন শীট দিয়ে তাদের কোয়ার্টার তৈরী করেছে।

নাঃ। বিমলের গান আর শোনা যাচ্ছে না। সাতটা বেজে গেছে। একটু বাদেই বেড-টি আসবে। এবার বাইরে বেরুনো যাক।

আঁধার কেটে গেছে। আকাশ ও মাটির মিলন শেষ হয়েছে। বিচ্ছেদের ব্যবধান বাড়ছে। সন্ধ্যায় শুরু হয় ওদের অভিসার। তারারা মুচকি হাসে।

সে হাসি ওদের গা-সহা হয়ে গেছে। ওরা লজ্জা পায় চাঁদের হাসিকে। ভয় পায় দিনের আলোকে।

আঁধার কেটে গেলেও রোদ আসতে অনেক দেরী। অথচ চারিদিকে সোনালী রোদের ছড়াছড়ি। রোদ পড়েছে সপ্তশৃঙ্গের শিরে শিরে, বামনী ধরের চূড়ায় চূড়ায়, রতবনের শিরায় শিরায়। খুশীতে ওরা ঝলমল করছে। কিন্তু রোদ আসছে না এখানে। দিবাকরকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে টিপ্‌রা খড়ক। শুধু তার মাথার ওপর আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। আমাদের আশ্বাস দিচ্ছে, সে আসছে।

দূর থেকে কাছে চোখ ফেরাই। এ যে সাদায়-সাদায় সাদা হয়ে গেছে সব। সাদা আমাদের হাল্‌কা হলুদ রংয়ের তাঁবুগুলো, সাদা উপেনবাবুর ঘন সবুজ রংয়ের তাঁবুটি। কালোও সাদা হয়েছে। সাদা এ্যালকাথিন শীটের চাল। সাদা রুমেক্সের ডাল। কোথাও কোন প্রাণের স্পন্দন নেই। মনে হচ্ছে সারা অঞ্চলটাই একটা বিরাট শবদেহ। যেন কেউ তার ওপর একখানি সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে।

নিতাই ও নিরাপদর তাঁবুর কাছে এগিয়ে আসি। ওদের তাঁবুর গায়ে থার্মোমীটারটি ঝোলানো রয়েছে। সেকি! এ যে দেখছি মাইনাস ২'২ সেন্টিগ্রেড। এখন এখানেই এই। পরে ওপরে কি হবে?

কিন্তু ভয় কিসের? মৃত্যুর মাঝেও যে শোনা যাচ্ছে জীবনের জয়গান—নন্দাবতীর উচ্ছল নূপুরধ্বনি। পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করে সে বেঁচে আছে। বাঁচিয়ে রেখেছে নন্দন-কাননকে।

আরও একটি প্রাণের প্রতীক রয়েছে এখানে জাতীয় পতাকাটি। সে-ও সাদা হয় নি, সদাই সগর্বে উড়ছে। ঐ পতাকার সম্মান আমাদের রক্ষা করতেই হবে। সব বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে ওকে নিয়ে যেতে হবে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে নীলগিরির রজতশুভ্র শিখরে।

"সাব্‌ চায়।"

পেছন ফিরে দেখি মগ হাতে ছুতার দাঁড়িয়ে। মগটা হাতে নিলাম। ছুতার চলে গেল রান্নাঘরে। এবার সে কেটলী হাতে এক তাঁবু থেকে আরেক তাঁবুতে গিয়ে সবার ঘুম ভাঙাবে। তারা কোনমতে একখানি হাত স্লিপিং ব্যাগ থেকে বের করে মাথার কাছে রাখা মগটি তুলে ধরবে ছুতারের সামনে। ছুতার মগ ভরে দেবে গরম তরল সোনালী পানীয়। শুয়ে শুয়েই তারা চুমুক দেবে—

স্বর্গসুখ উপভোগ করবে। না, মুখ ধোবে না কেউ। উত্তাপ যে হিমাঙ্কেরও নীচে।

পকেটে হাত দিয়েই চমকে উঠি। তাই তো ডায়রীটা যে পড়াই হয় নি। পরশুদিন নিতাই নিরাপদ চঞ্চল টোপগে ও ছান্দুকে নিয়ে ভানু অগ্রবর্তী মূল শিবির বা এ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পের জায়গা খুঁজতে বেরিয়েছিল, কিন্তু খুঁজে পায় নি। গতকাল সকালে তাই চঞ্চল বীরেন প্রাণেশ ও টোপগেকে নিয়ে নিরাপদ আবার বেরিয়েছিল। এবারে আর বিফল হয় নি। জায়গা খুঁজে বার করে সেখানে মালপত্র রেখে এসেছে। এই আবিষ্কারের কাহিনী প্রাণেশ ডায়রী বন্ধ করে আমাকে পড়তে দিয়েছে।

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে মগটা রান্নাঘরে রেখে, নেমে আসি নন্দাবতীর তীরে। একখানা পাথরের ওপর বসি। চারিদিক আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে। ওপারে ভূর্জ ও রডোডেনড্রনের পাতায় পাতায় কাঁপন জেগেছে। ডায়রীটা বার করি। প্রাণেশ লিখেছে—

'৪ঠা অক্টোবর, ১৯৬২। বীরেনদা ও আমি চা হাতে নিয়ে তাঁবুর বাইরে তাকালাম। তুষারে ঢেকে গেছে সব, এমন কি আমাদের জুতো জুজোড়া পর্যন্ত। কাল রাতে ভুলে আমরা জুতো বাইরে রেখেছিলাম। এখন উপায়? একটু বাদেই এ্যাডভান্স বেসের জায়গা খুঁজতে বের হব। ঝেড়ে-ঝুড়ে জুতো ঠিক করে নিতে হবে। জুতোয় হাত লাগালাম। এমন সময় নিরাপদ এল। আমাদের অবস্থা দেখে সে হেসেই খুন। কাল তারাও এই অবস্থা হয়েছিল।

চোখে আইস গগ্‌লস্‌, হাতে আইস এক্স, পরণে পর্বতারোহণের পোশাক পিঠে সামন্ত অয়েল স্টোর্সের সরষের তেলের টিন নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। পথে বলা ভুল—পথ নেই এখানে। পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে, ঝর্ণার পর ঝর্ণা পেরিয়ে, কখনও লাফিয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, খুলিয়াঘাটা গিরিবর্ত্মের দিকে চলেছি। খুলিয়াঘাটার কাছাকাছি কোথাও ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড খুঁজে বের করতে হবে। আশে পাশে জল ও জ্বালানী কাঠ থাকা চাই। হিমানী সম্প্রপাত স্থান (Avalanche point) হলে চলবে না।

টোপগে এগিয়ে গেছে। তাকে দেখাচ্ছে একটি বিন্দুর মত। বীরেনদা, মাঝে মাঝে ম্যাপ দেখছেন। চড়াই—শুধু চড়াই। একটির পর একটি গিরিশিরা (ridge) উঠে গেছে। এখন যেটায় দাঁড়িয়ে আছি, নীচ থেকে মনে হয়েছিল এটাই শেষ। এখন দেখছি এর ওপরেও একটি আছে। ওখানে উঠলে হয়ত

আরেকটি দেখব। এ যেন মরীচিকা।

একটা ঝর্ণার সামনে এসে টোপগের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। সে একখানি বড় পাথর ধরে ঠেলাঠেলি করছে। আমরাও হাত লাগালাম। পাথরখানা গড়িয়ে ঝর্ণার মাঝে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। ব্যাস্ পুল তৈরি হয়ে গেল। সেই পাথরে পা দিয়ে আমরা এপারে এলাম।

মাঝে মাঝে আইস-এক্স দিয়ে ধাপ কেটে, মাঝে মাঝে হামাগুড়ি দিয়ে, একটা ছোট জঙ্গলে হাজির হলাম। জঙ্গলে গাছ নেই, আছে গাছের কঙ্কাল। প্রাণহীন পত্রহীন জুনিপারের বন। মরে যায় নি, মেরে ফেলা হয়েছে। ভেড়াওয়ালারা আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে। আগামী বছর কেটে নিয়ে যাবে। কার অন্ন কার ভোগে লাগে। এগুলো এখন আমাদের কাজে লাগবে।

ছল্ ছল্ শব্দে চমকে উঠি। জল কোথায়? পাথর! তবে কি পাথরের নদী? বিরাট বিরাট পাথরের একটি প্রবাহ। পাথরের নীচ দিয়ে জল বইছে কিন্তু সে-জল দেখা যাচ্ছে না। বেশ খানিকটা। এগিয়ে সুবিধামত জায়গা দেখে আমরা পাথরের প্রবাহ পেরিয়ে এলাম।

বেলা দুটো নাগাদ অপেক্ষাকৃত একটু সমতল জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম। জায়গাটা খুবই ছোট। ভেড়াওয়ালারা নাম দিয়েছে চাকুলঠেলা। এক পাশে একখানা প্রকাণ্ড পাথর। তারই মধ্যে ছোট একটি গুহা। পাথরটির তলা থেকে একটি ঝর্ণা, বেরিয়ে এসেছে। উল্টোদিকে গভীর খাদ। চঞ্চলদা বললেন, "কাল তো এরকম জায়গা দেখি নি। আমরা বোধ হয় অন্য পথে চলে গিয়েছিলাম।"

"ওখানে কি লেখা?" নিরাপদ চিৎকার করে উঠল। তাকিয়ে দেখি বড় পাথরখানার গায়ে খোদাইকরা রয়েছে—'GOMBU'.

"এখানেই বম্বে মাউন্টেনিয়ারিং কমিটি গতবছর তাঁদের অন্তর্বর্তী শিবির স্থাপন করেছিলেন। আমার ভাই গোম্বু তাঁদের দলে ছিল।" বলে টোপগে সেই গুহার মধ্যে চলে গেল।

নওয়াং গোম্বু বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী। দুটি ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানেই সে শিখর অভিযাত্রীদলে ছিল। আগামী বছরের আমেরিকান এভারেস্ট অভিযানেও সে দলভুক্ত হয়েছে।

একটু বাদে টোপগে একখানি বিবর্ণ কাগজ হাতে বেরিয়ে এল। জুন মাসের ইংরেজী খবরের কাগজ। জুন মাসেই ক্যাপ্টেন জগজিৎ সিং-য়ের

নেতৃত্বে অল আর্মি টিম এসেছিলেন নীলগিরি বিজয় করতে। টোপগে তাদের সঙ্গে ছিল। মাত্র পাঁচশ ফুটের জন্য ওদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। আমাদের অদৃষ্টে কি আছে কে জানে। ওরা যা পারে নি, গোম্বু যা পারে নি, আমরা তা পারব কি!

জায়গাটা আমাদের সকলেরই পছন্দ হল। শুধু শিবির স্থাপনের আদর্শ স্থান নয়। এখান থেকে চারিদিকের দৃশ্যও বড় মনোরম। পুবে রতবন, দক্ষিণ-পুবে ঘোড়ী, দক্ষিণে সপ্তশৃঙ্গের দুটি শৃঙ্গ, আর নীচে ছবির মত ভুইন্দার উপত্যকা।

পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে সবাই ঝর্ণার ধারে বসে পড়লাম। সঙ্গের খাবার বের করা হল।

বীরেনদা আবার-ম্যাপ নিয়ে বসলেন। চঞ্চলদা ও নিরাপদ গিয়ে তাঁর পাশে বসল। তিন জনে পরামর্শ চলল কিছুক্ষণ ধরে। তারপর তাঁরা পাথরটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমরাও ওদের পেছনে এলাম। বায়নোকুলার চোখে লাগিয়ে নিরাপদ চারিদিক দেখল।

"নীলগিরি কোথায়?" চঞ্চলদা বললেন।

নিরাপদ বায়নোকুলার হাতে পেছিয়ে এল। খাদের কাছে একখানি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, "ঐ যে। শুধু একপাশের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে শিখর দেখা যায় না।"

না যাক। যা দেখেছি, তাই বা কম কি? চারিদিকের অগণিত পর্বত-শৃঙ্গের মাঝে লুকিয়ে থেকে সে মুচকি হাসছে—হাসছে গত পঁচিশ বছর ধরে। তাহলেও আমরা এসেছি। এসেছি শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে। জানি না তুমি আমাদের ফিরিয়ে দেবে কিনা। জানি না আমরা ঘরে ফিরব কিনা। তবু আমরা এসেছি। আজ দূর থেকে তাই তোমাকে জানাই আমাদের প্রথম প্রণতি।'

॥ ১৯ ॥

দিন কাটে কিন্তু রাত কাটে না। যত ভোরেই ঘুম ভাঙুক না কেন, এখানে সরকারীভাবে দিন শুরু হয় সকাল নটায়। আমরা দু তিনজন ছাড়া নটার আগে কেউ স্লিপিং ব্যাগ ছাড়ে না। আবার বিকেল পাঁচটা না বাজতেই

সবাই তাঁবুতে ঢুকে পড়ে। প্রায় রোজই বিকেলে তুষারপাত লেগে আছে। সাতটা নাগাদ কাঁপতে কাঁপতে কিচেনে এসে রুটি আর আলুর ঝোল দিয়ে ডিনার সেরে, তাঁবুতে ফিরে ব্যাগস্থ হই। তারপরে রেডিও শুনে, গল্প করে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চোখ বুজি। কিন্তু ঘুম কি আসে? জেগে থাকি একা। না, সঙ্গে জেগে থাকে নন্দাবতী। নন্দাবতীর স্রোতের মতই জীবনের কত বিস্মৃত কথা ও কাহিনী কোথা হতে ভেসে আসে মনে—আবার কোথায় হারিয়ে যায়। কিন্তু রাত ফুরোয় না। ভাবি ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিই। কিন্তু রাতকে ফাঁকি দিয়ে কি হবে? রাত রাতই থাক। প্রতীক্ষারও একটা মাধুর্য আছে।

দিন কিভাবে কেটে যায় টেরই পাই না। শুধু কাজ আর কাজ। দিনের প্রথম কাজ ডাক্তারের সামনে হাজিরা দেওয়া। রোজই সে আমাদের পরীক্ষা করে বিধান দেয়—কি খাব, স্নান করব কিনা, ওপরে যাব কিনা? ডাক্তারের ছাড়পত্র পেলে শুরু হয় কাজ। হিসেব করে বেঁধেছেঁদে এ্যাডভান্স বেসে মাল পাঠানো, টেম্পারেচার ও ব্যারোমেট্রিক প্রেসার নোট করা, রিপোর্ট ও চিঠি-পত্র লেখা, ম্যাপ দেখা ও পথ ঠিক করা, উপেনবাবুর প্রজাতি সংগ্রহে সাহায্য করা—আরও কত কাজ।

এ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে এখনও তাঁবু খাটানো হয় নি। কুলিরা সেই গুহাটার মধ্যে মাল রেখে আসছে। ঘাংরিয়ার পাট চুকিয়ে পিনাকী কাল চলে এসেছে। আজ তাই সতেরোজন কুলিই আমরা এখানে পেয়েছি। কিন্তু আজও সব মাল যায় নি। কুলির অভাবে আমাদের বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে। দু তিনজন কুলিকে সব সময়েই বেস ক্যাম্পে রাখতে হয়। ছুতার একা রান্নার কাজ সামলাতে পারে না। কাঠ আনতেই একজন লোকের দরকার। আজ আবার একজনকে ডাকহরকরা করে জোশীমঠ পাঠানো হয়েছে।

বেস ক্যাম্প থেকে এই আমরা প্রথম ডাক পাঠালাম। প্রিয়জনদের চিঠি দিয়েছি। সবচেয়ে বেশী চিঠি লিখেছে অমূল্য ও ভানু—নেতা ও সহনেতা। প্রিয়জনের সংখ্যার দিক থেকেও দেখছি ওদের নেতৃত্ব ক'রার যোগ্যতা আছে।

জোশীমঠের পোস্টমাস্টারের সঙ্গে আমরা বন্দোবস্ত করে এসেছি। ডাকের থলিটি পেলেই তিনি প্রয়োজন হলে টিকিট লাগিয়ে, ফর্ম পূরণ করে, চিঠি তার ও পার্শেল পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। আমাদের চিঠি-পত্র তিনি সেই ডাকহরকরার হাতেই দিয়ে দেবেন। কুলিরা কিন্তু সকলেই ডাকহরকরা হতে চায়। ওদের সবারই বাড়ি জোশীমঠের কাছাকাছি। এ রকম আর্নড্ লিভ পেলে কে ছাড়ে?

জোশীমঠ যেতে চায় না শুধু একজন—অমর সিং। ওর খচ্চর মারা গেছে। ও মাকে কেমন করে মুখ দেখাবে ?

এখান থেকে কোলকাতায় চিঠি যেতে আট দশদিন লাগবে। এর পরে আরও বেশী। যতই ওপরে উঠব ততই দেরী হবে। ওপর থেকেও কুলিরা খবর বয়ে আনবে। অর্থাভাবে আমরা ওয়াকি টকি সেট আনতে পারি নি।

দেহ ও মনে কোন প্রকার জড়তা এলে তাকে পাহাড়ের কাছে হার মানতেই হবে। পাহাড়কে হার মানাতে পারে তারা, যারা সহ্যশক্তির সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অনাহার-অনিদ্রা, শীত-গ্রীষ্ম, তুষার ঝড় ও বরফের ধস, আরও কত। পর্বতারোহীকে হতে হবে নির্ভীক, কর্তব্যে কঠোর, সঙ্কল্পে অটল। প্রস্তুত থাকতে হবে সকল প্রকার দুর্ঘটনার জন্যে।

চারিদিকের বরফাবৃত চূড়া থেকে প্রতিফলিত সূর্যালোকে দিনের বেলায় এখানে বেশ গরম, আর রাতে প্রচণ্ড শীত। তাছাড়া অক্সিজেনের অভাব তো রয়েছেই। এই আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য আমরা আশে পাশের ছোট-খাটো পাহাডে উঠে শরীরটাকে ঝর-ঝরে করে নিচ্ছি। আজই আমরা প্রথম পর্বতারোহণের পোশাক পরেছি—পায়ে দিয়েছি ক্লাইম্বিং বুট, গায়ে ফেদার জ্যাকেট, পরনে ফেদার ট্রাউজার, হাতে গ্লাভ্‌স, মাথায় বালাক্লাভা টুপি, চোখে স্নো গগ্‌ল্‌স, কোমরে বেঁধেছি দড়ি। আমরা সারি বেঁধে পাহাড়ে ওঠা শিখছি।

শৈলেশদা অনেক উঁচুতে একখানা পাথরে বসে আমাদের দেখে নিচ্ছেন। আমরা তাঁর কোমরে দড়ি বাঁধি নি। বয়স হয়েছে, পড়ে টড়ে গেলে বিপদ হবে। সেজন্য শৈলেশদা আমাদের ওপর বেশ চটে গেছেন। দড়িকেও লোকে কত ভালবাসে !

হঠাৎ দেখি শৈলেশদা সেখানে নেই। কোথায় গেলেন ? নীচে তাকাই। নাঃ পড়ে যান নি তো। ঐ যে তিনি নেমে আসছেন। একেবারে আমাদের কাছে নেমে এলেন। ইশারায় দেখালেন তিনজন লোক নন্দাবতীর গা থেকে উমাপ্রসাদ নগরে উঠে আসছে। কারা এল ? কেন এল ?

তিনজনের একজন কুলি। বাকি দুজনের পরনে অতি উগ্র রঙীন পোশাক। একজন বেশ লম্বা, আরেকজন খুবই বেঁটে। একজনের মাথায় ছোট ছোট চুল—একেবারে পালোয়ানের মত। চেহারাটি কিন্তু উল্টো। দ্বিতীয় জনের চুল আবার তেমনি বড় বড়। শৈলেশদা বললেন, "লোকটা পাগল। আরে এটা কি তোর লিলি-পুলের পথ যে মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে এসেছিস ?"

আমরা অতি কষ্টে হাসি চেপে রাখি। প্রাণেশ গম্ভীরভাবে বলে, "কেন? এইতো মাসখানেক আগে ডাক্তার মণি বিশ্বাস সপরিবারে নন্দন-কানন থেকে বেড়িয়ে গেলেন।"

শৈলেশদা রেগে ওঠেন "তুমি থাম দেখি হে! কার সঙ্গে কার তুলনা।"

আগন্তুকরা শের সিং-য়ের ঘর ছাড়িয়ে আমাদের এলাকার বাইরে গিয়ে থামল। আইস এক্স দিয়ে রুমেক্সের শুকনো জঙ্গল পরিষ্কার করে তাঁবু খাটাল। পাওনা মিটিয়ে কুলিকে বিদায় করে দুজনে তাঁবুর ভেতরে অদৃশ্য হল। ভালই হল। ওরা তাহলে কয়েকদিন এখানে থাকবে। সহরে প্রতিবেশী যতই দুঃসহ হোক, এই বিজন প্রান্তরে আমরা ওদের পরম প্রিয় বলেই বরণ করব।

আজকের মত প্রশিক্ষণ শেষ। শ্রান্ত দেহে নেমে চলেছি ক্যাম্পে। প্রতিবেশীরাও দেখি এদিকে আসছে। বেশ জোরে জোরে উঠে আসছে। নিতাইকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে তার পাশ দিয়ে একটা মাঝারি গোছের পাথরে গিয়ে চড়ল। বোধ হয় ওরা আমাদের রক ক্লাইম্বিং-য়ের কসরৎ দেখাচ্ছে। শৈলেশদা এতক্ষণে তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন, "তাই বল। বড়-চুল মেয়েছেলে নয়।"

আমরা এবারেও গম্ভীর। নিতাই প্রতিবেশীদের ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

"উই আর ক্লাইম্বার্স ফ্রম দি সাউথ।"

'সাউথ' শব্দটা সে এমনভাবে উচ্চারণ করল যে, দক্ষিণ ভারত বা দক্ষিণ আমেরিকা—দুইই হতে পারে।

"তা আপনারা কোন্ পিক ক্লাইম্ব করতে এসেছেন?" ভানু প্রশ্ন করে।

চারিদিকে একবার নজর বুলিয়ে বড় চুল বলে, "উ'ইল্ ক্লাইম্ব দিস্ পিক।"

সেকি! ও যে রতবন। নীলগিরি বিজয়ের পর ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ, পিটার অলিভারের সঙ্গে দু বার চেষ্টা করেও ঐ পর্বত শিখরে আরোহণ করতে পারেন নি। দু বছর পরে ১৯৩৯ সালের ৮ই আগস্ট আঁদ্রে রশ-য়ের নেতৃত্বে, সুইস অভিযাত্রী আর্নস্ট হুবার, শেরপা নিমা ও মোর কৌলিয়া নামে একজন স্থানীয় কুলি ২০,২৩০ ফুট উঁচু এই দুর্গম শৃঙ্গটি জয় করেন।

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে বড়-চুল কাঁধ দুলিয়ে বলে, "আমরা ফরেন ট্রেন্‌ড্ মাউন্টেনিয়ার্স। ও ট্রেণিং নিয়েছে সুইজারল্যাণ্ডে আর আমি নিয়েছি চিলিতে।"

"চিলিতে ?" ডক্টর ভট্টাচার্য বুঝতে পারেন না।

"চিলি, এ্যাণ্ডীজ, সাউথ ম্যারিকা।" বড়-চুল ব্যাখ্যা করে।

"কিন্তু শেরপা সাজ-সরঞ্জাম খাবার দাবার—কিছুই তো আপনাদের সঙ্গে দেখছি না।" চঞ্চল জিজ্ঞেস করে।

"আমরা শেরপা ছাড়াই ক্লাইম্ব করি। ইকুইপমেণ্ট আমরা এনেছি ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং-য়ের কাছ থেকে। আর খাবার আমাদের সঙ্গে আছে—চা-চিনি, জ্যাম-জেলী ও ছত্রিশখানা আটার রুটি।" ছোট-চুল বলে।

"কখানা ?" দেবীদাস বিস্মিত।

"ছ…ত্রি…শ…খানা। পুরো তিন দিনের খোরাক। যথেষ্ট। এই পিক্ ক্লাইম্ব করতে আর কদিন লাগবে ?"

"এদের মাথার কলকব্জা ঢিলে আছে।" ডাক্তার বাংলায় বলে।

"কিন্তু ওটা হচ্ছে রতবন। স্মাইথও ওখানে উঠতে পারেন নি। তাঁর সহযাত্রী অলিভার বলেছেন—It was the hardest and steepest climb I have done in the Himalayas." ওদের নির্ঘাৎ মৃত্যু থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি।

"ওঃ। তাই বুঝি ?" ছোট-চুল চিন্তিত।

"বেশ আমরা তবে ঐ পিক্‌টা ক্লাইম্ব করব।" বড-চুল বলে।

"ওটা ঘোড়ী পর্বত। আরও উঁচু—২২০১০ ফুট। কোন ভারতীয় আজ পর্যন্ত উঠতে পারেন নি। ১৯৩৯ সালের ১৮ই অগাস্ট আঁদ্রে রশ, ডেভিড জগ ও ফ্রিত্‌শ স্টিউব্রি ঐ শৃঙ্গে আরোহণ করেন। ওটাও বেশ শক্ত হবে।" নিরাপদ পরামর্শ দেয়।

"আচ্ছা তাহলে নদীর ওপারে ঐযে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, আমরা ওটা ক্লাইম্ব করব।"

"তাই ভাল।" ওদের উৎসাহিত করে তুলতে চাই। কারণ এবারে বড়-চুল যে পাহাড়টি দেখিয়েছে, সেটি কোন পর্বতশৃঙ্গ নয়। পাথরের একটি স্তূপ—টিপরা খড়ক। দূরত্ব সামান্য উচ্চতাও বেশী নয়। আমরা কাল বিকেলেও একবার ওর ওপরে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

ওরাও যাক। গিয়ে বেড়িয়ে আসুক। টিপরা খড়ককে পর্বতশৃঙ্গ ভেবে, আর এই বেড়ানোকে পর্বতাভিযান ভেবে ওরা যদি আত্মপ্রসাদ লাভ করে, করুক। আমরা ওদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করব না। আমরা স্মরণ করব তাঁদের, যাঁদের স্মৃতিই আজ আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়—যাঁরা আমাদের পথিকৃৎ।

আমরা ভাবব ১৯৫৯ সালের কথা। সে বছর গাড়োয়াল ও কুমায়ুনে সেনা বাহিনীর তিনটি বিভাগ থেকেই তিনটি অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। নৌবাহিনীর লেঃ এম. এস. কোহলির নেতৃত্বে ২৫শে মে নন্দাকোট শৃঙ্গ (২২,৫১০ ফুট) বিজিত হল। স্থল বাহিনীর দলটি ক্যাপ্টেন জগজিৎ সিং-য়ের নেতৃত্বে ৭ই জুন কৃষ্ণচূড়া (ব্ল্যাক পিক—২০,৯৫৬ ফুট) জয় করেন। এয়ার ভাইস মার্শাল এস. এন. গয়ালের নেতৃত্বে ১৭ই অক্টোবর ২৩,৪২০ ফুট উঁচু দুর্গম চৌখাম্ব-১ য়ের পতন হল।

এল ১৯৬০ ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে আরেকটি নতুন অধ্যায়—বৃগেডিয়ার জ্ঞান সিং-য়ের নেতৃত্বে এভারেস্ট (২৯,০২৮ ফুট) অভিযান। ২৪শে মে ২৬,৭০০ ফুট উঁচুতে, সাত নম্বর শিবির স্থাপিত হল। কথা ছিল পরদিন ভোর চারটের সময় শিখর অভিযাত্রীদলের তিনজন সদস্য—ক্যাপ্টেন এন. কুমার, সোনাম গিয়াত্‌সো ও নওয়াং গোম্বু যাত্রা করবেন বিশ্বের সর্বোচ্চ স্থানটিতে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানা গিয়েছিল আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া ভালই থাকবে। জয় প্রায় করায়ত্ব। সারা দেশে রটে গিয়েছিল খবরটা। বিজয় সংবাদ এল বলে। প্রথম রাতে আবহাওয়া ভালই ছিল। কিন্তু অস্থিরমতি এভারেস্ট বেঁকে দাড়াল শেষ রাতে। শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়। তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করেও কোন লাভ হল না। অবশেষে মরীয়া হয়ে অভিযাত্রীদল সকাল সাতটার সময় সেই দুর্যোগের মধ্যেই রওনা হলেন। তাঁরা এগিয়ে চললেন। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বেড়ে চলল। বরফের গুঁড়ো তাঁদের নাকে মুখে আঘাত করতে থাকল। এমন কি গগলসের রন্ধ্রপথ দিয়ে চোখে প্রবেশ করতে লাগল। তাপমাত্রা তর তর করে মাইনাস বাইশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে নেমে গেল। ঠাণ্ডায় অক্সিজেন জমে যেতে লাগল। দৃষ্টি আচ্ছন্ন, শরীর অবসন্ন, পথ দুর্গম। তবু তাঁরা এগিয়ে চললেন। পৌঁছলেন ২৮,৩০০ ফুটে। সেখানে তাঁরা পনেরো মিনিট অপেক্ষা করলেন। শেষ আশা—যদি ঝড়ের বেগ একটু কমে। বৃথাই তাদের প্রতীক্ষা। ব্যর্থ হল সকল প্রচেষ্টা। মাত্র সাতশ ফুটের জন্য এভারেস্ট রইল অপরাজিত। কিন্তু অভিযাত্রীরাও পরাজিত হন নি। কারণ—'A mountain always poses a challenge and the Himalayan giants test man's quality to the utmost. Success is important, but even more important is the spirit of daring and fellowship which alone make such attempts possible'

উনিশ শ ষাট সাল যেমন ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে, তেমনি এ বছরই বাংলার পর্বতাভিযানেরও উদ্বোধন হল। ২২শে অক্টোবর নতুন পথে দুর্গম তুষার-মৌলী নন্দাঘুন্টি (২০,৭০০ ফুট) বিজিত হল। পর্বতাভিযানে বাংলার অবদান বহুল। হিমালয় অভিযানে যারা অপরিহার্য, সেই বীর শেরপারা সকলেই বাংলার অধিবাসী—তাঁরা বাঙ্গালী। তাছাড়া প্রথম এভারেস্ট অভিযানে ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট অজিত কুমার চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন (ডাক্তার) সুধাংশু কুমার দাস অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাহলেও প্রথম বেসরকারী বাঙ্গালী অভিযানরূপে নন্দাঘুন্টি বিজয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সাফল্যের দিক থেকে বিচার করলে ১৯৬১ সাল ভারতীয় পর্বতারোহণের স্বর্ণ বৎসর। এই বছর ৬ই মে মধ্য নেপালের অপরাজিত অন্নপূর্ণা-৩ (২৪,৮৫৮ ফুট) পরাজিত হল। লেঃ কোহলি এই অভিযান পরিচালনা করেন। এ বিজয়ের ফলে অন্নপূর্ণার চারটি শৃঙ্গই ভারতীয় অভিযাত্রীদের নিকট নতি স্বীকার করল।

যে পর্বত শিখর বদ্রীনাথকে দিয়েছে তার ধ্যানগম্ভীর রূপ, সেই নীলকণ্ঠ (২১,৬৪০ ফুট) এতকাল দাঁড়িয়ে ছিল উদ্ধত গৌরবে, ছিল অপরাজিত। এই বছর ১৩ই জুন সে মনুষ্য পদচিহ্নে কলঙ্কিত হল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সাত দল অভিযাত্রীকে পরাজিত করে, নীলকণ্ঠ তাঁর কণ্ঠস্থিত জয়মাল্যখানি পরিয়ে দিল শ্রী ও. পি. শর্মা ও তাঁর দুজন শেরপা সহযাত্রীর কণ্ঠে। এর আগে কেউ এই শৃঙ্গে ১৯০০০ ফুটের ওপরে উঠতে পারেন নি। ক্যাপ্টেন এন. কুমার এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। বাঙ্গালী ডাক্তার, লেঃ আর. সি. রায়. ও ফ্লাঃ লেঃ অজিত কুমার চৌধুরী এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

এ বছরই নন্দাদেবী শিখরে দ্বিতীয় ভারতীয় অভিযান পরিচালিত হল শ্রীগুরুদয়াল সিংয়ের নেতৃত্বে। অভিযাত্রীরা সাফল্যের সঙ্গে ২০,৫০০ ফুট উঁচুতে দু নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করলেন ১০ই জুন। কিন্তু অকাল বর্ষণের কবলে পড়ে তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। ফেরার পথে ১৬ই জুন দেবীস্থান-১ (২১,৯১০ ফুট) ২১শে জুন মাইকতোলি (২২,৩২০ ফুট) ও ৩০শে জুন ত্রিশুল জয় করলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে পরিচালিত হল মানা (২৩৮৬০ ফুট) অভিযান। কিন্তু এ অভিযান বিফল হয়।

২০শে অক্টোবর পর্বতারোহণের একটি নতুন নজির স্থাপিত হল। কয়েকটি তরুণ মাত্র তিন হাজার টাকা সম্বল করে শেরপাদের সাহায্য ছাড়াই, ২১,৬৯০ ফুট উঁচু নন্দাখাত শৃঙ্গ জয় করেন। এই অভিযাত্রীদলে ছিলেন সর্বশ্রী পৃথ্বী চৌধুরী, বীরেন সরকার, ভূপেন বসু, অমর চৌধুরী, বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, রমেশ খান্না ও বৃজমোহন মনোচা।

পরের দিন (২১শে অক্টোবর) শ্রী সোনাম্ গিয়াত্সোর নেতৃত্বে বিজিত হল ২২,৭০০ ফুট উঁচু সিকিমের খাংচেনগিয়।

১৯৬২ সালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মেজর জন ডায়াসের নেতৃত্বে ভারতের দ্বিতীয় এভারেস্ট অভিযান। এ অভিযানও বিফল হয়েছে। কিন্তু অভিযাত্রীরা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ২৮০০০ ফুট উঁচুতে তিন দিন কাটিয়ে, মানুষের সাহিসকতা, সহনশীলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার যে পরিচয় দিয়েছেন, তা অভূতপূর্ব। প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে পড়ে মাত্র তিন শ ফুট বাকি থাকতে তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হন।

এ বছর এ পর্যন্ত একটি মাত্র পর্বতশৃঙ্গ বিজিত হয়েছে। নেতা মেজর কে. এস রানা তিনজন শেবপা ও ক্যাপ্টেন আলুওয়ালিয়ার সঙ্গে ২৬শে এপ্রিল কোকটাং শৃঙ্গে (২০,১৬৬ ফুট) আরোহণ করেন। আমাদের স্বপ্ন সফল হলে, বিজয়ের সংখ্যা বাড়বে। কিন্তু তা হবে কী? আমরা কি পারব নীল দুর্গমের শিখরে উঠতে? নিশ্চয়ই পারব। নইলে কেন এই পুজোপার্বণের দিনে সব ছেড়ে এসেছি এখানে?

শিব শিবানীকে নিয়ে চলে গেলেন কৈলাশ। কিছুকাল কেটে গেল। মেনকা মেয়েকে না দেখে কাতর হয়ে পড়লেন। মেয়েকে আনাবার জন্য গিরিরাজ হিমালয়কে উত্যক্ত করে তুললেন। বাধ্য হয়ে তিনি মৈনাককে পাঠালেন। মৈনাক গিয়ে শিবকে বললেন—মেয়ের মুখ না দেখে মায়ের বুক পুড়ে যাচ্ছে। তাই বাবা আমাকে পাঠিয়েছেন। সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিনের জন্যে গৌরীকে ছেড়ে দিন। সে দশমীতে আবার ফিরে আসবে কৈলাশে। মহাদেব নিরুত্তর মৈনাক উৎকণ্ঠিত, মহামায়া নির্বাক। তাঁরও একান্ত ইচ্ছা মা-বাবাকে দেখতে যান। কিন্তু শঙ্করের অমতে যান কেমন করে? শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই অনুমতি চাইলেন। শিব প্রথমে রাজী হলেন না। এমনি ভাবেই সতী একদিন দক্ষালয়ে চলে গিয়েছিলেন। আর ফিরে আসেন

নি। ভগবতী তখন বিশ্বনাথকে বললেন—আমি পুজো নিতে যেতে চাইছি। সেখানে তিন দিনে তিন লক্ষ সন্তানের পুজো নেব। আপনি অনুমতি করুন হে মহেশ্বর! নিরুপায় শিব অগত্যা অনুমতি দিলেন। লক্ষ্মী সরস্বতী সহ শিবানী সিংহরথে আরোহণ করলেন। কার্তিক ও গণেশ চললেন মায়ের সঙ্গে।

মা এসেছেন দেশে। পুজো আরম্ভ হয়ে গেছে। আজ ৭ই অক্টোবর—মহাষ্টমী। মনে পড়ছে কলকাতার কথা। দুঃখ দৈন্য নিয়েছে বিদায়। আকাশ বাতাস হয়ে উঠেছে আনন্দ মুখর। হাসি মুখে, নতুন পোশাকে, সবাই বেরিয়েছে পথে। প্রতিমা দেখছে—পুজো দেখছে।

আমরাও পুজো দেখছি। কলকাতায় নয়, হিমালয়ে—উমাপ্রসাদ নগরে। ডাক্তার পুজোয় বসেছে—দেবীদাস তাকে যোগান দিচ্ছে। আয়োজন যাই হোক, সন্তানের সংখ্যা নগণ্য নয়। আমরা সবাই ভক্তিভরে পুজো দেখছি।

পুজো শেষ হল। ডাক্তার ব্রহ্মকমলের নির্মাল্য ও লর্ডসের লজেন্স প্রসাদ বিতরণ করল সবাইকে।

কুলিরা মাল নিয়ে চাকুলঠেলায় রওনা হয়ে গেল। সব মাল এ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে পাঠাতে আরও দিন দুয়েক সময় লাগবে। তবে গত কাল তাঁবু ফেলা হয়েছে। আজ তাই ভানু নিতাই নিরাপদ ও চঞ্চলকে নিয়ে অমূল্য চলে যাচ্ছে এ্যাডভান্স বেসে। পিনাকীও ওদের সঙ্গে যাবে। মালপত্র গুছিয়ে দিয়ে কাল ফিরে আসবে।

ওরা চলে যাচ্ছে। আমরাও সকাল সকাল খেয়ে নিলাম। ছুতার আজ রান্নাটা ভালই করেছে। শেরপাদের সঙ্গে সেও চলে যাচ্ছে ওপরে। কাল থেকে কুলি চন্দ্র সিং ছুতারের পদে প্রোমোশান পাবে। কি খেতে হবে কে জানে? বেলা এগারোটার সময় অমূল্যরা রওনা হয়ে গেল। কাল থেকেই ওরা নীলগিরির নতুন পথ খুঁজতে শুরু করবে। স্মাইথ ১৯৩৭ সালে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে নীলগিরি বিজয় করেছিলেন। তাঁর মতে অন্য কোন দিক থেকে শিখরাভিযান সম্ভব নয়। আমরা একবার চেষ্টা করে দেখব, নতুন কোন পথে যাওয়া যায় কিনা।

অমূল্যদের নন্দাবতীর উৎস পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তাঁবুতে ফিরে চলেছি। দেখি ফয়েন ট্রেনড মাউণ্টেনিয়ার্সদের একজন একটা কিটব্যাগ কাঁধে করে নন্দাবতীর দিকে চলেছে। আমাদের দেখতে পেয়েই সে দাঁড়িয়ে পড়ে। কাঁধ থেকে কিটটা নামায়। কাছে এসে দেখি বড়-চুল। সে অমূল্যদের দিকে

ইশারা করে জিজ্ঞেস করে, "ওরা কোথায় চলল ?"

"ওপরে। আমাদের এ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে।" বীরেন বলে।

"সেটা কোথায় ?"

"চাকুলঠেলায়।"

"সে আবার কোথায় ?"

"মোটামুটি উত্তরে। এখান থেকে প্রায় এগারোশ ফুট ওপরে..."

বড়-চুলের কোথায়-এর স্রোত বন্ধ করার জন্য বীরেনের কথার মাঝেই বলে উঠি, "আপনি কোথায় চললেন ?"

"ওপারে।"

"কেন ?"

"একই কারণে।"

"মানে ?"

"এ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পের সাইট সিলেক্ট করতে। আইডিয়্যাল সাইট পেলে এই কিটটা সেখানে রেখে আসব।"

"আপনার কমরেড ?" বীরেন বলে।

"পেটের গোলমাল। শুয়ে আছে। রুটিগুলো ঠিক বরদাস্ত হচ্ছে না।"

"আচ্ছা আপনি যান। আমি ও ডাক্তার তাকে দেখে আসছি।"

বড-চুল তার জামাটা ঠিকঠাক করে, কাঁধটাকে কয়েকবার দুলিয়ে নিয়ে, কিটটাকে কাঁধে নিল। তারপর আমাদের দিকে একটি তির্যক দৃষ্টি হেনে, তার টিপরা খড়ক অভিযানের অগ্রবর্তী মূল শিবির নির্বাচনের জন্য যাত্রা করল।

চন্দ্র সিং বৈকালী চায়ের ঘণ্টা বাজিয়েছে। আমরা মগ হাতে রান্না ঘরে ছুটলাম। চা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি শের সিং-য়ের সঙ্গে ছোট-চুল। কি ব্যাপার ? ছোট-চুল জানালো চিলি-ট্রেণ্ড কমরেড তার এ্যাডভান্স বেস থেকে আর ফিরে আসে নি। চিন্তার কথা। এতো এ্যাণ্ডিজ নয়, এ যে হিমালয়। এখানে ভালুক আছে, হয়তো বা তুষার মানবও আছে। ছোট-চুল কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে, "একটা উপায় করুন।"

কিন্তু কিছুই করতে হল না। কিছুক্ষণ বাদে সেই সর্ব-রং-সমন্বিত সাজ ধরা দিল বায়নোকুলারের লেন্স-এ—ঝোপ-ঝাড় ও পাথরের মধ্যে নড়বড় করছে চিলি-ট্রেণ্ড। টলতে টলতে কোন মতে নেমে আসছে। কাঁধে কিট নেই, ঠোঁটে সিগ্রেট নেই, চোখে মুখে সেই স্মার্টনেস নেই।

যেভাবেই হক, শেষ পর্যন্ত সে এসে পৌছল নন্দাবতীর তীরে। আমরাও ততক্ষণে অপর তীরে এসে দাঁড়িয়েছি। চৈৎ সিংকে ওপারে পাঠালাম। আর পাঠিয়েই বিপদ হল। ঘোড়া দেখেই খোঁড়া। বড়-চুল তার ঘাড়ে চাপবে। চৈৎ সিং তাকে যতই বোঝাক, সে কিছুতেই এই ভর-সন্ধ্যেবেলায় ক্লাইম্বিং বুট খুলে বরফ জলে নামবে না। এই জল এড়াতে গিয়েই নাকি তার এত দেরী। মাইল খানেক চড়াই ভেঙ্গে উৎসের কাছাকাছি এক জায়গায় পাথর পেয়ে, তবে সে ওপারে গেছি। ডাক্তারকে এপারে দেখেও তার নিমোনিয়ার ভয় গেল না। অবশেষে চৈৎ সিংয়ের সওয়ার হয়ে তার এ্যাডভান্স বেস প্রতিষ্ঠা করে, বিজয় গর্বে ফিরে এল চিলি-ট্রেন্ড।

পরদিন। আজ ফরেন্ ট্রেন্ডদের সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। অথচ বেলা দশটার সময় পিনাকীকে নেমে আসতে দেখে আমরা গলা ছেড়ে চিৎকার করেছি। পিনাকীর সম্মানে দ্বিতীয় রাউণ্ড চায়ের হুকুম জারী করা হল। পিনাকী কিছু মালপত্র দিয়ে দুজন কুলি, ওপরে পাঠিয়ে দিল। ডাক নিয়ে জমান সিং জোশীমঠে চলে গেল। একান্ন খানা চিঠি গেছে আজ। তার মধ্যে একত্রিশখানাই নেতা ও সহনেতার—ওপর থেকে নিয়ে এসেছে পিনাকী। নিজের কিন্তু একখানাও নেই। পরের বোঝা বয়ে বেড়ানোই ওর কাজ। কিন্তু নিজের কথা কি কোন দিন ভাববে না পিনাকী?

হঠাৎ দেখি বড়-চুল রান্নাঘরে, "ক্যান্ আই বায় অর বরো সাম্ সিগ্রেট্স প্লিজ?"

"না। তবে এমনি দিতে পারি ইম্পিরিয়াল টুব্যাকো আমাদের অনেক সিগারেট দিয়েছেন।" পিনাকী খাওয়া ফেলে স্টোর্স থেকে দু প্যাকেট ক্যাপস্টান এনে ওকে দিল। সিগারেট হাতে পেয়েও বড়-চুল কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে—আমাদের খাওয়া দেখছে।

দেবীদাস জিজ্ঞেস করে, "আপনাদের খাওয়া হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ···না, মানে, ঐ রুটিগুলো বড্ড শক্ত হয়ে গেছে। আর জেলীও গরম করে নরম করতে হবে। আচ্ছা ধন্যবাদ। চলি।"

"আরে সেকি? আসুন আসুন, বসে পড়ুন। লজ্জার কি আছে?" বীরেন বলে।

"আমার বন্ধু···"

"তাকেও ডাকুন।" প্রাণেশ আশ্বাস দেয়। বড়-চুল সেখানে দাঁড়িয়েই

হাতখানা একবার নাড়ে। বোধ করি সিগন্যাল দেয়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ছোট-চুল এসে গেল। সে জোর হাঁপাচ্ছে। সিগন্যাল পেয়েই ছুটে এসেছে কিনা।

পরদিন দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে ওরা তাঁবু গুটিয়ে ঘাংরিয়া রওনা হল। বড়-চুলের এ্যাডভান্স বেস থেকে কিট্ ব্যাগটা কুলি দিয়ে আনিয়ে দিয়েছি। পথের খাবারও সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি। এবারে ওদের শৃঙ্গ-বিজয় হল না। বোধকরি ভালই হল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পারল।

একটু আগে মালপত্র কাঁধে নিয়ে ওরা ঘর-মুখো হয়েছে। অনেকটা দূর অবধি আমরা ওদের এগিয়ে দিয়েছি। বিদায় বেলায় আমাদের চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠেছে। বেস ক্যাম্পের এই কর্মময় জীবনে অনেক আনন্দ দিয়ে গেছে ওরা।

কুলিরা কিন্তু কাঁদে নি। তাদের আশা ছিল বখশিস্ পাবে। পায় নি কথাটা সত্য নয়। তবে যা পেয়েছে, তা তাদের কোন কাজেই আসে নি। ছত্রিশখানা রুটির চব্বিশখানাই ওরা এখানে রেখে গেছে।

॥ ২১ ॥

"সব ঠিক আছে তো?" উপেনবাবু তাঁবুতে ঢোকেন। অমূল্যরা চলে যাবার পর আমরা সবাই মেস টেন্টে বাস করছি। উপেনবাবুকেও আমাদের তাঁবুতে নিয়ে এসেছি। তিনি শুধু অমূল্যর জায়গা দখল করেন নি, তার বাণীটি পর্যন্ত আত্মস্থ করে ফেলেছেন। 'সব ঠিক আছে তো' কথাটা অমূল্যর পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের অভিধান-অভিবাদনে পরিণত।

"না, বড্ড শীত করছে।" সাড়া দিই।

"মাইনাস আট ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডেও কি গরম লাগবে নাকি? কিন্তু খেতে গেলেন না কেন?"

"সারা বিকেল তাঁবুর ওপরের বরফ ঝেড়ে এখন বড্ড শীত করছে। তাছাড়া স্লিপিং ব্যাগটা এত করে গরম করেছি। বেরুলেই তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু কথাটা আবার ডাক্তারকে বলবেন না যেন।"

"না বললেও ডাক্তার তা জেনে নিতে জানে।" বলতে বলতে ডাক্তার

হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুতে ঢোকে। তার পেছনে একে একে বীরেন প্রাণেশ পিনাকী ও দেবীদাস ভেতরে আসে। ডাক্তার সোজা আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, "কি বলছিলেন উপেনবাবুকে?"

চুপ করে থাকি। ডাক্তার আবার প্রশ্ন করে, "কি হয়েছে বলুন। খেতে যান নি কেন?"

উপেনবাবু ও শৈলেশদা মুচকি হাসছেন। আমি গম্ভীর স্বরে বলি, "কিছুই হয় নি। তবে শরীরটা ভাল লাগছে না। তাই শুয়ে আছি।"

"কিছুই হয় নি অথচ শরীরটা ভাল লাগছে না? স্লিপিং ব্যাগের জিপ খুলুন দেখি।"

যে স্লিপিং ব্যাগের মায়ায় আহার ত্যাগ করেছি, সেই স্লিপিং ব্যাগ খুলতে হবে? তার চেয়ে ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করাই ভাল। ডাক্তার স্টেথো আনতে যাচ্ছে। বাধা দিয়ে বলি, "ওর দরকার হবে না। আমার কিছুই হয় নি।"

"তাহলে খেতে যান নি কেন?"

"শীত লাগছিল।" বলেই হেসে ফেলি।

ডাক্তার হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, "আমি ভাবলাম না জানি কি হয়েছে। তাই বলে শীতের ভয়ে না খেয়ে থাকবেন। না, না, তা হবে না। আমি চন্দ্র সিংকে বলছি শৈলেশদার খাবারের সঙ্গে সে আপনার খাবারটাও দিয়ে যাবে।" ডাক্তার তুষারপাতের মধ্যেই আবার বেরিয়ে যায়।

ট্র্যানজিস্টার পর্ব শেষ হল। কিন্তু আড্ডা শেষ হল না। শুয়ে শুয়ে গুলতানি চলছে। তবে মুখ দেখা দেখি নেই। উপেনবাবু ছাড়া আমরা সবাই স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে। তিনি যথারীতি হাতে কাজ করছেন, মুখে কথা বলছেন। সারাদিন ধরে যে সব প্রজাতি সংগ্রহ করেছেন, সেগুলো ব্লটিং পেপারে চাপা দিচ্ছেন। যেদিনেরটা সেদিন না করলে প্রজাতি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ কাজটা শুধু বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াই নয়, কিছুটা শিল্পকলাও বটে। কুঁড়ি থেকে ঝরে যাবার আগে পর্যন্ত, প্রতিটি ফুলের বিভিন্ন অবস্থার নমুনা তিনি সংগ্রহ করছেন। শুধু ফুল নয় লতাপাতাও বহু যোগাড় করেছেন। কিন্তু যোগাড় করলেই হল না। প্রজাতিগুলো যাতে নয়নাভিরাম ভাবে সাজানো হয়, সেদিকেও তাঁর কড়া নজর।

এই সব গাছপালার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ উপেনবাবুর জীবনে এই প্রথম। ওদের জীবন চক্রের ভেতর তিনি নাকি এমন অনেক কিছু

দেখেছেন যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও খুব উপভোগ্য। তাঁর মতে—এখানকার গাছপালারা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অর্থাৎ আকস্মিক ঠাণ্ডায় কোন ক্ষতি হবার আগেই তাদের বংশ বিস্তারের কাজটি সেরে নেয়। হিমালয়ের এগারো থেকে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাধারণতঃ বরফ থাকে না। এই উচ্চতায় যেখানেই মাটি আছে, সেখানেই এ সময় নানারকমের দুর্লভ গাছপালা দেখতে পাওয়া যায়। অল্প বরফ ও তুষারপাতের মধ্যে যারা বেঁচে থাকতে পারে, তারাই শুধু এ সব জায়গায় জন্মায়। এদের অধিকাংশেরই পাতায় এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা আছে যে তুষার সাত মাসে এদের কোন ক্ষতিই করতে পারে না—যেমন ভূজ রডোডেনড্রন জুনিপার ইত্যাদি। যাদের তা নেই, তারা সব কিছু বিসর্জন দিয়ে শীতের সময় বীজটিকে বরফের তলায় ঘুম পাড়িয়ে রাখে—যেমন পলিগোনাম পোটেনটিলা অর্কিস (হাতাজড়ী) ইত্যাদি। নন্দন-কাননের অধিকাংশ গাছপালাই এই ধরনের জীবনযাত্রা পছন্দ করে। তাই কেবল জুলাই আগাস্ট মাসেই এখানে ফুলের বাহার।

ব্রহ্মকমল (Saussurea obvallata) হেমকমল (Saussurea gradniflora) ফেনকমল (Saussurea gossypiphora) প্রভৃতি কিন্তু অন্য উপায়ে বাঁচে। এরা আরও উঁচুতে প্রায় বরফের মধ্যে জন্মায়। ব্রহ্মকমলেব পাতায় শুধু যে কাটা ও তীব্র গন্ধ আছে তাই নয়, ওগুলো অনেকটা এ্যালক্যাথিনের মত—বাইরের দিকটা শুষ্ক, ভেতরটা তৈলাক্ত। এই পাতাগুলোই পাপড়ির মত ফুলটিকে ঢেকে রাখে। হিমেল হাওয়া সহজে তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর হেমকমল ও ফেনকমলের গাছগুলো তুলোর মত আঁশ দিয়ে আবৃত—যেন প্রাকৃতিক স্লিপিং ব্যাগ। এ জাতীয় আরও অনেক ফুল আছে, যেমন এ্যানাফেলিস। এরা কোন দিনই শুকিয়ে যায় না। তাই এরা বদ্রীনারায়ণের পূজার নির্মাল্য।

"মহারাজ, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?"

উপেনবাবুর প্রশ্নে আমার ভাবনার সূত্র ছিঁড়ে যায়, বলি "না।"

"এখনও শীত করছে? বরফপড়া কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। বেরুবেন নাকি একটু?"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসি।

বাইরে এসে দেখি উপেনবাবু ঠিকই বলেছেন। তুষারপাত বন্ধ হয়েছে।

কিন্তু এ আমি কোথায় এলাম ? এ তো উমাপ্রসাদ নগর নয়, এ যে অমরাবতী ! তারায় ভরা আকাশ নেমে এসেছে আমার কাছে, যেন মুক্তো বসানো ঘন-নীল একখানি চন্দ্রাতপ কেউ দিয়েছে টাঙিয়ে। আনাগোনা করছে শুভ্র মেঘদল, যেন বলাকাকুল আপন মনে যাচ্ছে উড়ে, কোন এক অদৃশ্য সরোবরে। শুধু আকাশ নয় চাঁদও নেমে এসেছে আমাদের তাঁবুর ঠিক ওপরে। কেন যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ও যদি আর একটু আসত নেমে, কিম্বা আমার এই হাত দুখানি আর একটু বড় হত, তাহলে আমি ধরে ফেলতাম ওকে—চাঁদ হাতে পেতাম।

চারিদিক শুধুই সাদা। তুষারে সাদা হয়ে আছে মাটি পাথর পাহাড় জঙ্গল, এমন কি আমাদের তাঁবু কটি। চাঁদের মধুর আলোর প্রতিসরণে উপেনবাবু রূপান্তরিত হয়েছেন ছায়ায়—কায়াহীন ছায়ায়।

এই গতিশূন্য সীমাহীন স্তব্ধ জগতে আমরা অনাহুত। শুধু আমরা নই, অনাহুত ঐ নন্দাবতী। অনাদি অনন্তকাল ধরে সে জীবনের জয়গান গেয়ে চলেছে। শীতে সে অসাড় হয় নি, তুষারে উদ্বিগ্ন হয় নি, জ্যোৎস্নায় উদ্বেলিত হয় নি। তার দিন-রাত্রির প্রভেদ নেই, শীত-গ্রীষ্মের বিভেদ নেই—জরা নেই মৃত্যু নেই। অমরাবতীর প্রাণধারা এই নন্দাবতী। চিরযৌবনের প্রতীক এই নন্দাবতী। আমাদের পরম প্রেরণা এই নন্দাবতী।

অমর সিংয়ের মামা পান সিং। পান সিং-য়ের মামা চন্দ্র সিং। তিনজনেই কুলি হিসেবে এসেছে আমাদের সঙ্গে। ভাগ্নে ও নাতি মাল বইছে নিয়মিত। আজ সকালেও ওরা মাল নিয়ে গেছে চাকুলঠেলায়। দাদু কিন্তু আজ কদিন হল বৃত্তি বদলেছে। কুলি চন্দ্র সিং পাচক ঠাকুর হয়েছে। রাঁধছে ভালই। আজ তাই খেতে বসে জিজ্ঞেস করি তাকে, "তুমি কি আগে কোথাও রসুইয়ের কাজ করেছ চন্দ্র ?"

"জী সাব্।"

"কোথায় ?"

"প্রথমে দেরাদুনে। জোন্‌স্ মেমসাবের বাড়িতে। তিনিই আমাকে রান্নার কাজ শিখিয়েছেন। পরে এক আমেরিকান পর্বতাভিযাত্রী দলেরও পাচক হয়েছিলাম। তাঁরা তো আমার রান্না খেয়ে খুশী হয়ে আমাকে তাঁদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

বিস্মিত হই। এটা তো জানা ছিল না যে আমাদের পাচকও আমেরিকা

ফেরত। কৌতূহলী হয়ে চন্দ্রকে তাঁর অতীত জীবনের কথা শোনাতে অনুরোধ করি। চন্দ্র সিং বলতে থাকে—পিথোরাগড় জেলায় গার্বিয়াংয়ের কাছে একটি ছোট্ট গাঁয়ে তার বাড়ি। কিন্তু সে জন্মেছে গৌচরে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। বিশ বছর বয়সে দেরাদুনে এসে গুর্খা রেজিমেণ্টে ভর্তি হল। তিন বছর বাদে ব্রহ্মদেশ পৃথক হবার পরে, তাকে চট্টগ্রাম-আরাকান সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত করা হয়। ছ বছর বাদে, জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার পরে তাকে মণিপুরে বদলী করা হল। পরের বছরই আজাদ হিন্দ ফৌজের মুখে পড়ে সে আহত হয়। ছশ গজ দূর থেকে একটা রাইফেলের গুলী এসে তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটুতে লাগে। দু মাস সরকারী হাসপাতালে থেকে চন্দ্র সুস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু তাকে আর সেনাবাহিনীতে নেওয়া হয় না। পরিবর্তে তাকে দশ বছরের জন্য ষোল টাকা মাসোহারা বরাদ্দ করা হল।

চন্দ্র সিং ফিরে এল গাড়োয়ালে। ফেরীওয়ালার কাজ শুরু করল কোটদ্বারে। বাবা আলমোড়ার একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলেন। বছর দুয়েক বাদে একটি ছেলে হল। সুখেই ছিল সে। ফেরিওয়ালা থেকে দোকানদার। ছোট্ট একটি শান্তির সংসার। কিন্তু ভগবান বাদ সাধলেন। চন্দ্রের সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। তিন বছরের একটি অবুঝ ছেলের দায়িত্ব তার কাঁধে চাপিয়ে, সহসা স্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করল।

চন্দ্র আবার পথে বেরুল। দোকান তুলে দিয়ে ফেরী শুরু করল। এবারে আর একা নয়। সঙ্গে তার তিন বছরের ছেলে। সারা বছর গাড়োয়ালের মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাল আনতে তাকে যেতে হত ঋষিকেশ হরিদ্বার দেরাদুন। দেরাদুনেই সেবার পরিচয় হল মিস্ নর্মান জোন্সের সঙ্গে।

চন্দ্র সিং আবার বৃত্তি বদলাল। ফেরীওয়ালা থেকে বাবুর্চি। জোন্স্ তাকে খুবই স্নেহ করতেন। তার ছেলেকে তিনি মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। চন্দ্র সিং-য়ের আশা পূর্ণ হতে চলল।

কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই চন্দ্র সিং বুঝতে পারে, তার শ্রদ্ধেয়া মেম্‌সাব কুলবধূ নন, জনপদ বধূ। দেরাদুনের বিত্তশালী সমাজের বিলাস-সঙ্গিনী। নিত্য নব সাজে গোধূলী বেলায় টাঙ্গায় চড়ে তিনি বেরুতেন অভিসারে। মাঝে মাঝে যাবার আগে তাঁর সে রাতের অতিথির রসনা সম্পর্কে আভাস দিয়ে যেতেন। ফরমাশ মত রসুই পাকাতে হত চন্দ্র সিংকে। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে এই দু বছরে। কিন্তু কোনদিন কোন অসুবিধায় পড়তে হয় নি

তাকে। মাইনে ছাড়াও যখন যা কিছু প্রয়োজন হয়েছে, হাত পাতলেই মেমসাব তাকে দিয়েছেন। দুটো বছর তার বড়ই শান্তিতে কেটেছে। কিন্তু তার পর আবার তার জীবনের চাকা ঘুরেছে। দেশ স্বাধীন হল। সাব্‌রাও দেরাদুন থেকে একে একে পাত্‌তাড়ি গোটালেন—মেমসাবের বাজার মন্দা হল। তিনি চলে গেলেন কলকাতায়।

ছেলেকে হস্টেলে রেখে। চন্দ্র আবার পথে বেরুল। তারপর পনেরো বছর কেটে গেছে। চন্দ্র সিং-য়ের ঘটনা বহুল জীবনে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ছেলেকে সে নিয়মিত টাকা পাঠাতে কসুর করে নি কোনদিন। ছেলেটি দুবছর আগে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে এখন কলেজে পড়ছে। আগামী বছর বি এ পাশ করবে। চন্দ্রের স্বপ্ন সফল হবে।

দেরাদুন থেকে চন্দ্র গেল হিমাচল প্রদেশে—মণ্ডি সহরে। কোনবারই বেশীদিন বেকার থাকতে হয় নি তাকে। এবারেও তার অন্যথা হল না। কয়েকদিনের মধ্যেই সিনেমা হলের গেট কিপারের কাজ পেয়ে গেল। বেশ মজার চাকরী। কত লোকের সঙ্গে জানাশোনা হল, খাতির পেল। সবাই সেধে আলাপ করে। তারই মধ্যে একটা দূরত্ব বজায় রাখে চন্দ্র সিং। তার মূল্য যায় বেড়ে।

কিন্তু সব নিয়ম কি সবার বেলায় খাটে? তাই সেদিন শো শুরু হবার আগে পুষ্পাকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, চন্দ্র তাকে কাছে না ডেকে থাকতে পারে নি। পুষ্পাও কিন্তু তার ডাকে সাড়া দিয়েছিল। এগিয়ে এসেছিল কাছে। করুণ কণ্ঠে বলেছিল—তার বাবা তাকে 'খেল' দেখার পয়সা দেয় নি। পঞ্চদশী কিন্নরীর অশ্রুধারা, পঁয়তিরিশোত্তর কুমায়ুনীর মন ভিজিয়েছিল। বন্ধ দুয়ার খুলে গিয়েছিল।

সদা অনুসন্ধিৎসু চন্দ্র বছর খানেকের মধ্যেই অপারেটারের কাজটা রপ্ত করে ফেলল। কিছুদিন বাদে স্থায়ী অপারেটার চলে গেলে চন্দ্র সিং গেট কিপার থেকে অপারেটার হল। তার মাইনে বাড়ল, সম্মান বাড়ল, প্রতিপত্তি বাড়ল।

পুষ্পার তো পোয়াবারো। সেও অপারেটিং রুমে তার স্থায়ী আসন করে নিল। চন্দ্রর পাশে বসে যেদিন খুশী, যতক্ষণ খুশী খেল দেখে সে। ছবি ছিঁড়ে গেলে দুজনে মিলে জোড়া লাগায়। দুজনের বয়সের পার্থক্য বিবেচনা করে ওদের নিয়ে কেউ কোন আলোচনা করে নি কোন দিন।

চলমান চন্দ্র সিং-য়ের জীবন থেকে এইভাবে আরও একটি বছর হারিয়ে গেল। পঞ্চদশী পুষ্পা তখন সপ্তদশী কুমারী। চন্দ্রর বয়সটাও স্থির থাকে নি, বেড়েছে। কিন্তু দুজনের বয়সের পার্থক্য যেন কমে গেছে। কতখানি কমেছে তা তখনও তলিয়ে দেখে নি চন্দ্র। দেখার পালা যখন এল, তখন ভাবার সময়টুকুও ছিল না তার হাতে।

সেদিন নাইট শো শেষ হবার কিছু আগে, হঠাৎ পুষ্পা এল তার কাছে। বিস্মিত হল চন্দ্র—এই গভীর রাতে…। তার বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাবার আগেই পুষ্পা পড়ল ভেঙে—কাল বিকেলেই পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করতে আসবে তাকে। আর সে আসতে পারবে না চন্দ্র সিং-য়ের কাছে।

চন্দ্র আর যেতে দেয় নি পুষ্পাকে। কাউকে কিছু না বলে, মণ্ডি থেকে চিরবিদায় নিয়েছে সে রাতে। অচিন দেশের ভিন জাতের এক কিশোরীর হাত ধরে, চন্দ্র আবার নেমে এসেছে পথে।

ফিরে এল গাড়োয়ালে। পথে এক মন্দিরে দেবতাকে সাক্ষী রেখে পুষ্পার সিঁথিতে সিঁদুর দিল লেপে। সস্ত্রীক চন্দ্র সিং এল পাউরীতে। বেকার রইল না সে। ডি. এ. ভি. কলেজের জনৈক অধ্যাপকের নজরে পড়ল। কাজ পেল—দোভাষীর কাজ। মিস জোন্‌সের বাড়িতে ইংরেজিটা শিখে নিয়েছিল চন্দ্র। তিব্বতী নেপালী গাড়োয়ালী কুমায়ুনী ও হিন্দি তার নিজের ভাষা। আরাকানী ও মনিপুরী মোটামুটি জানে সে। আর পুষ্পার প্রয়োজনে কিন্নরী ভাষাও শিখতে হয়েছে তাকে। অধ্যাপক পড়ে যান—চন্দ্র সিং সঙ্গে সঙ্গে ভাষান্তরিত করে বলে যায়। সবাই এই নিরক্ষর লোকটির মেধা দেখে বিস্মিত হন।

কর্মঠ চন্দ্র সিং অবসর সময় স্থানীয় সরকারী পশম বয়ন কেন্দ্রে কাজ করে। কলেজ ছুটি হলেই বেরিয়ে পড়ে পাহাড়ে—হাতাজড়ী ভূতকেশ ইত্যাদি দুর্মূল্য শেকড়, শিলাজিত কস্তুরী পশম প্রভৃতি সংগ্রহ করে চালান দেয়। এবারে আমাদের সঙ্গেও সে এই কারণেই এসেছে। এসব অঞ্চলেও ও সব জিনিস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

সেই অধ্যাপকের সুপারিশেই সেবার আমেরিকান পর্বতাভিযাত্রীদের পাচক ও দোভাষীর কাজ পেল সে। ওদের ম্যানেজার ব্যারী সাহেব তার আচরণে ও রন্ধনে এমন প্রীতি হলেন যে অভিযান শেষে তাকে নিয়ে চললেন নিজের দেশে। বহুবিধ পেশার মধ্যে, বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা চন্দ্র সিং সঞ্চয় করেছে তার জীবনে। কিন্তু তার আমেরিকা সফরের স্মৃতি সব বৈচিত্র্যকে দিয়েছে ম্লান করে।

জিজ্ঞেস করি, "যথা—?"

চন্দ্র সিং বলে, "হাওয়াই জাহাজ থেকে নেমেই বুঝতে পারি, সে এক আজব দেশ। সেখানে দিন রাতের ফারাক নেই। বাড়িগুলো খাড়া পাহাড়ের মত। রাস্তাগুলো খাদের মত। গাড়ি চলে নদীর মত—কত রকমের গাড়ি। কত সাব্ আর মেম। কাফ্রীও আছে। তারাও কিন্তু ভাল ভাল কোট প্যাণ্ট পরে। সবাই আস্তে আস্তে কথা বলে, জোরে জোরে পথ চলে, আর আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

"ব্যারী সাব্ তার বিরাট বড় লাল মোটরে করে আমাকে যে বাড়িটায় নিয়ে এলেন, সেটা ঠিক ঐ রতবনের মত উঁচু। গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তো আমার দেমাক খারাপ হয়ে গেল। কত পায়রার খোপ। কিন্তু সেই চলন্ত ঘরটায় চেপে ওপরে উঠে বুঝতে পারি সেগুলো পায়রার খোপ নয়, বড় বড় ঘর—সাব্ মেমরা থাকেন। দরজাগুলো সব একই রকম। ব্যারী সাবের নেম প্লেটটা ছিল খুবই ছোট। আমি হাত দিয়ে মেপে রেখেছিলাম। একদিন অন্য ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম কি না? আর সেই বুড়ী মেমটা তো আমাকে এই মারে কি সেই মারে। মজার ব্যাপার, বাইরে শীত কিন্তু ঘরের ভেতরে গরম। বেশ আরাম লাগে। আর গোসলখানাটা দেখার মত। কত রকমের কল—গরম জল, ঠাণ্ডা জল।

"ব্যারী সাব্ পাঁচ দিন আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন। সমুদ্র দেখলাম। কত জাহাজ। আর সবচেয়ে আজব হল সেই দ্বীপটা—সেখানে টিপরা খড়কের মত উঁচু এক দেবী মূর্তি। সবাই খুব ভক্তি করে সেই দেবীকে। আমিও তাকে ফুল দিয়ে প্রণাম করেছি।

"কি করে কোন দিকে যেতে হয় সাব্ আমাকে সব শিখিয়ে দিলেন। তার পরে একদিন দপ্তরে যাবার সময় আমাকে টাকা পয়সা দিয়ে গেলেন। বললেন বেড়িয়ে আসতে। সাব্ চলে যাবার পর আমিও কোট প্যাণ্ট জুতো পরে বেরুলাম। এলাম সেই চলন্ত ঘরটার কাছে। বোতাম টিপলাম। ঘরটা এল। দরজা খুলে গেল। আমি ভেতরে ঢুকলাম। দরজা বন্ধ হল। আমি একা। দরজা খুলে গেল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। কয়েকজন সাব্ মেম ঢুকে পড়লেন। ঘরটা চলে গেল। কিন্তু কোথায় রাস্তা? জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তো আমার চক্ষু চড়ক গাছ। রাস্তায় লোকগুলোকে চুঁটির (পিঁপড়ে) মত দেখাচ্ছে। সাবের ঘর থেকে তো চুহার (ইঁদুর) মত দেখায়। তাহলে কি

আরও উপরে উঠে এসেছি? আবার বোতাম টিপলাম। ঘরটা এল এবারে আর ভয় নেই—ভেতরে এক মেমসাব। দরজা বন্ধ হল। দরজা খুলে গেল। আমরা দুজনে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু কোথায় রাস্তা? এখন যদিও রাস্তার লোকগুলোকে বিল্লীর মত দেখাচ্ছে কিন্তু রাস্তা এখনও অনেক নীচে। আবার ঘরটায় চড়ব? দরকার নেই বাপু। ও আমায় কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে। তার চেয়ে সিঁড়ি দিয়েই নামা যাক। ঐ তো পাশেই সিঁড়ি। সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করি। নামছি তো নামছিই। সিঁড়ির আর শেষ নেই।

"বেড়াবার সুখ বেরিয়ে গেছে। এবার ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে যেতে পারলে হয়। সিঁড়ির একটা ধাপে বসেই জিরিয়ে নিলাম। তার পরে আবার ওপরে উঠতে শুরু করি। উঠছি তো উঠছিই। কিন্তু কোথায়? লোকগুলো যে চুহার চেয়ে ছোট দেখাচ্ছে। তাহলে কি বেশী ওপরে উঠে এলাম? হয়তো হবে। আবার নীচে নামা? আমার পেটের চুহারা তখন ডন মারতে শুরু করেছে।"

এইভাবে সারাদিন ধরে চলল চন্দ্রের উত্থান ও পতন। বেড়ানো হল না, খাওয়া হল না, দিনভর কারও সঙ্গে কথা বলা হল না। বাড়িতে থেকেও ঘরে ঢুকতে পারল না চন্দ্র সিং।

অবশেষে সন্ধ্যেবেলা শ্রান্ত দেহ বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সে সিঁড়ির ওপর এলিয়ে পড়ল। গভীর রাতে সেখান থেকে ব্যারী সাহেব উদ্ধার করলেন তাকে। ফিরিয়ে আনলেন নিজের এ্যাপার্টমেণ্টে। আর সেই দরজার সামনে এসেই ঠোঁট কামড়াল চন্দ্র। উত্থান-পতন কালে কম করেও চার-পাঁচ বার সে সেখানে এসেছে, কিন্তু নিঃসন্দেহ হতে পারে নি যে সেটাই তার স্বর্গদ্বার।

॥ ২২ ॥

অনেক কথা, অনেক কাহিনী, অনেক হাসি-কান্না জড়িয়ে আছে আমাদের বেস ক্যাম্পের জীবনে। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক।

পর্বতাভিযানে বেস ক্যাম্প হল বসতবাড়ি আর অন্যান্য ক্যাম্পগুলো হল অফিস কাছারী। ওপরে কেউ অসুস্থ হয়েছে, পাঠিয়ে দাও বেস ক্যাম্পে। রসদ কম পড়েছে, খবর দাও বেস ক্যাম্পে। বাড়ির জন্য মন কেমন করছে,

দাঁড়াও—বিকেলে ডাক আসুক বেস ক্যাম্প থেকে। আরও কত কি। যখন যা কিছু দরকার তখনই শুধু বেস ক্যাম্প, বেস ক্যাম্প আর বেস ক্যাম্প। কিন্তু না, আর বেস ক্যাম্প নয়।

অনেকক্ষণ হল সন্ধ্যা নেমেছে এখানে—এই এ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে। বেস ক্যাম্পের তুলনায় এখানে সন্ধ্যা হয় দেরীতে। জায়গাটা এগারোশ ফুট উঁচু বলে রুপিনধর সূর্যকে আড়াল করে রাখতে পারে না। আজ সকালে শেরপাদের নিয়ে ভানু নীলগিরির নতুন রাস্তা খুঁজতে বেরিয়েছে। ওরা আলো নিয়ে যায় নি। কেনই বা নিয়ে যাবে? বিকেলের আগেই যে ওদের ফিরে আসার কথা। অথচ এখনও আসছে না। চিন্তার কথা।

কিছুক্ষণ হল নিরাপদ চঞ্চল ও ছুতার আলো নিয়ে ওদের খুঁজতে বেরিয়েছে। পর্বতারোহণের নিয়ম অনুযায়ী সন্ধ্যার পরে এরকম বাইরে বেরুনো উচিত নয়।

আজ বেস ক্যাম্প থেকে এক তাড়া চিঠি এসেছে এখানে। আঠারো দিন পরে এই প্রথম আমরা ঘরের খবর পেলাম। আজ ১০ই অক্টোবর। চিঠি লিখেছেন ডেসমণ্ড অমিতাভ সুকুমার রঞ্জন মাণিক ও লক্ষ্মীদা। লক্ষ্মীদা আমাদের সাফল্য প্রার্থনা করে কালীঘাটে পুজো দিয়েছেন, সারাদিন উপোস করেছেন। জানি না সে উপবাস সার্থক হবে কিনা, তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ হবে কিনা।

বেস ক্যাম্প থেকে তিনটি ছোট ছোট তাঁবু এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। বেস ক্যাম্পের সব ছোট তাঁবুগুলো এইভাবে একে একে ওপরে নিয়ে আসা হবে। বেস ক্যাম্পে তখন থাকবে উপেনবাবুর তাঁবু ও আমাদের মেসটেণ্টটি। এখানেও কয়েক দিন বাদে কোন তাঁবু থাকবে না। নিয়ে যাওয়া হবে ওপরে। তখন এই গুহাটাই হবে আমাদের এ্যাডভান্স বেস ক্যাম্প।

কারা যেন কথা কইছে! ওরা কি তাহলে ফিরে এল? হাঁ, এতো আলো—টর্চের আলো। ওরা এসেছে। সবাই এসেছে। নিরাপদে এসেছে। আসবেই তো, নিরাপদ যে গিয়েছিল ওদের খুঁজে আনতে।

কিন্তু যে আশায় ভানু আজ শেরপাদের নিয়ে সারাদিন বরফ চষে বেড়িয়েছে, তা ব্যর্থ হয়েছে—ওরা পথ খুঁজে পায় নি।

সময় ও সামর্থ্যের কথা ভেবে আমরা ঠিক করেছিলাম, ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথের দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য পথে না গিয়ে, খুলিয়াঘাটা গিরিবর্ত্ম না পেরিয়ে, দুতিন মাইল উত্তরে এগিয়ে নীলগিরির দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে চেষ্টা করে দেখব যদি শিখরের কোন সংক্ষিপ্ত পথ পাওয়া যায়। স্মাইথের পথে এখান থেকে নীলগিরির দূরত্ব কম

করেও আট-নয় মাইল। নীলগিরি মানে শিখর নয়—দক্ষিণ পশ্চিম পাদদেশ মাত্র। সেখানেই আমাদের এক নম্বর শিবির স্থাপন করে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে অভিযান চালাতে হবে। তার মানে সমস্ত পাহাড়টাকে চক্কর মারতে হবে—অনেকটা মাথা ঘুরিয়ে নাক ছোঁয়ার মত। পথে ১৬,৫০০ ফুট উঁচু খুলিয়াঘাটা গিরিবর্ত্ম পেরুতে হবে। পেরুতে হবে অসংখ্য ফাটলে বোঝাই খুলিয়াগাভিয়া হিমবাহ। এক নম্বর শিবির থেকে শিখরের উচ্চতা হবে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট। দূরত্ব হবে প্রায় পাঁচ মাইল। পথে অন্ততঃ আরও দুটি শিবির করতে হবে। জায়গা পাওয়া যাবে কিনা কে জানে?

কিন্তু এতো পঁচিশ বছর আগের হিসেব। এই পঁচিশ বছরে কত পাথর গড়িয়েছে, কত ধস নেমেছে, কত পরিবর্তন হয়েছে ভূপ্রকৃতির। তাই আমরা আশা করেছিলাম, কোন সংক্ষিপ্ত পথ নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

সে আশা বিফল হল। ওরা পথ খুঁজে পায় নি তবে এই অন্বেষণকেও অনায়াসে একটি ছোটখাটো অভিযান বলা যেতে পারে। ভানু খুবই পরিশ্রান্ত। তাছাড়া একবার সে একটি তুষার-ফাটলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। দু পায়ের কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে। অমূল্য তাকে ওষুধ লাগিয়ে দিল। ডাক্তার সব ওষুধের গায়ে গুণাগুণ ও ব্যবহারের নিয়ম লিখে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ছুতার চা নিয়ে এল। সাধারণতঃ এ সময় আমরা রাতের খাওয়া সেরে ফেলি। আজ দেরী হয়ে গেছে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভানু বলে—মাইল দুয়েক যাবার পরই ওরা একটা কঠিন চড়াইয়ের সম্মুখীন হয়। দুখানি দড়িতে ওরা এগিয়ে চলে। বহু বড় বড় বরফাবৃত পাথর পেরিয়ে, ওরা আরও কঠিন একটা চড়াইয়ের সামনে উপস্থিত হয়। ক্রমেই চড়াই বেশ খাড়াই হয়। ফাটলের সংখ্যাও বাড়ে। ভানু নাকি এত কাছাকাছি এত বেশী ফাটল এর আগে দেখে নি।

প্রতি মুহূর্তে জীবন বিপন্ন করে, প্রতি পদক্ষেপে সংগ্রাম করে, ওরা বেলা প্রায় তিনেটর সময় একটা সঙ্কীর্ণ গিরিশিরায় আরোহণ করতে সমর্থ হয়। আশা করেছিল সেখান থেকে ওরা শিখরের পথ পাবে। কিন্তু বৃথা—সামনেই একটা বরফের প্রাচীর, চীনের প্রাচীরের চেয়েও মারাত্মক। জায়গাটাও ভয়ঙ্কর। ঠিক নীচেই একটা চওড়া ফাটল। তবুও কয়েকবার চেষ্টার পর আজীবা সেই দেওয়ালের ওপরে উঠে গেল। কিন্তু আর নয়। ওপর থেকে চিৎকার করে আজীবা জানাল আর পথ নেই—বিরাট এক খাদ। কম করেও আড়াই হাজার ফুট গভীর।

ওরা ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে প্রায় সাড়ে আঠারো হাজার ফুট উঁচু থেকে। নীলগিরির কাছে এই আমাদের প্রথম পরাজয়। কিন্তু প্রাথমিক পরাজয়ে বিচলিত হলে চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়লাভ করা যায় না। বিচলিত আমরা হই নি, কারণ জয় আমাদের হবেই।

আলোচনায় বাধা পড়ে। ছুতার এসে জানায় রান্না হয়ে গেছে।

খেতে বসে সবাই খুশী। একেবারে রাজসিক ব্যাপার—থ্রি কোর্স ডিনার। ডাল আলুসিদ্ধ আর মাংস। এখানে এসে আমরা যা পাচ্ছি তাই অমৃত বলে গলাধঃকরণ করছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কারও কোন অসুখ হয় নি। তবে ভাল খেতে পেলে, কার না ভাল লাগে—আনন্দ হয়। সমাজ সংসার সব ছেড়ে, এই মনুষ্যবর্জিত মৃত্যুশীতল প্রান্তরে, পাহাড় আর বরফের সঙ্গে ঘর পাতলেও—আমরা তো মানুষ।

॥ ২৩ ॥

'India watches your brave progress'—তার এসেছে। পাঠিয়েছেন আমাদের হিমালয়ান এ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। কলকাতা থেকে রওনা হবার সময় প্রবোধদার সঙ্গে দেখা হয় নি। তিনি তখন ইউরোপে। ফিরে এসেই তিনি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন।

তারখানি হাতে নিয়ে অমূল্য উঠে দাঁড়ায়। তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গম্ভীর কণ্ঠে সে বলে, "আর দেরী নয়। সারা ভারত আমাদের দিকে চেয়ে আছে। স্মাইথের পথেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আজই যেতে হবে।"

"নিশ্চয়ই।" ভানুও উঠে দাঁড়িয়েছে। উঠে দাঁড়িয়েছে শেরপা সর্দার আজীবা ও তার সহকর্মীরা। উঠে দাঁড়িয়েছে নিতাই আর নিরাপদ।

কিন্তু সাব্যস্ত হল নিতাই ও নিরাপদ আজ এ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পেই থাকবে। ভানু ও শেরপাদের নিয়ে অমূল্য এগিয়ে যাবে। সঙ্গে যাবে চারজন কুলী ও দুটি তাঁবু। আগামীকাল বাকি মালপত্র ও কুলিদের নিয়ে নিতাই নিরাপদ ও চঞ্চল রওনা হবে।

এখানের শীতই আমরা বরদাস্ত করতে পারছি না। তাঁবুর বাইরে বেরুলেই মনে হয় হাত পা ও নাক অবশ হয়ে গেল। মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে। উনোনের ধারে গিয়ে বসলে একটু ভাল লাগে। কিন্তু বসার কি জো আছে। কজনই বা বসতে পারে সেখানে। তার মধ্যে আবার দুটো লেডিজ সীট। শৈলেশদা ও ডাক্তার এলেই উঠে দাঁড়াতে হয়। অমূল্য ভানু নিতাই ও নিরাপদ কিন্তু বড় একটা আগুনের ধার ধারে না। তা হলেও যেখানে ওরা যাচ্ছে সেখানে নিশ্চয়ই ওদের শীতে কষ্ট হবে।

নিতান্ত প্রয়োজনীয় মাল বার করা হল। অধিকাংশই হালকা কাঠের ছোট ছোট বাক্স। বেস ক্যাম্পে দেবীদাস ও পিনাকী সব মাল খুলে ফেলে নতুন করে বাক্স বোঝাই করেছে। আরও অনেক কাজ করেছে ওরা। আইস পিটনগুলোতে লোহার আংটা লাগিয়েছে। শের সিং-য়ের সাহায্যে নন্দাবতীর ওপর একটা কাঠের পুল তৈরী করেছে। ওপারে প্রচুর জ্বালানী কাঠ ও অনেক দুর্মূল্য প্রজাতি পাওয়া গেছে। তাছাড়া টিপরাখড়কে বেড়াতে যাওয়াও সহজ হয়েছে। টিপরাখড়ক থেকে নীলগিরি শিখর দেখা যায়। তাই বলে অন্য সবাই বসে নেই। শৈলেশদাই কি কম করছেন? একটি নয়া পয়সাও তাঁর হিসেবের ফাঁকে গলে যেতে পারছে না।

ডাক্তারের কথা না বলাই ভাল। কেউ ভিটামিন ট্যাবলেট না খেলে তার 'মিল' বন্ধ। কাশি কিংবা হাঁচি হলে তো কথাই নেই।

নিতাই নিরাপদ ও চঞ্চল আজ কদিন ধরেই কুলিদের সঙ্গে খুলিয়াঘাটার ওপর মাল বেখে আসছে। পথে লাল নিশান পুঁতে এসেছে। ওরা এক নম্বর শিবিরের পথে রওনা হলে ট্রান্সপোর্ট অফিসার বীরেন সহকারী প্রাণেশকে নিয়ে এই মাল ট্রান্সপোর্টের ভার নেবে।

কুলিদের সঙ্গে আমাদের কনট্র্যাক্ট হয়েছিল যে তারা বিশ হাজার ফুট পর্যন্ত মাল বইবে। বরফের ওপর কাজ করতে হবে বলে আমরা ওদের গরম পোশাক দিয়েছি ও দৈনিক এক টাকা করে বাড়তি মজুরী দিচ্ছি। কিন্তু কয়েকজন কুলি প্রথম দিনই খুলিয়াঘাটার চেহারা দেখে বেঁকে বসেছিল—পর্বতারোহণের পুরো সাজ-সরঞ্জাম না পেলে তারা মাল বইবে না। এখানে আদালত নেই। কাজেই ব্রীচ অফ কনট্র্যাক্টের বিচার নেই। বাধ্য হয়ে, নিজেদের জীবন বিপন্ন করে গা থেকে সব পর্বতারোহণের পোশাক ওদের খুলে দিতে হয়েছে।

অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক আগে খেতে বসেছি আজ। ওরা চলে যাচ্ছে।

কবে আবার একসঙ্গে বসে খাব কে জানে।

খেয়ে উঠেই রওনা হল ওরা। শুরু হল অভিযানের চতুর্থ পর্যায়। সবার আগে চলেছে অমূল্য ও ভানু। ওরাই তো পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। ওরা চলে গেল। সঙ্গে যাচ্ছে পাঁচজন শেরপা ও চারজন কুলি। এগিয়ে যাচ্ছে ওরা—এগোচ্ছে পাথর টপকে শুকনো জুনিপারের দলকে পদদলিত করে।

জুনিপার অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে। ছিল কিছু লম্বা লম্বা ঘাস আর পাথরের গায়ে নক্‌সা কাটা নীল নীল ফুল। তারাও হারিয়ে গেল। পাথরের আড়ালে ছায়ায় ছায়ায় যেখানে তুষার-গলা জল ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরে পড়ে, সেখানে প্রকৃতির অনাদরে আপন আনন্দে বেড়ে উঠেছে রংবেরংয়ের শ্যাওলা। তারই মাঝে গলা বাড়িয়ে উঁকি মারছে দু একটি ছোট ছোট ফুল। বাইরের জগতে প্রকৃতি কি খেলা খেলছে, তারই খবর নিতে শ্যাওলা জগতের এই ক্ষুদ্র ব্যবস্থা।

একটি গিরিশিরায় উপস্থিত হল ওরা। এখান থেকেই হিমরেখা বা eternal snow-line। গিরিশিরাটি খুবই সঙ্কীর্ণ। মাত্র ফুট দুয়েক চওড়া। বাঁ দিকে পাহাড়টা ধাপে ধাপে নেমে গেছে। ডান দিকে ভয়ঙ্কর খাদ—প্রায় দেড হাজার ফুট। এখন আর খাদের দিকে তাকাতে ওদের ভয় করে না। পা ফস্কালে কতটা নীচে গডিয়ে পড়বে, তা ওরা মনে মনে হিসেব করে নিয়েছে। আছাড় খেয়ে খেয়ে আছাড়ের ভয় কেটে গেছে।

গিরিশিরার শেষে খাড়া একটি বরফের দেওয়াল। খুব উঁচু নয়। স্টেপও কাটা আছে। দেয়ালের পরে আরও খানিকটা চড়াই। সেই চডাই পেরিয়েই মনে হল—প্রেমপাগল পবনের টানে নীল আকাশের গা থেকে সাদা ওড়নাখানি খসে পড়েছে। এই সেই ১৬,৫০০ ফুট উঁচু খুলিয়াঘাটা গিরিবর্ত্ম। কত রকমের বরফ। কোথাও বেশ শক্ত, কোথাও চিনির মত দানাবাঁধা, কোথাও বা মিহি পাউডারের মত। মাঝে মাঝেই হাঁটু পর্যন্ত তলিয়ে যাচ্ছে। খুলিয়াঘাটা যেন বলতে চায়—'যেতে নাহি দিব।' কিন্তু ওরা এগিয়ে চলে।

উত্তর-দক্ষিণ দুদিকে পাহাড়—প্রায় সবটাই বরফে ঢাকা। এখানে সেখানে একটু আধটু কালো দেখা যাচ্ছে। কালো সাদায় উজ্জ্বলতা বাড়িয়েছে। পূর্বে ও পশ্চিমে দুটি উপত্যকা, ভুইন্দার ও খুলিয়াগার্ভিয়া। তবে খুলিয়াগার্ভিয়াকে উপত্যকা না বলে হিমবাহ বলাই ঠিক হবে। ভুইন্দারের শেষপ্রান্তে আমাদের

বেস ক্যাম্প, খুলিয়াগার্ভিয়ার শেষ প্রান্তে হবে আমাদের এক নম্বর ক্যাম্প।

খুলিয়াঘাটা মোটেই সমতল নয়। বেশ উঁচু-নিচু। নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয়। সব সময়েই প্রচণ্ডবেগে হাওয়া বইছে। বরফ উড়ছে। এখানে শীত ছাড়া আর কোন ঋতু নেই। তুষারঝড় ছাড়া আর কোন দুর্যোগ নেই। বরফ ছাড়া আর কোন বস্তু নেই।

কাল রাতের তুষারপাতে গত কয়েকদিনের পথরেখা নিশ্চিহ্ন। এখন লাল নিশানই পথের একমাত্র চিহ্ন। দেড়ঘণ্টা ক্রমাগত চড়াই ভেঙে সবচেয়ে উঁচু জায়গায় উঠে ওরা সবাই বরফের ওপর বসে পড়ল। আর না জিরুলে নয়। এক এক টুকরো ক্যাডবেরীর চকলেট মুখে পুরল।

মনে হল ওরা আকাশে বসে আছে। দূরে জোশীমঠের পাহাড়গুলো আব্‌ছা সবুজ দেখাচ্ছে। ঘোড়ী ও হাতি পর্বত উপুড় হয়ে ওদের দেখছে—যেন এখনই মাথায় ভেঙে পড়বে। এ্যাডভান্স বেস থেকে ঘোড়ী ও হাতি ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না—সপ্তশৃঙ্গ ওদের আড়াল করে রেখেছিল। এখান থেকে সপ্তশৃঙ্গকে বড় বেঁটে মনে হয়। বেঁটে মনে হয় ঐ উনিশ হাজার ফুট উঁচু পাথুরে পাহাড়টিকে। সে এতদিন নীলগিরিকে আড়াল করে রেখেছিল। এখান থেকে নীলগিরি শিখর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সে কী ? নীলগিরিতে বরফ নেই। আছে, তবে এদিকে নয়। নেই বলেই এত অপূর্ব। যেন ঘন বাদামী একখানি পাথরে গড়া গাড়োয়ালের এই নীলগিরি। নীল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সে ওদের ডাকছে কাছে।

চকলেট খাওয়া হলে যে যার ওয়াটার বট্‌ল্ থেকে খানিকটা রবিনসন্‌স লেমন বার্লি গলায় ঢেলে আকণ্ঠ তৃষ্ণার তীব্রতা কমিয়ে নিল। তার পর চারিদিকে তাকাল। পশ্চিমের পর্বতমালাটি রোদে জ্বলছে। দেখা যাচ্ছে মুকুট, মানা ও কামেট। দেখা যাচ্ছে নন্দাদেবী ও আরও অনেক নাম-না-জানা শৃঙ্গ। ওদের সবার শিরে সূর্য সোনা ঢেলে দিয়েছে। খুলিয়াঘাটায়ও সোনার ছড়াছড়ি—সে হাসছে। হাসছে অমূল্য ও ভানু—ভাগ্যবানের হাসি। খুলিয়াঘাটার এমন আলো ঝলমল রূপ দেখা ভাগ্যের কথা।

এতক্ষণ ছিল চড়াই, সামনে শুরু উৎরাই। দুয়ের মাঝে এই জায়গাটুকু মোটামুটি সমতল। তবে বরফাবৃত। গত কদিন ধরে ওরা এখানেই মাল ফেলে গেছে। বহু বাক্স ও কিটব্যাগ পড়ে আছে একখানি এ্যালক্যাথিনের শীটের ওপর। নষ্ট হয় নি—এ যে প্রাকৃতিক কোল্ড স্টোরেজ। চুরি হয় নি—

এখানে যে মানুষ নেই।

সমতল জায়গাটুকু উত্তর-পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে হঠাৎ খাড়া নীচে নেমে গেছে। খুলিয়াগার্ভিয়ায় মিশেছে। এ জায়গাটাকে কুলিরা বলে 'দাড়া'। ওরা গিরিবর্ত্মকে দাড়া বলে। কয়েকজন কুলি মাল রেখে এ্যাডভান্স বেসে ফিরে গেল। শুধু পান সিং অমর সিং ও চৈৎ সিং আজ ওপরে যাবে। বরফকে ওরা পরোয়া করে না। মোজা ও পট্টির তোয়াক্কা রাখে না। ভূজের ছাল পায়ে জড়িয়ে, এক হাঁটু বরফ ভেঙে, অক্লেশে ওরা চলাফেরা করে।

সহসা খুলিয়াঘাটার হাসি মিলিয়ে গেল। আশে পাশের সকল পাহাড়ের মাথা থেকে কে যেন সোনার মুকুটগুলো খুলে নিল। কোন এক অদৃশ্য আলাদিনের প্রদীপ ঘর্ষণে সেখানে জন্ম নিল শত সহস্র দৈত্য—কালো কুৎসিত মেঘ। তারা ছুটে এল খুলিয়াঘাটায়। আক্রমণ করল নীলগিরি অভিযাত্রীদের।

তুষার পড়ছে, বরফ উড়ছে। ঘনিয়েছে আঁধার। দু ফুট দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ওরা বসে রইল।

ঝড়ের তাণ্ডব একটু স্তিমিত হলে ওরা সেই খাড়া উৎরাই বেয়ে আধো অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে নামতে শুরু করল। প্রতি পদক্ষেপে পা ফস্কে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে প্রায় কোমর অবধি তলিয়ে যাচ্ছে। একে অন্যকে টেনে তুলছে।

উৎরাই পথটুকু সোজাসুজি মোটে দু তিন ফার্লং। কিন্তু ফাটলের জন্য সোজাসুজি নামার উপায় নেই। এঁকে বেঁকে পাঁচ ছ ফার্লং ঘুরে, তবে খুলিয়াগার্ভিয়ায় পৌঁছানো যায়। ফাটলগুলোর পাশ দিয়ে ওদের অতি সন্তর্পণে চলতে হচ্ছে।

আবহাওয়া ভাল ছিল বলে ওরা আজ উইণ্ডপ্রুফ পরে বেরোয় নি। শীতে সারা শরীর অবশ হয়ে যেতে চাইছে। তবু ওরা এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে লাল নিশান পুঁততে হচ্ছে। বলা তো যায় না কোথায় যেতে কোথায় যাবে। এগোলেই চলবে না। পেছুবার পথও ঠিক করে রাখতে হবে। যদি পথ ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী দল এই নিশান দেখেই এগিয়ে যাবে।

সব হারিয়েও মানুষকে ভাবতে হয় তার কিছুই হারায় নি। দুর্যোগের রাতেও তাকে সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতের প্রহর গুণতে হয়। আশাই বাঁচিয়ে রাখে মানুষকে। তাকে পরাজয়ের জগৎ থেকে বিজয় শিখরে পৌঁছে দেয়।

অমূল্য চির-আশাবাদী। কোন অবস্থাতেই সে প্রকৃতির কাছে পরাজয় বরণ করতে রাজী নয়। তাই ওরা প্রাণ হাতে করে দীর্ঘ চল্লিশ মিনিট ধরে সেই ভয়ঙ্কর উৎরাই ভেঙ্গে নীচে নেমে আসতে পেরেছে। যতই নীচে নেমেছে, ততই ঝড়ের বেগ কমেছে। কিন্তু তুষারপাত কমে নি। এইভাবে এগোতে এগোতে সহসা ডান দিকের প্রান্তরটি চোখে পড়েছে ওদের। অমূল্য বলে উঠেছে, "এসো, আজ এখানেই তাঁবু ফেলে, কড়াইশুঁটির সুপ আর রুটি খেয়ে, রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক।"

এই প্রান্তরটি খুলিয়াগাভিয়া হিমবাহের ওপরে, খুলিয়াঘাটা গিরিবর্ত্মের ঠিক নীচে। এক বর্গ মাইল জায়গা। প্রায় সমতল, অনেকটা মালভূমির মত। তবে মাঝে মাঝে বেশ বরফ আছে। আর আছে ধূসর পাথর। বাঁ দিকে হিমবাহ ধরে পথ চললে পৌঁছনো যাবে বদ্রীনাথের উত্তরে মানা গ্রামে। দিন দুয়েক লাগে। মানা গ্রাম দিয়ে এলে এখানেই বেস ক্যাম্প করা যেত। সময় ও শ্রম দুই-ই বাঁচত। খুলিয়াঘাটা পেরুতে হত না। কিন্তু নন্দন-কানন যে দেখা হত না। তাছাড়া জায়গা পেলেই ক্যাম্প করা যায়, কিন্তু সব জায়গায় কি বেস ক্যাম্প হয়? এখানে না আছে জ্বালানী, না আছে জল।

শেরপা ও কুলিরা তাঁবু খাটাবার আয়োজন করছে। একটু জিরিয়ে নেবার জন্য অমূল্য ও ভানু বরফের ওপরই বসে পড়ে। বসেই খেয়াল হয় হাঁটু অবধি অসাড় হয়ে গেছে। জুতোর ভেতরে নরম বরফ ঢুকেছে। ঘামে ভেজা মোজা জমে শক্ত হয়ে গেছে। জুতো পরিষ্কার করে ওরা নতুন মোজা পরে নিল।

ওদের মনে হল পাহাড়ে ঘেরা এই প্রান্তরটি একটি পর্যঙ্ক (Basin)—সৃষ্ট হয়েছে ভূমি গ্রাবরেখা (Ground moraine) দিয়ে, আর দুধারে রয়েছে পার্শ্ব গ্রাবরেখা (Lateral moraine)।

তাঁবু খাটানো শেষ হল। সন্ধ্যে হয় হয়। জনতা স্টোভ ধরিয়ে ছুতার তাদের তাঁবুতে রান্না চাপিয়ে দিল। দীপ্তি লণ্ঠন জ্বালিয়ে অমূল্য ও ভানু নিজেদের তাঁবুতে ম্যাপ নিয়ে বসল। তুষারপাত এখনও চলেছে। মনে হল

সারারাতই চলবে। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। কিন্তু এ রকম তুষারপাত মাথায় করে ঘুমোনো সম্ভব নয়। তাঁবু শুদ্ধ বরফের তলায় চাপা পড়বে। খুলিয়াঘাটায় ঝড়ের যে প্রচণ্ড তাণ্ডব চলেছে, তার তীব্র গর্জন এখানেও ভেসে আসছে। আশে পাশের পাহাড় থেকে ভেসে আসছে হিমানী সম্প্রপাতের শব্দ। সে সব শব্দ যতই ভয়াবহ হোক, শুনতে কিন্তু খারাপ লাগছে না ওদের। যেখানে যন্ত্রের আওয়াজ নেই, জনতার কোলাহল নেই, পশুর চিৎকার নেই—সেখানে বাতাসের তর্জন আর ঝড়ের গর্জনকেও বড় আপন বলে মনে হয়। ওরা সেই তর্জন-গর্জন শুনছে আর মন দিয়ে ম্যাপ দেখছে। ম্যাপের মধ্যে পথ খুঁজছে।

রুটি টিনের পিনাট (কড়াইশুটি) ও কফি নিয়ে ছুতার তাঁবুতে ঢোকে। ম্যাপ বন্ধ করে অমূল্য ও ভানু মহানন্দে খাওয়া শুরু করে। যেমন খিদে, তেমনি শীত। খিদে মিটল, শীতও কমল। ছুতার থালা ও মগ নিয়ে চলে গেল। অমূল্য বলে, "ভানু, এবারে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ো। আমি বসে আছি। দুজনের ঘুমোনো চলবে না। তাঁবুর বরফ ঝাড়তে হবে।"

"জাগতে হয় দুজনেই জাগব। জেগে জেগে ভাবব—

…………………হিমরেখা

নীলগিরিশ্রেণী-'পরে দূরে যায় দেখা

দৃষ্টিরোধ কারি, যেন নিশ্চল নিষেধ

উঠিয়াছে সারি-সারি স্বর্গ করি ভেদ

যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবনদ্বারে।"

অমূল্য গলা মেলায়, "………রাত্রি আসে,

ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে

অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত

শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো।"

এইভাবে রাত কেটেছে ওদের। কোন অবসাদ আসে নি দেহে ও মনে। আজ সকালে উঠেই অমূল্য বলেছে, "প্যাক্ আপ।" বাঁধাছাদা শেষ হলে বলেছে, "কুইক মার্চ।"

একটি তাঁবু কিন্তু গুটনো হল না। রান্নার সরঞ্জাম ও কিছু রসদ রেখে দেওয়া হল। ভাল জায়গা যখন পাওয়া গেছে তখন একটা অন্তবর্তী শিবির

করতে দোষ কি? বরং তাতে সুবিধেই হবে। নীচে যারা রয়েছে, তারা এ্যাডভান্স বেস থেকে মাল এখানে রেখে যাবে। এক নম্বর শিবিরে যারা থাকবে, তারা সেই মাল এখান থেকে নিয়ে যাবে। এ ব্যবস্থায় কোন শিবিরেই সভ্য সংখ্যার সহসা হ্রাস বৃদ্ধি হবে না। ফলে রসদের হিসেবও ঠিক থাকবে। সকালে এ্যাডভান্স বেস থেকে মাল নিয়ে রওনা হলে, মাল এখানে রেখে, খালি হাতে সন্ধ্যের আগেই ফিরে যাওয়া যায়। আবার সকালে খালি হাতে এক নম্বর থেকে এখানে এসে, মাল নিয়ে সন্ধ্যের আগেই সেখানে ফিরে যাওয়া যাবে। এ্যাডভান্স বেস থেকে এক নম্বরের দূরত্ব হবে আট ন মাইল। এই দীর্ঘ ও দুর্গম পথ একজন লোকের পক্ষে পিঠে মাল নিয়ে একদিনে অতিক্রম করা অত্যন্ত কষ্টকর। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো লেগেই আছে। কবে কে পথে আটকে পড়ে কে জানে। তখন এই তাঁবুটিই হবে তার পরম আশ্রয়।

সামনে চিরতুষারাবৃত পর্বতমালা। নাম-না-জানা শৃঙ্গগুলো কুড়ি থেকে তেইশ হাজার ফুট উঁচু। তবে শুধু উচ্চতা দিয়ে ওদের মাপা যায় না। টোপগের মত অভিজ্ঞ পর্বতারোহীও বলে—ঐ সব চুড়ায় কেবল চুহারাই উঠতে পারে।

পেছনে খুলিয়াঘাটা আর ডাইনে নীলগিরির পথ। পথ মানে 'জন-পথ' নয়। পাথর আর বরফে বোঝাই দুই পবর্তমালার মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ চড়াই উৎরাই। তারই ওপর দিয়ে চলেছে ওরা। টোপগে চলেছে সবার আগে। তার পরিচিত এ পথ। তার পেছনে দুই এ্যাডভান্স ট্রেনড—অমূল্য ও ছান্দু—উনিশ বছরের তরুণ শেরপা। তার পর ভানু আং টেম্বা, আং দাওয়া ও ছুতার। সবার শেষে প্রবীণ সর্দার আজীবা। নন্দাঘুন্টি বিজয়ী আজীবা। সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও সবচেয়ে সহনশীল বলেই সে রয়েছে সবার পিছনে।

মাইলের পর মাইল কেবল পাহাড়। কোনটি গোল, কোনটি ছুঁচলো, কোনটি বা আকারহীন মেঘের মত। এক নজরে বোঝা যায় না—কোন্‌টি মেঘ আর কোন্‌টি পাহাড়। কেউ নীল, কেউ লাল, কেউ বাদামী। কেউ সাদা আবার কেউ বা কৃষ্ণকালো। দিনান্তের রক্তপলাশী রোদ গড়িয়ে পড়বে ওদের পায়ে। ছড়িয়ে যাবে সারা গায়ে। তার পর মাথায় সস্নেহ পরশ বুলিয়ে বিদায় নেবে একটি রাতের জন্ম। পর্বতপুরীর রাজকন্যারা তখন ম্লান মুখে খুলে ফেলবে তাদের নানা রংয়ের উৎসব-সাজ, মুছে ফেলবে সকল প্রসাধন। শিথিল শরীর পড়বে এলিয়ে, হাঁটুতে মুখ গুঁজে, তারা নীরবে কান্নার ঝর্ণা বইয়ে দেবে। প্রভাতের প্রহর গুণবে—রক্তপলাশী রোদের প্রতীক্ষায়।

একটা বাঁক পেরিয়েই নীলগিরি সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হল ওদের। সামনে ডান দিকে। খুলিয়াঘাটার ওপর থেকে ওরা নীলগিরির বাদামী, পাথুরে কঠিন রূপ দেখে মোহিত হয়েছে। এখান থেকেও তার অমল ধবল কোমল তুষারময় রূপ দেখে ওরা বিমোহিত হল। নীলগিরি বিশাল, নীলগিরি সুন্দর। সবচেয়ে সুন্দর তার শিখর। পর্বতারোহীর স্বপ্ন-শিখর। মনে হয় নীল আকাশের নীচে একখানি সোনালী বর্শাফলক সূর্যের রক্তিম রশ্মিতে রাঙা হয়ে আছে।

কখনও হাঁটু অবধি বরফে ডুবে যাচ্ছে, কখনও আইস এক্স বরফে তলিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই ফাটল—ছোট বড় নানা আকারের, নানা ধরণের। কোন্‌টি সরলরেখা, কোন্‌টি বক্ররেখা—যেন কোন শিল্পী আপন খেয়ালে তুলি বুলিয়েছেন। অতি সাবধানে ওদের সেই ফাটল পেরোতে হচ্ছে। সবাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। পিপাসায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। পকেট থেকে লজেন্স নিয়ে মুখে পুরছে। শ্রান্তি কমছে, কিন্তু পিপাসা মিটছে না। সবাই জলের আশায় এদিক সেদিক চাইছে। জল থেকে হয় বরফ। বরফ থেকে জল। চারিদিকে বরফ, আকাশে সূর্য। কিন্তু কোথাও জল নেই—এক ফোঁটা জল।

হ্যাঁ আছে। ঐতো টোপগে যাচ্ছে ছুটে। সামনের ঐ ফাটলের মধ্যে নিশ্চয় একটু জল আছে। এই যথেষ্ট। এ টুকুই সবাই ভাগ করে খাবে। কিন্তু কেমন করে? আবার পিঠ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে মগ বার করতে হবে? না, কি দরকার? এই তো অমূল্য কেমন খাচ্ছে। উপুড় হয়ে শুয়ে ফাটলের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। পশুর মত জিভ দিয়ে চেটে চেটে জল খাচ্ছে। প্রয়োজনে মানুষকেও দেখছি পশু হতে হয়।

যেমন চড়াই, তেমন উৎরাই। ওরা তাই ওপরে উঠতে পারছে না। খুলিয়াগার্ভিয়া মোটামুটি পনেরো থেকে সাড়ে ষোল হাজার ফুট উঁচু।

আবার একটি ফাটল। প্রায় এক ফার্লং লম্বা। ফাটলের দু পাশই বিপজ্জনক। এবারে উপায়? আজীবা কিন্তু ফাটলের মধ্যেই নেমে গেল। ওরা তাকে অনুসরণ করে। এ যেন কাশীর গলি।

নির্বিঘ্নেই সে গলি পেরিয়েছে ওরা। তার পরেও এগিয়েছে অনেকটা—কম করেও মাইল দুয়েক। এখন বেলা দুটো। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা হেঁটে পৌঁছেছে খুলিয়াগার্ভিয়ার শেষ প্রান্তে—একটি ছোট্ট মালভূমিতে। একেবারে নীলগিরির পাদমূলে। আর পথ নেই। সামনেই একটা বরফের দেওয়াল। ভানু বলে,

"এই সেই আইস্ ফল বা হিমবাহ প্রপাত।"

অমূল্য বলে, "হল্ট।"

নীলগিরির দক্ষিণ-পশ্চিমে খুলিয়াগার্ভিয়া হিমবাহের শেষ প্রান্তে, এই মালভূমি সদৃশ ক্ষেত্রটিতে প্রতিষ্ঠিত হল আমাদের এক নম্বর শিবির এখানকার উচ্চতা ১৬,৩০০ ফুট। আজ ১২ই অক্টোবর। কলকাতা থেকে রওনা হবার বিশ দিন পরে প্রথম অভিযাত্রী দল নীলগিরির পাদমূলে পৌছল।

আমাদের এক নম্বর শিবিরের পূবে নীলগিরি, পশ্চিমে কয়েকটি অজানা শৃঙ্গ, উত্তরে সেই হিমবাহ প্রপাত। এই প্রপাত পেরিয়ে উত্তর-পূব দিক থেকে শিখরে আরোহণ করতে হবে। সোজাসুজি এখান থেকে শিখরের দূরত্ব মাইল খানেক। উচ্চতার পার্থক্য পাঁচ হাজার ফুটও নয়। কিন্তু সোজাসুজি শিখরে যাবার উপায় নেই। অসংখ্য অনতিক্রম্য বরফের দেওয়াল ও ফাটল।

এখানে বসে কল্পনাও করা যায় না—আমাদের এই বসুন্ধরা ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা। কল্পনাও করা যায় না—এই নীলগিরির নীচেই নন্দন-কানন, আর পাগল করা নদী নন্দাবতী। এখানে শুধু সীমাহীন পাহাড় ও অন্তহীন তুষার। নাইবা রইল ফুল, নাইবা রইল ফল, নাইবা রইল জল—এখানে যা রয়েছে তা যে আর কোথাও নেই। এখানে আছে নীলগিরি—নভোনীলে নীলগিরি।

তাই ওরা আজ এখানে এসেছে সব কিছু ছেড়ে, সব কিছু ভুলে। শুধু ভাবছে কেমন করে যাবে ঐ স্বপ্ন-শিখরে। ভাবুক অমূল্য, ভাবুক ভানু। আমরা ফিরে যাই বেস ক্যাম্পে, দেখি সেখানে ওদের দিন কাটে কিভাবে।

॥ ২৫ ॥

'I am speaking to you…about the grave situation…because of continuing and unabashed aggression by the Chinese forces.'

সেকী! চীন প্রকাশ্যভাবে ভারত আক্রমণ করেছে? নিশ্চয়ই করেছে। নইলে জাতির উদ্দেশ্যে বেতার বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী কেন বলছেন—

'We have done our utmost to prevent war from engulfing the world. But…a powerful and unscrupulous opponent…has …threatened ..the freedom of our people and the independence

of our country.'

তাঁর মত শান্তিকামী নেতাও ঘোষণা করছেন, 'we must gird up our loins and face this···I have no doubt···that we shall succeed. নিশ্চয়ই। জয় আমাদের হবেই। কিন্তু কেন এমন হল? প্রায় একমাস হল আমরা কলকাতা ছেড়েছি, কিন্তু সংযোগ তো হারাই নি। সপ্তাহে দু দিন করে আমাদের লোক জোশীমঠে যাচ্ছে। চিঠিপত্র ও খবরের কাগজ আনছে। কেউ তো জানায় নি এরকম পরিস্থিতির কথা। কাগজেও তো কিছু দেখি নি। তাছাড়া ট্র্যানজিস্টার রেডিও তো আছেই। তবে তিন-চারদিন হল সেটি বিগড়ে গিয়েছিল। বহু চেষ্টা করে একটু আগে দেবীদাস সেটিকে মেরামত করেছে। রেডিও খুলেই চমকে উঠেছি।

এখান থেকে তিব্বত সীমান্ত সোজাসুজি মাত্র মাইল দশেক। সোজাসুজি পথ নেই বটে, তবে মানা বা নীতি দিয়ে আক্রমণ করলে, আমরা ঘেরাও হয়ে পড়ব বুঝতে পারছি। তাই বলে কি আমরা অভিযান বন্ধ করে দেব?

না অর্ধপথে অভিযান বন্ধ করা মানে নৈতিক দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদী চীনের এই নির্লজ্জ আক্রমণের কাছে নতিস্বীকার করা। ঠিক হল যুদ্ধের সংবাদ ওপরে জানানো হবে না যাতে কথাটা কুলীদের কানে না যায়। ডট্‌পেনটা নিয়ে লিখলাম, "প্রিয় অমূল্য, জয়ী হয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আমরা তোমাদের পথ চেয়ে বসে আছি।—মহারাজ।"

কি আর হবে বসে থেকে। কাল কি করব তা কালই ঠিক করা যাবে। রাতের খাওয়া শেষ করেই যে যার স্লিপিংব্যাগে ঢুকে পড়লাম। বীরেন ও প্রাণেশ এখন এ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে। ওরা ক্যাম্প ওয়ান থেকে ফিরে এসেছে। এবারে উপেনবাবু ও শৈলেশদা ক্যাম্প ওয়ানে যাবেন। আমাদের কারও পর্বতারোহণের পোশাক নেই, সবই ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছি। তবুও শৈলেশদা যাবেন। শুনিয়ে দিয়েছেন, "এই জামাকাপড় ও হাণ্টার পরেই আমি রণেশের সঙ্গে গোমুখ থেকে বদ্রীনাথ গেছি। ১৯,৫১০ ফুট উঁচু কালিন্দী খাল পেরিয়েছি। এই হাণ্টার পরেই আমি নীলগিরি থেকে বেড়িয়ে আসব।"

বেস ক্যাম্পে আজ আমরা মোটে পাঁচজন। দেবীদাস ডাক্তার শৈলেশদা আমি ও উপেনবাবু। উপেনবাবু শেষ পর্যন্ত ৪২৫টি প্রজাতি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। শীত এসে গেছে। এ সময়ে এত প্রজাতি সংগ্রহ করা সত্যই বিস্ময়কর। এজন্য অবশ্য তাঁকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। ইতিমধ্যে

প্রজাতি খুঁজতে খুঁজতে তিনি একবার জোশীমঠ পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। তবে সার্থক এই পরিশ্রম। এমন কয়েকটি দুর্লভ গাছ তিনি পেয়েছেন, যা অন্য কোন সময়ে পাওয়া যেত না।

পিনাকী ও চঞ্চল কাল সকালে ক্যাম্প ওয়ানের দিকে রওনা হয়ে গেছে। শেরপা ছান্দু ও আং টেম্বা পরশুদিন এ্যাডভান্স বেসে এসেছিল। জানিয়ে গেছে ওরা ক্যাম্প টু-য়ের জায়গা পেয়েছে। রাস্তাও তৈরী করে ফেলেছে। কিন্তু স্থায়ীভাবে চলে যেতে পারছে না, কারণ খাবার নেই। পিনাকী তো রেগেই আগুন। তার হিসেবে গরমিল? খাবার নিয়ে নিজেই রওনা হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের এদিকে শোচনীয় অবস্থা। টিনের খাবার যা ছিল, তা সব আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সামান্য যা আটা-আলু, চা-চিনি, চাল-ডাল, নুন ও গুঁড়ো দুধ ছিল তার অধিকাংশই পিনাকী নিয়ে গেছে। তবে কাল সকালে লোক গেছে জোশীমঠ। কিন্তু সেও তো চারদিনের ধাক্কা। এদিকে শীতও বাড়ছে। আজ ভোরের উত্তাপ ছিল মাইনাস ২৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। নন্দাবতী থেকে জল নিয়ে ওপরে আসতে আসতেই বরফ হয়ে যায়। সরষের তেল পর্যন্ত জমে যাচ্ছে।

কিন্তু এসব কথা এখন ভেবে আর কি হবে? মরণপণ করেই তো এখানে এসেছি। আমি ভাবছি বিশ্বাসঘাতক প্রতিবেশীর কথা। বর্বর চীনের এই অতর্কিত আক্রমণের কথা। বিশাল আমাদের দেশ, বিশালতর তার সীমান্ত। সারা উত্তর সীমান্ত জুড়েই গিরিরাজ হিমালয়। এতকাল সে ছিল আমাদের সীমান্ত রক্ষী। শুধু সীমান্ত রক্ষী নয়, ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক। তিন হাজার বছর আগে লেখা ঋগ্বেদে প্রথম হিমালয়কে বলা হয়েছে গিরিরাজ। উপনিষদে উমাকে কল্পনা করা হয়েছে হিমালয়ের কন্যা। গঙ্গা হয়েছেন হিমালয়ের ভগিনী। শিব মূর্ত হয়েছেন হিমাচ্ছাদিত শৈলে। মেরুপর্বত হয়েছে বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু। শতাব্দীর পর শতাব্দী কত সত্যদ্রষ্টা ঋষি কত উপচারে সাজিয়েছেন হিমালয়কে। নিজেদের চিন্তা-ভাবনা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক তাঁরা খুজে পেয়েছেন হিমালয়ে।

অনন্তকাল ধরে হিমালয় আমাদের অনেক দিয়েছে। শিবালয় হিমালয়ে অসংখ্য দেবালয় আর অগণিত তীর্থ—যা না থাকলে ভারত শিবহীন হত, ধর্মহীন হত। হিমালয়ের হিমানী গলে সৃষ্টি হয়েছে নদী—যে নদী না থাকলে ভারত জলহীন হত। হিমালয়ে রয়েছে কুবেরের ভাণ্ডার, অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদ—এই সম্পদকে কাজে না লাগাতে পারলে ভারত সম্পদহীন থেকে যাবে।

হিমালয়ে বাস করে লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাদের জীবনে উন্নতি না আনতে পারলে, ভারতের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যর্থ।

সেই হিমালয়কে কুক্ষিগত করতে চাইছে চীন। অসুররূপী এই আক্রমণকারীর কবল থেকে হিমালয়কে রক্ষা করতে হলে, পার্বত্য যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে আমাদের। হিমালয়ের প্রতিটি গিরিবর্ত্মে, প্রতিটি গ্রাবরেখায়, প্রতিটি উপত্যকায় গড়ে তুলতে হবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। পর্বতারোহণ শিক্ষা আজ অপরিহার্য এদেশে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল—একটা খসখস আওয়াজে। আমাদের তাঁবুর চারদিকে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষ না জন্তু? মানুষ বলতে তো আমরা কটি প্রাণী আর কুলিদের কজন। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর কুলিরা এখন বিশ্রাম করছে। এই তুষারঝরা রাতে তারা তাঁবুর চারিপাশে ঘুরে বেড়াবে কেন? এখানে আসা অবধি কোন জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় নি। কিন্তু তাঁবুটা যে সত্যিই নড়ছে। খুব জোরে নড়ছে। নাঃ, আর শুয়ে থাকা সম্ভব নয়। স্লিপিং ব্যাগের চেন খুলে হাত বাড়িয়ে এভারয়েডী টর্চটা জ্বালি। উপেনবাবু জুতো পরছেন। বলি, "কোথায় যাচ্ছেন একা একা?"

কিন্তু কাকে বলা! তিনি ততক্ষণে টর্চ ও আইসএক্স নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর বাইরে। শৈলেশদা এবং দেবীদাসেরও ঘুম ভেঙ্গে গেছে। ওদের তাড়াতাড়ি আসতে বলে আমিও বাইরে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু কোথায়? কেউ নেই, কিছু নেই। তবে তাঁবু নাড়াল কে? অনেক খোঁজাখুঁজি হল। কিন্তু তার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না।

ফিরে এলাম তাঁবুতে। রাত এখন তিনটে। যুদ্ধের সংবাদ দিয়ে এই কাল-রাত্রি শুরু হয়েছে। রাত না ফুরোতেই কেউ আমাদের তাঁবু আক্রমণ করেছে। সে কে? স্মাইথ নাকি এখানে সেই Abominable Snowman-য়ের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তার কেউ নয় তো? হলে ভালই হয়। কারণ তুষারমানব বা ইয়েতি সত্যই আছে কি না, তা নিয়ে তো অনেক তোলপাড় হল।

এই তোলপাড় কবে থেকে শুরু হয়েছে তার সঠিক কোন হিসেব নেই। তেনজিং বলেছেন—তাঁর জন্মের আগেই তাঁর বাবা মাকালুর কাছে বরুণ হিমবাহে প্রথম ইয়েতি দর্শন করেন। ইয়েতিটা দেখতে ছিল অনেকটা স্ত্রী-বনমানুষের

মত। লম্বায় ফুট চারেক। গায়ে বড় বড় ছাইরংয়ের লোম—কোমরের ওপরে ঊর্ধ্বমুখী ও নীচে নিম্নমুখী। চোখ দুটি কোটরাগত। মাথাটি ওপর দিকে ছুঁচালো। তীক্ষ্ণ শিষ দিতে দিতে দুপায়ে ভর দিয়ে সে অনায়াসে একটা চড়াই বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

তেনজিংয়ের বাবা তার পর এক মাস শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি ১৯৩০ সালে আরও একবার ইয়েতি দর্শন করেছিলেন। তেনজিং সেবারে প্রথম এভারেস্ট অভিযানে এসেছেন। তাঁর বাবা রংবুক হয়ে এক নম্বর শিবিরে এলেন তেনজিং-য়ের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে একা সেখানে রাত কাটাতে হল। কারণ সবাই তখন দু নম্বর শিবিরে। পরদিন ভোরে তিনি অমনি একটা তীক্ষ্ণ শিষের শব্দ শুনতে পেয়ে, তাঁবুর পর্দা তুলে দেখতে পেলেন একটি ইয়েতি হিমবাহের দক্ষিণ দিক থেকে এসে উত্তরে মিলিয়ে গেল।

তেনজিং নিজেও ইয়েতির অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তিনি বলেন, 'এরা মানুষ নয়, জন্তু। এরা সাধারণতঃ রাতে চলাফেরা করে। পাহাড়ী গাছপালা ও জন্তু জানোয়ার খেয়ে বেঁচে থাকে।'

১৯৫২ সালের দুটি সুইস এভারেস্ট অভিযানেই ইয়েতি নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। থিয়াংবোচে মঠ পেরিয়ে খুম্বু হিমবাহের নাকের (snout) কাছে তারা সাড়ে এগারো ইঞ্চি লম্বা পৌনে পাঁচ ইঞ্চি চওড়া পায়ের ছাপ পান। ছাপগুলো ছিল একটি সরল রেখায়। দুটি ছাপের দূরত্ব ছিল বিশ ইঞ্চি। সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, ছাপগুলো হঠাৎ এক জায়গায় শুরু হয়ে হঠাৎ এক জায়গায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। দুজন সুইস বিজ্ঞানী অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ছাপের স্রষ্টিকর্তাদের খুঁজে বার করতে পারেন নি।

সে বছরই শরতকালে দ্বিতীয় এভারেস্ট অভিযাত্রীদলের কুলিরা একই জায়গায় ইয়েতি দেখতে পেয়েছিল। তাদের মতে—ইয়েতিটা চার থেকে পাঁচ ফুট লম্বা, গায়ে ঘন বাদামী রংয়ের লোম ও চওড়া চোয়াল। কুলিদের দেখেই সে প্রকাণ্ড হাঁ করে, জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু শেষে কি ভেবে, একটা তীক্ষ্ণ শিষ দিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।

১৯৫৪ সালে একটি ইঙ্গ-ভারতীয় ইয়েতি অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযাত্রীরা কয়েকটি পদচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারেন নি।

তবে পরের বছর নেপালের সোলো খুম্বুতে খুমজুংও পাংবোচে মঠে তেনজিং দুটি মাথার খুলি দেখেছিলেন। ওপরের দিকটা তেমনি ছুঁচলো ও তখন পর্যন্ত

লোমাবৃত ছিল। তবে দুটির লোম একরকম নয়। খুমজুং-য়েরটি ছিল কালো ও মোটা—ঠিক শুয়োরের মত। আর পাংবোচেরটা ছিল ছাই রং-য়ের—হয়তো বা অল্প বয়সের। মঠের লামারা এদের শুভ প্রতীক বলে মনে করেন, কিন্তু কোথায় পেয়েছেন বলতে পারেন নি।

শেরপারা বলে ইয়েতিদের আদিনিবাস হল সোলো খুম্বুতে। নামচে বাজার (১০,০০০ ফুট) ও থামে (১২,০০০ ফুট) পেরিয়েই ওদের এলাকা। আগে নাকি ওরা সংখ্যায় বেশ ভারী ছিল। তবে এখন খুবই কমে গেছে। কেমন করে কমে গেল, তা নিয়ে ওদের মধ্যে একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে।

সে অনেক দিন আগের কথা। কত কাল আগের তা কেউ জানে না। তার্গনা গ্রামে রোজ রাতে ইয়েতিরা এসে বাড়িঘর ও ক্ষেতখামার নষ্ট করত। তারপর আবার সেগুলোকে ঠিক করার চেষ্টা করত—তবে পারত না। অবশেষে গ্রামবাসীরা একটা ফন্দী বার করল। ওদের এলাকায় গিয়ে ছাং (মদ) ও খুকরী রেখে দিয়ে এল। ইয়েতিরা ছাং খেয়ে মাতাল হয়ে খুকরী নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে নির্বংশ হয়ে গেল।

শেরপাদের মতে ইয়েতিরা দুরকমের। মেত্রে ও চুত্রে। মেত্রেরা আকারে ছোট কিন্তু মানুষখেকো। আর চুত্রেরা বড় কিন্তু মানুষখেকো নয়।

বৈজ্ঞানিক স্যাণ্ডার্সন বলেছেন, 'I am firmly convinced that they range from extremely primitive humans, without true speech, tools or knowledge of fire-making and still in varying degrees hairy.' হারওয়ার্ডেন বলেছেন, 'a creature covered with thick black far with a considerable mane hanging from its head.' বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জুলিয়ান হাক্সলে বলেছেন—ইয়েতি ভালুক জাতীয় জন্তু। বিখ্যাত ভৌগোলিক কেনেথ মেসন বলেছেন—ইয়েতি একরকমের বনমানুষ বা ভালুক।

টিলম্যান, এরিক সিপ্টন ও হাওয়ার্ড বেরীও নাকি এদের সন্ধান পেয়েছিলেন। হিলারীও এদের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু কেউই প্রমাণ করতে পারেন নি। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তারা যা পারেন নি, নিখরচায় আমাদের ভাগ্যে যদি তা জুটে যায় তো মন্দ কি? কিন্তু শেরপারা যে বলে জীবন্ত ইয়েতি দেখলেই নাকি তার মরণ অনিবার্য।

॥ ২৬ ॥

কিসের শব্দ? নাঃ ধস নয়। ধসের আওয়াজ ক্ষণস্থায়ী। এ তো ক্রমেই বাড়ছে। আমাদের সবারই ঘুম ভেঙ্গে গেছে। বাইরে বেরিয়ে এলাম। আরে! উমাপ্রসাদ নগরের আকাশে এরোপ্লেন। আহা কতদিন ও শব্দ শুনি নি, কতদিন এরোপ্লেন দেখি নি, কতদিন যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখি নি। যন্ত্রহীন এ জগতে এই যন্ত্রদানবের আগমন কেন? মানুষকে যারা যন্ত্রে পরিণত করার যুদ্ধে মেতেছে, তাদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই তো? কোন চিহ্নই যে নেই এর গায়ে!

পুরো ভুইন্দার উপত্যকটিকে চক্কর মেরে চাকুলঠেলার ওপর দিয়ে এরোপ্লেনটা সোজা উত্তরে চলে গেল। কেন এল, কি দেখল আর কোথায় গেল?

চন্দ্র সিং চা নিয়ে এল। আমরাও তাঁবুতে ফিরে এলাম। কিন্তু চা বলতে যা বোঝায় চন্দ্র সিং-য়ের হাতে তা নয়। চন্দ্র সিং-য়ের হাতে নুন-চা। এই-ই অমৃত। নুনের অবস্থাও নাকি ভাল নয়। চন্দ্র সিং ওয়ার্নিং দিয়ে গেল। নুনের আর দোষ কি? এক মাসের অভিযানে যদি দেড় মাস লাগে।

হঠাৎ দেবীদাস চিৎকার করে ওঠে, "দেখুন দেখুন কি রকম বরফ পড়ছে।"

সত্যিই তো। এখানেই এই, ওপরে না জানি কি হচ্ছে। গত কয়েক দিন এখানে তুষারপাত হয় নি দেখে ভেবেছিলাম আব্‌হাওয়া বোধ হয় ভাল হয়ে গেল। কিন্তু এ কি কাণ্ড! দেবীদাস আবার বলে "শৈলেশদা এখন বাইরে গিয়ে বরফের মধ্যে গড়াগড়ি খেতে পারেন?"

"কেন পারব না? কি দেবে বল।"

"পাঁচ টাকা।"

"ঠিক?"

দেবীদাস মাথা নাড়ে। শৈলেশদা লাফিয়ে ওঠেন। লাফিয়ে ওঠে ডাক্তার। খুনে আসামীর মত গ্রেপ্তার করে শৈলেশদাকে বলে, "এ আমি কিছুতেই এলাউ করব না। এই সামান্য ব্যাপার থেকে ফ্রস্ট বাইট পর্যন্ত হতে পারে, জানেন?"

"রেখে দাও তোমার ফ্রস্ট বাইট। আজ দেবীর পাঁচ টাকা আমি খসাবই।"

এক ঝটকায় ডাক্তারের হাত ছাড়িয়ে তাঁবুর ফুটো দিয়ে গলে যান শৈলেশদা। আমরা বেরিয়ে দেখি ততক্ষণে তিনি গড়াগড়ি শুরু করে দিয়েছেন। দেবীদাসকে দেখে তাঁর উৎসাহ আরও বেড়ে গেল।

বাধ্য হয়ে দেবীদাস বলে, "ঠিক আছে। এবার উঠে আসুন।"

বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে দেবীদাসের সামনে এসে শৈলেশদা হাঁকেন, "রুপিয়া নিকালো।"

দেবীদাসের সঙ্গে আমরাও উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়লাম। শেষের দিকে শৈলেশদাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কাল রেডিও শোনার পর থেকে আমরা প্রাণ খুলে হাসি নি—হাসতে পারি নি। পাঁচ টাকার বিনিময়ে দেবীদাস আমাদের প্রাণের হাসি ফিরিয়ে আনল।

আজ যে আরও অনেক হাসি আমাদের ভাগ্যে ছিল, তা তখনও বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারি কিছুক্ষণ বাদে, যখন ধন বাহাদুর হঠাৎ এসে হাজির হয়। জানায়—তার পিতাঠাকুরের 'থার' (barking deer) ধরার কল তৈরী হয়ে গেছে। আমরা তার সঙ্গে ছুটে এলাম নন্দাবতীর পুলের কাছে। আমাদের দেখেই শের সিং তার পেটেন্ট স্যালুট্ ঠুকে সগর্বে বলে, "কাম ফিনিশ্ কর দিয়া। ম্যায় শের সিং সাব।"

একটি নয়, পাশাপাশি পাঁচটি ফাঁদ পেতেছে শের সিং। অনেকটা ইঁদুর মারা জাঁতাকলের কায়দায় তৈরী পাথরের ফাঁদ। একখানি সমতল সুবিশাল পাথরের ওপরে আলগা ভাবে আর একখানি পাথর দাঁড় করানো হয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকা পাথরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে এক টুকরো রুটি বাঁধা আছে। থার বা কাকর-মৃগ ঐ রুটির লোভে পুল পেরিয়ে এপারে আসবে। রুটিতে কামড় দিলেই দড়িতে টান পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে ওপরের পাথরখানি পড়বে তার গায়ে। বেচারী থারের ভবলীলা সাঙ্গ হবে। আর শের সিং ভবের-হাটে তার লোমশ চামড়াটি বেচে দ্বিতীয়াকে নাকের নথ গড়িয়ে দেবে।

শের সিং আবার বলে, "সবাই বলেছিল পাগলা সাব্‌দের চব্বিশখানা রুটি কোন কাজেই আসবে না। সেই রুটি দিয়েই আমি এই কল পেতেছি।"

"কল নয়, বল গ্যাঁড়াকল।" দেবীদাস মন্তব্য করে।

আমরা হেসে উঠি। শের সিং গম্ভীর হয়ে যায়। নাঃ দেবীদাসকে নিয়ে আর পারা গেল না। সে শের সিংয়ের এমন মুডটা নষ্ট করে দিল। ওর মুড ফিরে পাবার আশায় বলি, "তোমার কলে কোনদিন থার পড়েছে শের সিং?"

"পড়ে নি আবার? প্রথম পড়েছে সেই ১৯৩৪ সালে, যেবারে টিলমন্ ও সিপ্‌টন্ সাবের সঙ্গে নন্দাদেবীর রাস্তা খুঁজতে গিয়েছিলাম। রাস্তা পাই নি কিন্তু হনুমান পর্বতের কাছে থার পেয়েছিলাম।"

"সেই কি তোমার প্রথম পর্বতাভিযান শের সিং ?"

"জী সাব্।"

"তার আগে তুমি কি করতে ?"

"সে অনেক কথা।"

"বলো না একটু সে সব কথা।"

উৎসাহিত শের সিং বলে চলে—ছাপ্পান্ন বছর আগে পশ্চিম নেপালের বজং সামন্ত রাজ্যে ধরার গ্রামের এক ঠাকুর রাজপুত পরিবারে তার জন্ম হয়। সে তার বাবার তৃতীয়া স্ত্রীর সন্তান। শের সিং-য়ের বাবা সবশুদ্ধ সাতটি বিয়ে করেছিলেন। শেষের চারজন স্ত্রী তাদের শ্বশুরঘর দেখেন নি। তাঁরা তাঁদের বাপের বাড়িতেই পড়ে থাকতেন। শের সিংয়ের বাবা পালা করে তাঁর শ্বশুরবাড়ি ঘুরে বেড়াতেন। স্বভাবতঃই শের সিং শৈশবে পিতার স্নেহ পায় নি। মা তাকে মানুষ করেছেন। সেই মাও হঠাৎ মারা গেলেন। শের সিং-য়ের বয়স তখন মাত্র বারো। সৎমা ও বৌদিদের অত্যাচারে তাকে পথে নামতে হল।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলতে চলতে একদিন সে এসে আলমোড়ায় পৌছল। নতুন দেশ, নতুন ভাষা। তবু চোদ্দ বছরের শের সিং আশায় বুক বেঁধে জীবিকার অন্বেষণ করে। একটা কাজও পেয়ে যায়—কুলির কাজ। পিঠে মাল নিয়ে মহীশূরের মহারাজার সঙ্গে সে চলল কৈলাশ ও মানস-সরোবর পরিক্রমায়। বয়সের তুলনায় মালের ওজন বেশী। পথও অতীব দুর্গম। তবু কিশোর শের সিং পিছু হটল না। লিপুলেখ গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে সে অভিজ্ঞ ও জোয়ান কুলিদের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলল। সেবারে মহামারীর কবলে পড়ে বহু যাত্রী মারা গেছে। পথেব দুধারে তাদের মৃতদেহ দেখে শের সিং চমকে উঠল কিন্তু ভয় পেল না।

পরিক্রমা পূর্ণ করে সে ফিরে এল আলমোড়ায়। মহারাজা তার ওপর বেজায় খুশী। তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। বললেন—লেখাপড়া শেখাবেন, মানুষ করে দেবেন। কিন্তু নির্বোধ শের সিং। এমন প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করল।

কিছুদিন পরেই শের সিং একটা ভাল চাকরি পেয়ে গেল। একেবারে পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে। পঞ্চায়েত অফিসার শ্রী কৈলাশ চন্দ্রর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হত। গাছ লাগাতে হত।

সাত বছর এই বনমহোৎসব করে বেড়িয়েছে শের সিং। তারপর একদিন

নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই এই কাজে ইস্তফা দিয়েছে—দিতে বাধ্য হয়েছে। সে বারে শ্রী চন্দ্রর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে শের সিং এল জৌলজিবির বিখ্যাত মেলায়। বৃশ্চিক সংক্রান্তিতে গৌরী গঙ্গা ও কালী গঙ্গার সঙ্গমে ন দিন ধরে এই মেলা হয়। অবসর সময় রোজই শের সিং মেলা দেখে কাটায়। সেদিন মেলার তৃতীয় দিন। যথারীতি শের সিং মেলা দেখে বেড়াচ্ছে। দেখছে—থুলমা, চুটকি, পংখি। হঠাৎ সে চমকে ওঠে। এক জোড়া আঁখি। এ দুদিন মেয়েটি কোথায় ছিল লুকিয়ে? সে তো কতবার গেছে এই দোকানের সামনে দিয়ে। শের সিং আবার ভাল করে তাকাল। লছমীও তাকাল তার দিকে। চোখে চোখে কথা হল।

পরদিন। আবার দেখা হল দুজনে। অতি সাবধানে শের সিং লছমীর সব খবর নিল। ভাল খবর। লছমীরা চন্দ্র রাজপুত। পাল্টা ঘর। শের সিং সাহসে বুক বাঁধল। পরের দিন ভোর না হতেই সে ছুটল লছমীর তাঁবুর সামনে। অবাক হয়ে দেখল লছমীও তারই আশায় পথ চেয়ে বসে আছে। নিঃশব্দে তারা পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল। আম বনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এল মহাদেবের মন্দিরে। মহেশ্বরকে সাক্ষী রেখে তারা প্রথম কথা কইল। দুজনে দুজনকে বরণ করল। তারপর হাত ধরাধরি করে শুরু করল পথ চলা—জীবনের পথ।

পালিয়ে এল আলমোড়ায়। কিছুদিন সেখানে বাস করে, এল রাণীক্ষেতে। সেখানেই স্থায়ী হল তারা।

রাণীক্ষেতেই বিখ্যাত পর্বতারোহী এইচ. ডাবলু. টিলম্যানের সঙ্গে শের সং-য়ের পরিচয় হয়। সেই থেকে টিলম্যান আছেন অথচ শের সিং নেই, এমনটি আর হয় নি। শুধু টিলম্যানের সঙ্গেই নয়, গাড়োয়াল ও কুমায়ুনে ছোট-বড় বহু অভিযানে অংশ নিয়েছে শের সিং। মার্তোলি ও পিণ্ডারী হিমবাহ অভিযানে সে আমেরিকানদের সঙ্গে ছিল। একদল ইংরেজ হরিণশিকারীর সঙ্গে সে পূর্ব দ্রোণগিরি অঞ্চলে বহুদিন ঘুরে বেড়িয়েছে। একবার এক ইংরেজের সঙ্গে যখন লোকপালের ওপর দিয়ে হাতি পর্বতের দিকে যাচ্ছিল, তখন সে বায়নোকুলার দিয়ে একটা ইয়েতি দেখেছে। ইয়েতিটা বসে বসে শেকড়জাতীয় কি যেন খাচ্ছিল। ইয়েতি সম্বন্ধে একটা মজার গল্প বলে শের সিং। প্রায় বিশ বছর আগে নজন কুমায়ুনী শিকারী নটি ভুটিয়া কুকুর নিয়ে পশ্চিম নেপালে সুরমা পর্বতে যায়। সেখানে একা একটি ইয়েতি দেখতে পেয়ে তারা তাকে মেরে ফেলে। মারা যাবার আগে ইয়েতিটা ভীষণ চিৎকার করে। কিছুক্ষণের

মধ্যেই একদল ইয়েতি সেখানে ছুটে আসে। ভয় পেয়ে শিকারীরা তাদের কুকুরসহ পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। ইয়েতিরা তাদের নিহত স্বজাতির মৃতদেহ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছে দেখে বাধা দিয়ে বলি, "ইয়েতির কথা থাক শের সিং। তোমার নিজের কথা বল।"

"সে কথার কি শেষ আছে সাব। সারাটা জীবন তো ঘুরে ঘুরেই কাটিয়ে দিলাম। এই ভবঘুরে জীবনে কত লোকের সঙ্গে মোলাকাত হল। কত সাব-মেম রাজা-রাণী। আচ্ছা, তাদের কথাই বলি। দ্বারভাঙার মহারাজা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তাঁর নতুন রাণীকে নিয়ে এলেন কেদার-বদ্রী দর্শনে। সঙ্গে রাজসিক লটবহর। টিলমন্ সাব্ ১৯৩৬ সালে তাঁর নন্দাদেবী অভিযানেও এত জিনিস নিয়ে যান নি। মহারাজার সঙ্গে তিনশ কুলি, সত্তরটা খচ্চর। তীর্থে এসেও তাঁরা সোনা বা রূপার বাসন ছাড়া ভোজন করেন নি। আর কেউ যাতে এই সোনা রূপা নিয়ে সটকে না পড়ে তা দেখাই ছিল আমার কাজ।

"আরেকবার ভবনগরের যুবরাজের সঙ্গে গিয়েছিলাম কেদার-বদ্রী। তাঁর যদিও লটবহর ছিল অনেক কম—মাত্র ছত্রিশ জন কুলি, আঠারোটি ডাণ্ডি ও আঠারোটি খচ্চর, কিন্তু আমি মজুরী পেয়েছিলাম অনেক বেশী। চব্বিশ দিনে আড়াই হাজার টাকা—আমার জীবনের সবচেয়ে বড় রোজগার। এর মধ্যে পাঁচশ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলাম ছোট্ট এক টুকরো হীরা খুঁজে দিয়ে। রামওয়াড়ার কাছে যুবরাজের আংটি থেকে খসে পড়েছিল। যুবরাজ শেঠজীর মত নাস্তিক ছিলেন না। কিছু না বলতেই তিনি কালীমঠে মহাপূজার হুকুম দিলেন—আঠারোটি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়। তিনি পিপলকোঠিতে যে দেওয়ালী করে গেছেন, তা যারা দেখেছে তারা ভাগ্যবান। অমন দেওয়ালী এ এলাকায় আর হয় নি।"

শেঠজী (শৈলেশদা) কিন্তু নির্বিকার। তিনি মুচকী হেসে বলেন, "যুবরাজের কথা নয় শের সিং, লছমীর কথা বল।"

ইচ্ছে করেই শের সিং লছমীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। সংসারে সুখের চেয়ে দুঃখ বেশী। দুঃখের কথা বলে আরও বেশী দুঃখ পেয়ে লাভ কি? কিন্তু শৈলেশদার তাগিদে শের সিংকে শেষ পর্যন্ত সে কথা বলতে হল—লছমীকে নিয়ে বারো বছর ঘর করেছে সে। সুখের ঘর। শের সিং-য়ের জীবনে যা কিছু উন্নতি, তা হয়েছে এই বারো বছরে। বকরিওয়ালা থেকে মেট।

তাই বলে লছমী তাকে বকরিগুলো বিক্রি করে ফেলতে দেয় নি। শের সিং যখন সাব্‌দের বা রাজা-রাণীদের সঙ্গে, লছমী তখন বকরি সামলাত। প্রতিবার ঘুরে এসে শের সিং লছমীকে সোনা ও রূপার গহনা গড়িয়ে দিত। শেষ পর্যন্ত শুধু সোনার গহনাই সাড়ে বাইশ ভরি হয়েছিল লছমীর। তাহলেও একটি দুঃখ ছিল ওদের। বহু মানত করেও কোন সন্তান হয় নি।

পিতা হবার আশা শের সিং যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছে, এই সময় একদিন লছমী তাকে সুসংবাদটা দিল। তার ছেলে হবে। আনন্দে প্রায় পাগল হল শের সিং। উত্তেজনায় ও আবেশে সে আকুল হল কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। কয়েকদিন বসে কেবল ভাবল। সেবারে আর সে পাহাড়ে গেল না। যাদের সঙ্গে যাবার কথা ছিল, তাদের অন্য লোক ঠিক করে দিল। আর এই না যাওয়াটাই তার কাল হল। বাড়ি না থাকলে তো আর সামান্য গরম জল নিয়ে সেই দশেরার সকালে লছমীর সঙ্গে ঝগড়া হত না, সেও তাকে চড় মারত না আর এমন ভাবে জীবনের বোঝাপড়াটা শেষ হয়ে যেত না।

ন মাসের অন্তঃসত্ত্বা লছমী যে সত্যি চলে যাবে, তা শের সিং কল্পনাও করতে পারে নি। তাই সে নিশ্চিন্তে বকরি চরাতে চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে লছমী নেই। গহনাগাঁটি ও টাকা পয়সা কিছুই নেই। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শুনল—লছমী চলে গেছে আসকোটে। তার বাপের বাড়িতে।

শের সিংও আর ফিরিয়ে আনে নি তাকে। লছমীর ভাইরা ছুটে এসেছে। সে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। লছমী চিঠি লিখেছে। শের সিং নিরুত্তর রয়েছে। যে ঘরনী একবার ঘর ছেড়ে যায়, তাকে আর ঘরে নিতে নেই।

"ধন বাহাদুর কি তোমার সেই ছেলে?" জিজ্ঞেস করি শের সিংকে।

"না সাব্। সে ছেলেকে আমি কোনদিন দেখি নি। শুনেছি সে এখন কলেজে পড়ে।" শের সিং সহসা চুপ করে নন্দাবতীর দিকে তাকিয়ে থাকে। আমরা তাকিয়ে থাকি তার করুণ চোখ দুটির দিকে। একটু বাদে সে আবার নিজেই বলতে থাকে, "ধন আমার এ পক্ষের ছেলে। আমি আবার বিয়ে করেছি। সেও আজ বাইশ বছর হয়ে গেল।"

লছমী চলে যাবার পর কেমন যেন সব ফাঁকা ফাঁকা মনে হতে থাকল তার। সেই সঙ্গে একটা রুদ্ধ আক্রোশে অস্থির হয়ে উঠল সে। চলল দেশে। সেই দেশ, যার সঙ্গে বিশ বছর কোন যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু নিজের বাড়িতেও জায়গা হল না তার। এতদিন বাদে উড়ে এসে জুড়ে বসাটা তার সৎ ভাইরা মোটেই

সুনজরে দেখল না। তাই সে চলে গেল পাশের গাঁয়ে—তার পিসীর বাড়ি। আর সেখানেই একদিন নদীতে স্নান করতে গিয়ে দেখা হল চম্পার সঙ্গে। এই মিষ্টি মেয়েটিকে শের সিং তার আগেও দেখেছে। কিন্তু তখন তো এমন ভাল লাগে নি। তাই সিক্ত বসনা সেই সুন্দরী ষোড়শীর সঙ্গে শের সিং সেদিন সেধে আলাপ করল। আর আলাপের পরেই প্রলাপ। কিন্তু বেঁকে দাঁড়াল চম্পা। একদিন তার মুখের ওপর শুনিয়ে দিল যে ছত্রিশ বছরের বুড়োর গলায় মালা দেবে না সে। তার পৌরুষে আঘাত লাগল। শের সিং রাজপুত।

কিন্তু বীরভোগ্যা বসুন্ধরার কাল গত হয়েছে। এ যুগে বুদ্ধি যন্ত্র, বলং তন্ত্র। শের সিং কৌশলের আশ্রয় নিল। চম্পার বৌদিকে হাত করল। কিন্তু দাদা বসল বেঁকে। সে কাজ করত নেপাল রাজ সরকারে। বহু অভিযান-অভিজ্ঞ শের সিং ঘাবড়াল না। সে আরেকটি অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করল। নিজের গাঁয়ে জমি কিনল, বাড়ি করল। তারপর এক আঁধারে ছাওয়া আষাঢ়ে রাতে বৌদিব সাহায্যে চম্পাকে নিয়ে এল সেই বাড়িতে। প্রতিষ্ঠা করল গৃহকর্ত্রীরূপে।

বড় অভিযানে বাধা আসবেই। চম্পার দাদা হাবিলদারকে বলে হুলিয়া বার করল শের সিং-য়ের নামে—ন বছরের জেল। পুলিশ এল। গুড় ও মধু দিয়ে শের সিং সেবা করল তাদের। তারা ফিরে গেল।

চম্পার দাদা এত সহজে হাল ছাড়ল না। আবার নতুন একদল পুলিশ এল। শের সিং ততদিনে প্রায় নিঃস্ব। বাড়ি করতে বহু টাকা বেরিয়ে গেছে। তার ওপর চম্পার নিত্য নতুন বায়না। বাধ্য হয়ে ধরা দিল শের সিং। হাজির হল সুবেদারের সামনে। চম্পার দাদাও ছিল সেখানে। শের সিং তার প্রতি কোন কটাক্ষ না করে এগিয়ে গেল সুবেদারের সামনে। নির্ভীক ভাবে নিঃসঙ্কোচে তাকে সব কথা খুলে বলল। সুবেদার তার সত্যবাদীতায় মুগ্ধ হলেন। ডাকালেন চম্পাকে। চম্পাও দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল—শের সিংই তার স্বামী।

সুবেদার হুলিয়া তুলে নিলেন। চম্পার দাদাকে হুকুম দিলেন তাদের বিয়ে দিয়ে দিতে। বললেন—তিনি নিজে উপস্থিত থাকবেন এই বিয়েতে। খুব ধুমধাম করে বিয়ে হল ওদের। এমন বিয়ে আর হয় নি সে গাঁয়ে।

বাইশ বছর বেশ সুখেই সংসার করছে শের সিং। কিন্তু লছমীর কথা মনে পড়লে তার মনটা এখনও যেন কেমন হয়ে যায়। বার বার কেবলই মনে হয়,

"গুস্‌সেমে এক থাপ্পড় লাগায়া। ওহি সির্ফ দেখি। বারাহ্ সালকা পেয়ার নেহী দেখি।"

॥ ২৭ ॥

মুনহীন খিচুড়ীর ওপরে ভিটামিন সি ট্যাবলেটের গুঁড়ো ছড়িয়ে আমরা তাই গলাধঃকরণে ব্যস্ত। চামচের ঠুং ঠাং শব্দ হচ্ছে কিন্তু খিচুড়ী নিঃশেষ হচ্ছে না। অথচ 'আর খাব না' এ কথাও কেউ বলতে পারছি না। পেট ভরা খিদে, মহামূল্যবান এই খিচুড়ী। এমন সময় জোশীমঠ থেকে মেহেরবান সিং এল। আমরা সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। সে চিনি এনেছে, গুঁড়ো দুধ এনেছে, তেল এনেছে, নুন এনেছে। তার চেয়েও বড় কথা, সে ডাক এনেছে। এনেছে খবরের কাগজ, চিঠি ও তার। খবরের কাগজে আমাদের খবর ও ছবি বেরিয়েছে। সবার নামেই চিঠি এসেছে আজ। সব চিঠির এক সুর—'তোমাদের জন্য দুশ্চিন্তায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি। শীঘ্র ফিরিয়া আইস।'

কিন্তু কোন চিঠিতেই যুদ্ধের খবর নেই। যুদ্ধের কথা আছে মিঃ ডয়েগের তারে—'Border situation grave stop welcome home Desmond.'

মেহেরবান সিং-য়ের মেহেরবানিতে লড়াইয়ের খবরটা কুলিদের মধ্যে রাস্ট্র হয়ে গেল। শের সিং তার দলবল নিয়ে চড়াও হল। নাঃ ভয় পায় নি তারা। ওরা পাহাড়ী মানুষ। লড়াইকে পরোয়া করে না। তবে মেহেরবান সিং-য়ের কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না ওদের। চীন কি সত্যই ভারত আক্রমণ করেছে?

সব শুনে শের সিং গর্জে ওঠে, "বেইমান।" তার রাজপুত রক্ত বোধহয় টগবগ করে ফুটছে, "আমার বয়স হয়েছে সাব। আমাকে আর নেবে না। কিন্তু জোশীমঠে ফিরে গিয়েই আমি ধনবাহাদুরকে ভর্তি করে দেবে পল্টনে। বেইমানীর বদলা নেবে সে।"

কেউ কিছু বলার আগেই চৈৎ সিং তাঁবুতে ঢোকে। সে এসেছে ওপর থেকে—ওপরওয়ালাদের চিঠি নিয়ে। নীচের চিঠির চেয়ে ওপরের চিঠির দাম এখন অনেক বেশী। তিনখানি চিঠি এনেছে সে। প্রথমখানি লিখেছে বীরেন—

মহারাজ / শৈলেশদা / পিনাকীদা, এ্যাডভান্স বেস ক্যাম্প

২০. ১০. ৬২.

আমি প্রাণেশ ও জাজিম সিং এখানে রয়েছি। আজ সকাল থেকে আমরা বেকার। কাল শেষ মাল ফেলে এসেছি খুলিয়াঘাটায়।

আকাশ পরিষ্কার। কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই। ঘোড়ীপর্বতকে এখন ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

কাল রাতে আমাদের ঘুম হয় নি। প্রথমতঃ ঠাণ্ডা, দ্বিতীয়তঃ খিদে। দুদিন ধরে পচা আলু-সেদ্ধ খেয়ে আছি।

নীচের জিনিসগুলো এখানে আছে—

আটা (যৎকিঞ্চিৎ), পচা আলু (যথেষ্ট), চা (দুধ চিনি নেই), সিগারেট (খাই না), ওষুধ (সবাই সুস্থ)।

নীচের জিনিসগুলো এখানে নেই—

চাল, ডাল, নুন, তেল, গুঁড়ো দুধ, মধু, চিনি ও চিঠি।

বীরেন

দ্বিতীয়খানি লিখেছে চঞ্চল—

শৈলেশদা, এক নম্বর শিবির

১৯. ১০. ৬২

আজ সাত দিন হল বরফের ওপরে রয়েছি। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সাদা ছাড়া যে আর কোন রং আছে তা মনে হয় না। হাঁটু এবং সময় সময় বুক-বরফে চলাফেরা করতে হচ্ছে।

সাড়ে আঠারো হাজার ফুট উঁচুতে আমাদের দু নম্বর শিবির স্থাপিত হয়েছে। কুলি কম বলে মাল পাঠাবার জন্য অনেক সময় ও শ্রমের অপচয় হচ্ছে। আমি দু দিন ধরে দু নম্বরে মাল রেখে আসছি। মাল বয়ে বয়ে শেরপারাও ক্লান্ত।

জলের কথা ভুলে যেতে বসেছি। এক গেলাস জল গলাতে এক ঘণ্টা স্টোভ জ্বালাতে হয়। কেরোসিন ফুরিয়ে আসছে। আলু জমে পচে গেছে। রাতে তাপমাত্রা মাইনাস ২৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সারারাত তাঁবুর ওপর থেকে বরফ ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলতে হয়। পর্বতাভিযানে যত রকম বাধা মানুষ কল্পনা করতে পারে, তা প্রায় সবই পেলাম।

তিন নম্বর শিবির করতে না পারলে নীলগিরি-জয় সম্ভব নয়। এখন পর্যন্ত তিন নম্বরের জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে পাঁচ ছ দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে।

প্রার্থনা করুণ যেন সফল হই। বাংলার মুখ রাখতে পারি।

চঞ্চল

তৃতীয়খানি লিখেছে অমূল্য—

মহারাজ, দু নম্বর শিবির

১৮. ১০. ৬২

মন মেজাজ ও শরীর সবার ভাল আছে। মা কালীর কৃপায় আবহাওয়াও ভাল হচ্ছে। জয় সুনিশ্চিত।

কুলি কম। কাজেই বেস ক্যাম্পের যে সব মাল এখন আর কোন কাজে আসছে না, বিশেষ করে উপেনদার জিনিসপত্র, কয়েকজন কুলি দিয়ে জোশীমঠে পাঠিয়ে দিন। সে সব কুলিরা বেস ক্যাম্পে ফিরে আসার আগেই আমরা জয়ী হয়ে ফিরে আসব।

সব ঠিক আছে তো?

অমূল্য

এত প্রতিকূলতার মধ্যেও ওরা মনোবল হারিয়ে ফেলে নি। জয়লাভের আগেই ভাবছে জয়লাভের পরে কেমন করে নির্বিঘ্নে ফিরে যাবে। এই না হলে নেতা!

কিন্তু কে কুলিদের সঙ্গে জোশীমঠ যাবে? যে যাবে সে তো আর ফিরে আসতে পারবে না। তাকে মাল আগলে পড়ে থাকতে হবে জোশীমঠে। এত কষ্ট করে যে পরম-মুহূর্তের প্রতীক্ষায় আমরা এতদিন এখানে বসে আছি, সেই শুভক্ষণে তাকে নির্বান্ধব অবস্থায় থাকতে হবে বহুদূরে। এ কি সম্ভব? কে নিজেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করবে জীবনের এই অনির্বচনীয় আনন্দ থেকে। কত আশা। জয় হলে আমরা সবাই একসঙ্গে বদ্রীনাথ যাব। ভাগ্য যদি বিরূপ হয়, তাহলেও তো সেই মিলন-লগ্ন মহামূল্যবান। পরাজয়ের বেদনা সমান ভাগে ভাগ করে নিয়ে সবাই একসঙ্গে ঘরে ফিরে যাব। কত কল্পনা করেছি এতদিন ধরে।

ডাক্তার ও শৈলেশদার যাবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। পিনাকী চলে গেলে এদিক অচল হবে। বাকি রইলাম আমি ও দেবীদাস।

দেবীদাসের দিকে তাকাই। সেও আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখে চোখ পড়তেই বলে ওঠে, "আপনি নয় মহারাজ, আমিই যাব জোশীমঠ।"

চট করে কোন জবাব দিতে পারি না। দেবীদাস বেস ক্যাম্পে আসার পর থেকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। খেতে যে এত ভালবাসে, সে নিজে না খেয়ে, নিজ হাতে সব ভাল ভাল খাবার প্যাক্ করে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওর যে বড়ই আশা, কাগজ কেটে 'Successful' শব্দটা 'Nilgiri (Garhwal) Expedition 1962' ফেস্টুনটায় লাগিয়ে, সেই ফেস্টুন হাতে বদ্রীনাথ যাবে, জোশীমঠ ফিরবে। না, না। ওর এত সাধের আশায় আমি বাদ সাধব না। বলি, "তা হয় না। আপনি থাকুন। আমিই কুলিদের নিয়ে জোশীমঠ যাচ্ছি।"

"আপনি তো জানেন মহারাজ, আমি একবার যখন সঙ্কল্প করেছি, তখন আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করাতে পারবেন না। তার চেয়ে আসুন আমরা মাল ঠিক করে ফেলি। কুলিদের বলে দিন, আমি কাল সকালেই রওনা হব।"

॥ ২৮ ॥

যা দেখতে পাই না তা যেমন নেই বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তেমনি যাকে আসতে দেখি নি সে যে আসে নি, এ কথাই বা বলি কেমন করে? কে এসেছিল জানি না, কিন্তু কখন এসেছিল তা বলতে পারি। প্রথম দিন রাত পৌনে তিনটায়, পরদিন দেড়টায়, শেষদিন সোয়া বারোটায়। তৃতীয় দিনে ট্র্যানজিস্টার খুলে আমরা দিল্লীর রেডিও সঙ্গীত সম্মেলন শুনছিলাম। গান তখন খুব জমে উঠেছে। উপেনবাবু তালে তালে স্লিপিং ব্যাগ নাড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁবুটা নড়ে উঠল —নড়তে থাকল। অন্য দিনের চেয়ে জোরে—বেশ জোরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সেদিন বেরিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তার সাক্ষাৎ পাই নি। অনেক ভেবেছি, কিছুতেই বুঝতে পারি নি কেন সে এসেছিল। সেই মাইনাস পঁচিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড শীতে কেউ রসিকতা করার জন্যে তাঁবু নাড়িয়েছে, তাই বা বিশ্বাস করি কেমন করে? আবার তুষার মানব যদি এসেই থাকে, সে অদৃশ্য

হল কোন্ পথে? তার তো পাখা নেই। তাঁবুর আশে-পাশে কোথাও কোন পদচিহ্ন পাই নি। তবে পদচিহ্ন পাওয়া গেছে অনেক দূরে—এই ক্যাম্প ওয়ানের পথে। যেন ছোট একটি ছেলে খালি পায়ে বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে গেছে। বিরাট একখানি পাথরের ধারে গিয়ে পদচিহ্ন শেষ হয়েছে। সেই পদচিহ্ন কার? এ রহস্যের সমাধান করতে পারি নি। পারে নি অমূল্য।

অমূল্যকে খবরটা দিয়েছেন শৈলেশদা। উপেনবাবুর সঙ্গে শৈলেশদা এখানে এসেছিলেন। শুনে অমূল্য হেসেছে। ভাবটা যেন কিছুই নয়। কিন্তু মনে মনে চিন্তিত না হয়ে পারে নি। চিন্তা নিজের জন্য নয়, নিজেদের জন্যও নয়। চিন্তা বেস ক্যাম্পের সহযাত্রীদের জন্য। তাদের ত্যাগ ও শ্রমের ফলেই আজ অমূল্য এখানে—এই এক নম্বর শিবিরে। ভানু গতকাল নিতাই টৌপগে আং দাওয়া ও ছুতারকে নিয়ে দু নম্বর শিবিরে চলে গেছে। একটু বাদে নিরাপদ আজীবা আং টেম্বা ও ছান্দুকে নিয়ে বাকি মালপত্রসহ অমূল্য সেখানে রওনা হচ্ছে। চঞ্চল আপাততঃ এখানেই থাকবে।

যুদ্ধের কথাও শৈলেশদা তাকে বলেছেন। কিন্তু অমূল্য তাতে একটুও বিচলিত হয় নি। চৌ এন লাই নয় ইয়েতি-ই অমূল্যকে ভাবনায় ফেলেছে।

"চলো এবারে বাইরে যাওয়া যাক।" নিরাপদর কথায় অমূল্যর চমক ভাঙে।

বলে, "বেশ চলো

ওরা বেরিয়ে আসে বাইরে। বেলা নটা। নীলগিরির ওপার থেকে যে সোনালী আভা কিছুক্ষণ ধরে উঁকি মারছিল তা এতক্ষণে হাজির হয়েছে এখানে। এ জায়গাটা নিরাপদর বড় প্রিয়। অবসর পেলেই সে সবাইকে নিয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে কেমন করে রূপোর চাদরে মোড়া সারা অঞ্চলে সূর্য থেকে সোনা গলে পড়ে। নীলগিরির গায়ে সোনারূপার খেলা চলে। তারপর এক সময় সূর্য ওঠে মাথার ওপরে। পশ্চিমের পাহাড়ে পাহাড়ে তুষারগলা জলের ধারা ঝরে। ওরা ছুটে গেছে সেদিকে কিন্তু কাছে যাওয়া সহজ নয়। বড় বড় ফাটল আছে পথে। পাহাড়ের গা থেকে জলের সঙ্গে বরফ আর পাথর পড়ে গড়িয়ে। তবু ওরা গিয়েছে। জলের যে বড়ই অভাব এখানে। জলধারা যখন গড়িয়ে এসে কোন ফাটলের মধ্যে পড়ে, তখন সে আর জল থাকে না, পড়তে পড়তে জমে যায়। ফাটলের মুখে সাদা সুতোর মত ঝুলতে থাকে। আইস এক্স দিয়ে আঘাত করলে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে। ওরা আরও এগিয়ে

গেছে। মনে হয়েছে, যেন তুষার-ঝরা জলের ধারা নয় তানপুরার মূর্ছনা। হঠাৎ একটা বিকট শব্দে সেই তাল ভঙ্গ হয়েছে। কোথাও কোন বিরাট পাথর পড়েছে গড়িয়ে। আসর গেছে ভেঙে। ওরা এসেছে নেমে—সেই মৃত্যুপুরী থেকে।

কিন্তু আজ ওদের সময় বড় কম। আজ ওখানে যাবার অবসর নেই। পরিজ নিয়ে ছান্দু এসে হাজির হল। খেয়েই রওনা হতে হবে। বাঁধাছাদা শেষ। খেতে খেতে নিরাপদ অমূল্যকে বলে, "চঞ্চলদা বলেছেন, যে কুলিরা র‍্যাশন নিয়ে আসবে তাদের তিনি এখানেই রেখে দেবেন।"

"তাহলে আর এ তাঁবুটা ওপরে নিয়ে যাবে না?" অমূল্য চঞ্চলকে জিজ্ঞেস করে।

"না।"

"ভালই হবে। বলা তো যায় না কখন কি দরকার পড়ে। এ্যাক্সিডেণ্টই তো মাউণ্টেনিয়ারিংয়ের সাসপেন্স।"

আর কথা না বাড়িয়ে নিরাপদ সব কাজ শেষ করে ফেলে। তারপর রুকস্যাক পিঠে করে জুতোয় ক্র্যাম্পন বেঁধে অমূল্যকে বলে, "চলো এবারে বেরিয়ে পড়া যাক।"

চঞ্চল খানিকদূর পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিয়ে তাঁবুতে ফিরে যায়। আজ ওকে একা রাত কাটাতে হবে এক নম্বর শিবিরে। তুষার-মানবের পদচিহ্ন সেও দেখেছে। কিন্তু ভয় থাকতে জয় নয়।

সেই হিমবাহ-প্রপাত না পেরিয়ে তার পাশ দিয়ে পথ তৈরী করা হয়েছে। চারদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে এ জন্যে। প্রপাতের পরেই শুরু হল পাহাড়ে ওঠা—নীলগিরিতে ওঠা। গত পঁচিশ বছর ধরে যে নীলগিরির স্বপ্ন দেখেছেন পর্বতারোহীরা—তারই গা বেয়ে ওপরে উঠছে ওরা। মাঝে মাঝে অত্যন্ত কঠিন চড়াই। সবই বরফে ঢাকা—কোথাও কম, কোথাও বেশী। কিন্তু বরফ ছাড়া কি আর কিছু নেই নীলগিরিতে? আছে। তবে না থাকলেই ভাল হত। আছে ফাটল—অসংখ্য অতিকায় ফাটল। বিরাট বিরাট হাঙরের মত হাঁ করে রয়েছে। যেন গিলতে চাইছে।

ওরা সব নীলগিরির রক্ষী। নীলগিরি শিখরকে আর মনুষ্য পদচিহ্নে কলঙ্কিত হতে দেবে না। তাই যেতে দেয় নি জগদীশ নানাবতীকে—বম্বে মাউণ্টেনিয়ারিং কমিটির (১৯৬১) অভিযানের নেতা। গৌরাঙ্গ চৌধুরী ও শেরপা গোম্বু তার দলে

ছিল। যেতে দেয় নি ক্যাপ্টেন জগজীৎ সিংকে -অল আর্মি (১৯৬২) অভিযানের নেতা। আমাদের টোপগেও তার দলে ছিল।

ওরা কিন্তু মনের আনন্দে এইসব ফাটল পেরিয়ে ওপরে উঠছে। কখনও লাফ দিতে হচ্ছে, কখনও বা ফাটলের একদিক থেকে ভেতরে নেমে আরেক দিকের দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠে আসতে হচ্ছে। সাধারণতঃ ফাটলের মুখটা হয় চওড়া, নীচের দিকটা ক্রমেই সরু হয়ে আসে। কাজেই যে সব ফাটল লাফ দিয়ে পার হওয়া সম্ভব নয়, আজীবার নির্দেশে আংটেম্বা ও ছান্দু সেই সব ফাটলের দেওয়ালে স্টেপ কাটিং করছে। ওরা এক দেওয়াল দিয়ে নীচে নেমে অপর দেওয়াল দিয়ে ওপরে উঠে আসছে। কিন্তু কোন কোন ফাটল এত চওড়া যে তা এড়াবার জন্যে অনেকটা ঘুরে যেতে হচ্ছে। তাহলেও অমূল্য ও নিরাপদ অবিচলিত। শঙ্কাহীন চিত্তেই এগিয়ে চলেছে তারা। নীলগিরির ঐ রজতশুভ্র শিরে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তারা থামবে না।

বাঁদিকে নাম না জানা অগণিত তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ। ডাইনে নীলগিরি শিখর—সব সময়েই চোখের সামনে। পথ ক্রমেই দুর্গমতর হচ্ছে। শিখর ধীরে ধীরে বিশালতর হচ্ছে।

এত কষ্ট করে তৈরী করা পথ বুঝিবা বন্ধ হয়ে গেছে। বাঁদিকের পাহাড় থেকে বরফের ধস নেমেছে। পথ গেছে মুছে। এখন উপায়?

"উপায় আর কি? এর ওপর দিয়েই যেতে হবে। নরম বরফ। স্টেপ কাটার কোন প্রশ্নই ওঠে না।" নির্ভীক কণ্ঠে নিরাপদ বলে।

ওরা সেই সুবিরাট বরফের স্তূপের ওপর দিয়েই চলল এগিয়ে। এ যেন পায়ে হেঁটে নদী পার হওয়া। তবে জলের নয় তুষারের নদী। কখনও কোমর পর্যন্ত তলিয়ে যাচ্ছে, কখনও বা বুক। আইস এক্স ও ক্র্যাম্পন কোন কাজেই লাগছে না। যদি এর নীচে কোন ফাটল থাকে, তাহলে তো অতল সমাধি।

এ যাত্রায় ওরা কিন্তু বেঁচে গেল। নির্বিঘ্নেই সেই বরফের স্তূপ পেরিয়ে এল। তবে অতি সাবধানে পথ চলতে হচ্ছে। বাঁদিকে পাহাড়, ডান দিকে খাদ। পা ফস্কালেই গড়িয়ে পড়বে নীচে। একটু বাদেই শুরু হল চড়াই—আজকের শেষ চড়াই। মারাত্মক চড়াই। ধস নেমে নেমে বাঁদিকের পাহাড়গুলোর কালোরূপ মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েছে। নিরাপদ কবি নয়। তাহলেও এই অনন্ত সাদার মাঝে কালো তার বড়ই ভাল লাগে।

কালো শুধু বাঁদিকে নয়, কালো দেখা দিয়েছে সামনে। ঐ কালো গত

চারদিন ধরে ওদের জীবনের আলো হয়ে আছে। দু নম্বর শিবির তৈরি হয়েছে ওখানে—১৮,৫০০ ফুট উঁচুতে। বেশ বড় বরফাবৃত প্রায় সমতল একটি প্রান্তর পাওয়া গেছে। সেই প্রান্তরের খানিকটা অংশ তুষারাবৃত নয়—কালো পাথর বেরিয়ে রয়েছে। এই কালো আমাদের দু নম্বর শিবিরের নিশানা।

অবশেষে ওরা এসে পৌছল সেখানে। তাঁবুর সামনে বসে পড়ল সবাই। সহ্যশক্তিরও একটা সীমা আছে। ছুতার বেরিয়ে এল কিচেন থেকে। জানাল —ভানু ও নিতাই শেরপাদের নিয়ে সামনের ঐ খাড়া বরফের দেওয়াল পেরিয়ে তিন নম্বরের জায়গা খুঁজতে গেছে। ভালই করেছে। নষ্ট করার মত সময় নেই হাতে। অক্টোবর শেষ হয়ে এল। শীত ক্রমেই জাঁকিয়ে বসেছে। এখান থেকে শিখরের উচ্চতা সোজাসুজি ২৭৬৪ ফুট। বম্বের অভিযাত্রীরা এই উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে সোজাসুজি উঠতে গিয়েই বিফল হয়েছেন। ওরা চেষ্টা করবে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে। অর্থাৎ নীলগিরির এই পশ্চিম প্রান্ত থেকে ওদের এখন পৌছতে হবে পূর্ব প্রান্তে। সেখানে হাজার দেড়েক ফুট ওপরে কোন মতে যদি তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে জয় সুনিশ্চিত। তিন নম্বরের শিবির প্রতিষ্ঠার ওপরেই অভিযানের সাফল্য নির্ভর করছে।

ছুতারকে ড্রিঙ্কিং চকোলেট তৈরী করতে বলে অমূল্য। শেরপাদের নিয়ে ছুতার চলে যায় কিচেনে। পর্বতাভিযানে কিচেন টেণ্টই হল স্বর্গ। সেখানে আগুন জ্বলে।

রুকস্যাকের পকেট থেকে চামচ বের করে অমূল্য ও নিরাপদ জুতোর বরফ পরিষ্কার করতে থাকে। বেশ জোরে হাওয়া বইছে। তবে আজ এখনও আবহাওয়া খারাপ হয় নি। সাধারণতঃ সকালে আকাশ পরিষ্কার থাকে। দুপুরেই দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। আজ আকাশ এখনও ঘন নীল। নীল আকাশের নীচে নীলগিরিতে বসে আছে ওরা।

এখান থেকে এক নম্বর শিবির স্পষ্ট দেখা যায়। প্রায় পুরো খুলিয়াগাভিয়া গ্রাবরেখাটিই দেখা যায়। সাদায় কালো মেশানো সরু এক ফালি প্রান্তর—খুলিয়াঘাটার প্রান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে। দেখা যায় বানকুণ্ড হিমবাহ। তার কোথাও কালো নেই, সবই সাদা। আর দেখা যায় মহাসমুদ্রে উর্মিমালার মত অগণিত পর্বতশৃঙ্গ। অপরিচিতের ভীড়ে পরিচিতরা পর্যন্ত হারিয়ে গেছে। তাহলেও চেনা যায় কামেট। অমূল্যর চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে। মেজর জয়াল জয় করেছিলেন ঐ শৃঙ্গ। অমূল্য যখন ট্রেনিং নিয়েছে জয়াল তখন

হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ। বীরের মৃত্যু নেই। তাঁর অমর স্মৃতি রক্ষার্থে যে ভাণ্ডার গড়ে উঠছে, তা থেকেই আমরা এ অভিযানের সাজ-সরঞ্জাম পেয়েছি। অমূল্য ও নিরাপদ যে পোশাক পরে আছে তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মেজর জয়ালের অক্ষয় স্মৃতি।

॥ ২৯ ॥

এক সূত্রে বাঁধা থাকে একাধিক জীবন। সবাইকে এক করে নেয় এই সূত্র। সূত্রধারকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে, এক কথা ভেবে, এক লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। পৃথিবীতে এমন কোন স্পোর্টস্ নেই যাতে এতখানি একতা, সংযম ও ত্যাগের প্রয়োজন। এই এক-প্রাণ হয়ে যাওয়ার মূলে হল ঐ সূত্র, যাকে পর্বতারোহণের ভাষায় বলে রোপ্ বা দড়ি। এ দড়ি শুধু পর্বতারোহীর জীবন নয়, পর্বতারোহণেরও জীবন। কোমরে দড়ি বেঁধে, জীবন পণ করে এগিয়ে যেতে হয়। তবেই সাফল্য এসে জয়মাল্য পরিয়ে দেয়।

গত দুদিন দড়ি বেঁধে অনেক ঘুরেছে ওরা। অনেক পরিশ্রম করেছে। কিন্তু এগোতে পারে নি বেশী দূর। তিন নম্বর শিবিরের জায়গা পাওয়া যায় নি।

সেদিন সন্ধ্যের একটু আগে ভানু ও নিতাই ফিরে এল দু নম্বর শিবিরে। হতাশ কণ্ঠে নিতাই অমূল্যকে জানাল, "নাঃ, ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড পাওয়া গেল না।"

"এত সহজে পাওয়া যাবে জানলে কি আমরা এখানে আসতাম নিতাই? হাল ছেড়ে দিও না। আজ পাও নি, কাল পাবে।"

পরদিন চা ও পরিজ খেয়ে আবার ওরা বেরিয়ে পড়ল। দু নম্বর শিবিরের পূবে যে বিরাট বরফের দেওয়াল রয়েছে, সেই দেওয়াল পেরিয়েই ওপরে ওঠার পথ। দেওয়ালটা বেশ উঁচু আর খুবই খাড়া। তাছাড়া বরফ নরম বলে স্টেপ্ কাটা যায় নি। ফিকস্ড্ রোপ্ বা স্থায়ীভাবে দড়ি খাটানো হয়েছে। এই দড়ি খাটানোর কাজটি বেশ কঠিন। যেমন করেই হোক, কোমরে দড়ি বেঁধে, হাতুড়ি ও পিটন্ নিয়ে দুজনকে ওপরে উঠে যেতে হয়। তারা বরফ পরীক্ষা করে, সুবিধামত জায়গায় পিটন্ পুঁতে দড়ি ঝুলিয়ে দেয়। সেই দড়ি ধরে অন্যান্য অভিযাত্রীরা ওপরে ওঠে। এত ওপরে—যেখানে নিঃশ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হয়, জুতোর ফিতে খুলতে হাঁপিয়ে ওঠে, সেখানে স্বভাবতই পালা

করে এই ফিকস্‌ড্‌ রোপ্‌ লাগানোর কাজটি করতে হয়। পিটন্‌ হচ্ছে আংটা লাগানো খুঁটি—কাঠ বা লোহার তৈরী। এখানে বরফ বেশী বলে আমরা বড় বড় কাঠের পিটন্‌ সঙ্গে এনেছি। সেগুলো এখন খুব কাজে লাগছে।

দু নম্বর শিবির থেকে মনে হয় এই বরফের দেওয়ালটার ওপরে উঠতে পারলেই শিখরের সহজ পথ পাওয়া যাবে। মনে তো অনেক কিছুই হয়, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তার মিল কোথায়? দেওয়ালের ওপর উঠে বোঝা যায় শিখর তখনও দূরে বহুদূরে—অনেক দেওয়াল অনেক ধস, অনেক ফাটল পেরিয়ে।

এ ফাটলগুলো আরও বড়, আরও মারাত্মক।

অমূল্য বলে, 'পাতালের পথ।'

ভানু বলে, 'নরকের দ্বার।'

টোপগে বলে, 'গত জুনে কিন্তু এত ফাটল ছিল না।'

থাকবে কেমন করে? সারা শীতের বরফ জমে ফাটলের মুখ ছিল বুঁজে। তখনও বরফ গলা শুরু হয় নি। গত চার মাস ধরে সেই বরফ গলেছে, দেখা দিয়েছে এইসব ফাটল।

তাহলেও ওরা গিয়েছিল অনেক দূর। পৌঁছেছিল ঠিক শিখরের নীচে—উত্তর-পশ্চিম দিকে। পূব দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে নীলগিরি শিখর সুন্দর। কিন্তু এখান থেকে যেন আরও সুন্দর। তবে এখান থেকেও সে ধরাছোঁয়ার বাইরে। পথ আটকে রয়েছে বিরাট এক বরফের নদী। নদীটা না থাকলে খুব সহজেই ওপরে উঠা যেত। অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু নদীটা পার হওয়াও গেল না। শেষ পর্যন্ত ওদের পশ্চাদপসরণ করতে হল। ওপরে না উঠে ওরা চলল পূবে। স্মাইথ ঠিকই বলছেন—উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে কোণাকুণিভাবে ওপরে উঠতে হবে। সেদিকে বরফের অবস্থা কেমন কে জানে?

এ পথে বরফের নদী নেই কিন্তু যা আছে তাই বা কম কিসের? আছে ফাটল আর বরফের দেওয়াল—দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রাচীরের মত। আজীবা বলল, "এই প্রাচীর পেরুতে হবে।"

আবার ফিকস্‌ড্‌ রোপ্‌ লাগানো শুরু হল। কিন্তু শেষ হল না। তার আগেই পড়ল বাধা। শিখর থেকে প্রহরীর মত দলে দলে মেঘ ছুটে এল। নীল আকাশ ধূসর হল—কালো হল। দূরের রোদ হারিয়ে গেল, কাছের আলো মিলিয়ে গেল। কোথা থেকে তুষারের প্রবাহ নিয়ে মত্তপবন ছুটে এল। শরীর প্রায় অবশ হয়ে গেল। প্রাণ হাতে করে ওরা কোনরকমে পালিয়ে এল।

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। পুজো গেছে, লক্ষ্মীপুজো গেছে, কালীপুজোও এল বলে। উমাপ্রসাদ নগর থেকে হালুয়া এসেছিল। তা দিয়েই ওরা বিজয়া সেরেছে। এ বছর আর নারকোলে নাড়ু খাওয়া হল না। না হোক, যা হবে বলে ঠিক ছিল, তাও যে হল না। দশমীর দিন শিখরে বসে ওদের বিজয়ার উৎসব পালনের কথা ছিল। অমূল্য মা-দুর্গার একখানি ছবিও সঙ্গে এনেছে। কিন্তু কোথায়? এখনও যে তিন নম্বর শিবিরই প্রতিষ্ঠা করতে পারল না। তাহলেও অমূল্য ভরসা দেয়, "দেয়ালীর আগেই নীলগিরি বিজয় হবে। উমাপ্রসাদ নগরে একসঙ্গে দেয়ালী ও বিজয়োৎসব পালন করব।"

"কিন্তু দেয়ালীর যে আর মোটে পাঁচদিন বাকী!" নিতাই অবাক হয়।

"পাঁচদিন কি কম হল?" নিরাপদ আশ্বাস দেয়।

"তাহলে চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।" ভানু অমূল্যকে তাগিদ দেয়।

"না। আজ আমাদের পূর্ণ বিশ্রাম। আজ শুধু শেরপারাই ফিকস্‌ড্ রোপ করতে যাবে।"

"তাহলে চারদিনে কেমন করে......" নিতাই শেষ করতে পারে না।

নিরাপদ বলে। "যেমন করে আমরা করব।"

শুধু বিশ্রাম নয়, আজ খাওয়াটাও ভাল হল এ্যাডভান্স বেস ছাড়ার পর খাচ্ছে তো সকালে আধ মগ চা ও বার্লির মত খানিকটা শেরপা পরিজ। ব্যাস—'পারিজ খাও, মাল উঠাও, উপার চলো।' পরিজ অখাদ্য, মাল প্রায় তিরিশ সের, উপার মানে—নরম বরফ, গভীর ফাটল আর খাড়া দেওয়াল। তাপমাত্রা মাইনাস তিরিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

নিতাই ছুতারকে ডাকে, "সুতার।" সুতার মানে সুস্বাদ। কিন্তু তার তৈরী পরিজের সঙ্গে তার নামের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ এই খেয়েই ওদের সারাদিন মাল বইতে হয়, স্টেপ্ কাটিং ও ফিকস্‌ড্ রোপ্ করতে হয়। বিকেলে ফিরে এসে আধ মগ চা ও কয়েকখানা বৃটানিয়া বিস্কুট। বিস্কুটও ফুরিয়ে গেছে দুদিন হল। সন্ধ্যের সময় আসে খিচুড়ী—সারা দিনের মজুরী। এই খেয়েই বেঁচে আছে ওরা। আজ তার ব্যতিক্রম। আজ দুপুরে ডাল ভাত ও আলুসেদ্ধ হয়েছে। প্রাণভরে খেয়েছে। বহুদিন ভাত খায় নি কিনা!

পরদিন। নিরাপদ ও শেরপাদের নিয়ে অমূল্য বেরিয়ে পড়ল সকালে। যে দেওয়ালের নীচ থেকে পরশুদিন ওরা পালিয়ে গিয়েছিল, ফিকস্‌ড্ রোপ দিয়ে

অনায়াসে তার ওপরে উঠে গেল। এগিয়ে চলল উত্তর-পূর্বে—পাহাড়ের গা ঘেঁষে। এদিকে বরফ কম, তবে মাঝে মাঝে বরফ গড়িয়ে গায়ে পড়ছে। একটু বাদেই বাঁ দিকে একটা শক্ত বরফ ও পাথর মেশানো খাড়া পাহাড়—আছাড় খাবার ভয়। জুতোয় ক্র্যাম্পন বাঁধা হল। এখানেই আর্মি টিম তাঁদের ক্যাম্প টু বা শেষ শিবির স্থাপিত করে শিখর অভিযান চালিয়েছিলেন।

নিরাপদ থমকে দাঁড়ায়। ওর একপাটি জুতো ছিঁড়ে গেছে—বরফ ঢুকছে পায়ে। অমূল্য চিৎকার করে ওঠে, "সর্বনাশ ফ্রস্ট বাইট হয়ে যাবে যে।" নিজের জুতো নিরাপদকে দিয়ে, নিরাপদর ছেঁড়া জুতো পরে, সে নেমে গেল নীচে। নিরাপদ এগিয়ে চলল শেরপাদের নিয়ে।

আরেকটা দেওয়ালের সামনে এসে পৌঁছল ওরা—একেবারে খাড়া দেওয়াল। এক এক জায়গায় এত খাড়া যে ফিক্স্‌ড্‌ রোপ্‌ ধরে, প্রায় ঝুলে ওপরে উঠতে হয়। নীচে পাতাল প্রসারী খাদ। তাকালে ভয় হয়। তাহলেও ওরা শেষ পর্যন্ত সেই দেওয়ালের ওপর উঠে এল।

টোপগে থমকে দাঁড়াল। আর আর্মির পথে এগোন সম্ভব নয়। চার মাস আগের সেই পথ এখন ফাটলে বোঝাই। বাঁ দিকে বরফ ও পাথর মেশানো একটা দেওয়াল। আবার জুতোয় ক্র্যাম্পন বাঁধতে হল। শক্ত বরফ, কাজেই আছাড় খাবার ভয়। বরফের চেয়ে পাথরগুলো আরও বিপজ্জনক। ছোঁয়া লাগলেই নড়ে উঠে, নীচে গড়াতে শুরু করে। পর্বতারোহণের কঠিনতম পরীক্ষা দিতে হচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে।

উত্তীর্ণ হয়েছে ওরা। কিন্তু এখনও যে অনেক বাকী। সামনেই আর একটা বরফের দেওয়াল। প্রায় আশী ডিগ্রী কোণ করে বান-কুণ্ড হিমবাহের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, যেন এখুনি ভেঙ্গে পড়বে। তাহলেও পেরুতে হবে এই বাধা। স্টেপ্‌ কাটা হল। মাঝে মাঝেই নরম বরফ। পা দিতেই ধসে যাচ্ছে। কোন রকমে দেওয়াল আঁকড়ে থেকে আবার স্টেপ্‌ কাটতে হচ্ছে। এইভাবে প্রায় ঘণ্টা খানেক আপ্রাণ চেষ্টা করে ওরা সবাই উঠে এল সেই দেওয়ালের ওপর।

ওপরে, আরও ওপরে। যেতে হবে, যেমন করেই হোক। পেরুতে হবে সামনের ঐ সঙ্কীর্ণ বরফের সেতু। কিন্তু কেমন করে? সেতুটি প্রায় দুশ গজ দীর্ঘ। এত সঙ্কীর্ণ যে একখানি পা কোন রকমে রাখা যায়। পাশে আইস এক্স রাখার জায়গা পর্যন্ত নেই। সার্কাসে যেমন করে তারের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয়, তেমনি করে ভারসাম্য বজায় রেখে ওরা একে একে এপারে এসে পৌঁছল।

তবে সেখানে তারের নীচে থাকে দড়ির জাল। আর এখানে ডান দিকে ছ হাজার ফুট ও বাঁ দিকে দেড় হাজার ফুট গভীর খাদ।

এপারে এসেই সকলের চোখ জুড়িয়ে গেল। ওরা একটা বিরাট বরফাবৃত প্রায় সমতল প্রান্তরে এসে পৌঁছেছে। এই উচ্চতায় এত বড় প্রান্তর বিস্ময়কর। আনন্দে শেরপারা পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। ওদের শ্রম সার্থক হয়েছে। তিন নম্বর শিবিরের ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড পাওয়া গেছে। টোপগে আফসোস করল, "ইস্ একটা ফুটবল আনা হয় নি।"

শখের বলিহারী। মাইনাস তিরিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ফুটবল খেলবে।

সামনেই নীলগিরি শিখর। শিখর থেকে একটি সঙ্কীর্ণ গিরিশিরা নেমে এসেছে। ঐ গিরিশিরাই শিখরের একমাত্র পথ। স্টেপ্ কেটে কেটে এই ১১৬৪ ফুট উঠতে হবে। পূবে খাড়া পাহাড়, দক্ষিণে বরফের স্তূপ, দিনরাত হিমানী সম্প্রপাত হচ্ছে। হোক গে, যেখানে পৌঁছনো দরকার ওরা সেইখানে পৌঁছতে পেরেছে। নেহাৎ প্রাকৃতিক দুর্বিপাক না হলে জয় সুনিশ্চিত।

সাধারণত বিশ হাজার ফুট উঠতে পারলেই পর্বতারোহণের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এই বরফাবৃত প্রান্তরটি খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এ অভিযানও স্বীকৃতি পেল। এখানকার উচ্চতা ২০,১০০ ফুট।

এখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। উত্তরে কামেট মানা ও দেওবন, দক্ষিণে ত্রিশুল ও নন্দাঘুন্টি, পূবে নন্দাদেবী পশ্চিমে চৌখাম্বা ও নীলকণ্ঠ। দেখা যায় জোশীমঠের উপত্যকা।

ওরা মালপত্র পিঠ থেকে নামাল। নিরাপদ ও আজীবা বসে পড়ল। কিন্তু বসল না অন্যান্য শেরপারা। ওদের আর তর সইছে না। পারলে এখনি গিয়ে শিখরে ওঠে। উপযুক্ত আয়োজন না করে যে শিখরে ওঠা সম্ভব নয়, তা ওরা জানে। তবু ওরা এগিয়ে গেল সেই সঙ্কীর্ণ গিরিশিরার দিকে। একটু ঘুরে আসতে।

ইচ্ছে থাকলেও নিরাপদ ওদের সঙ্গে যেতে পারল না। সে আজকের এই অভিযানের নেতা। নেতাকে আনন্দে অবিচল থাকতে হয়। তাছাড়া প্রচণ্ড হাওয়া বইছে। আবহাওয়া কখন খারাপ হয় বলা যায় না। তাঁবু ছাড়া বেশীক্ষণ বসা যাবে না এখানে। ইতিমধ্যে কিভাবে শিখর অভিযান চালাতে হবে, আজীবার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করে ফেলতে হবে। নিরাপদর ইচ্ছা, পরশুদিন অর্থাৎ ২৫শে অক্টোবর চূড়ান্ত সংগ্রামের দিন ধার্য করা হোক।

আজীবার কিন্তু তাতে আপত্তি। কারণ কাল কাউকে এক নম্বর শিবিরে যেতে হবে খাবার ও পিটন্ আনতে।

আবার খাবার কম পড়েছে? পিটন্গুলোই বা এক নম্বরে রেখে আসার কি কারণ থাকতে পারে? নিরাপদ বিরক্ত হয়। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই। ভুলের খেসারৎ দিতেই হবে।

প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পরে ওরা মালপত্র সেখানে রেখে ফিরে চলল দু নম্বর শিবিরে। আজ বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারবে অমূল্যর সামনে। হাসতে পারবে প্রাণ খুলে—ভাগ্যবান নিরাপদ।

পরদিন। খুব সকালেই পান সিং ও ছুতারকে নিয়ে অমূল্য ও নিরাপদ রওনা হল নীচে—এক নম্বর শিবিরে। চলল চিনি গুঁড়ো দুধ ও আইস পিটন আনতে। সাধারণতঃ এ সব কাজ শেরপারাই করে। কিন্তু আজ তারা পরিশ্রান্ত বলে, নেতা নিজেই ট্রেড কর্পোরেশনের লেদার জ্যাকেট পরে বেরিয়ে পড়ল।

এক নম্বরে চঞ্চলের সঙ্গে দেখা হল। কুলিরাও র‍্যাশন্ নিয়ে নেমে গেছে। পরশুদিন চঞ্চলকে দু নম্বরে আসতে বলে, ওরা মাল নিয়ে ফিরে এল বিকেলে। এসেই অমূল্য ডেকে পাঠাল আজীবাকে। ভানু ও নিতাই বেরিয়ে এল তাদের তাঁবু থেকে। সবাই বসল গোল হয়ে। আলোচনা শেষে সাব্যস্ত হল—পরশু (২৬শে অক্টোবর শুক্রবার) প্রথম প্রচেষ্টায় শেরপাদের সঙ্গে দুজন সভ্য যাবে চূড়ান্ত সংগ্রামে। যদি তারা বিফল হয়, তবে একদিন বিরতির পর বাকী দুজন যাবে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায়। যদি তারাও বিফল হয়?

সেকথা তখন ভাবা যাবে। কিন্তু প্রথম দুজন কে? সবাই চুপ করে আছে। কে বাদ পড়বে? অমূল্যই নীরবতা ভাঙে, "নেতা ও সহনেতার মধ্যে একজন যাবে। সেই একজন ভানু। ভানুই প্রথম শিখর অভিযানের নেতৃত্ব করবে।"

"তুমি?" ভানু বিস্মিত।

"আমি যাব দ্বিতীয় দলে। তবে প্রার্থনা করি আমার যাওয়ার প্রয়োজন যেন না হয়। তোমরা বিজয়ী হয়ে ফিরে এসো। আমিই তিন নম্বর শিবিরে তোমাদের প্রথম অভিনন্দন জানাব।"

অভিভূত ভানু অমূল্যকে জড়িয়ে ধরে।

একটু বাদে অমূল্য আবার বলে, "নিতাই ও নিরাপদ—তোমরা নিজেরাই

ঠিক করে নাও, কে যাবে প্রথম দলে।”

কে যাবে প্রথম দলে? নিতাই না নিরাপদ? নিরাপদ না নিতাই? নিতাইয়ের বড আশা—মা-বাবার নাম লেখা যে কাগজখানি রয়েছে ওর বুক-পকেটে, সেখানি সে রেখে আসবে নীলগিরি শিখরে।

আর নিরাপদ? তারই কি কম আশা? সে নীলমণি নীলগিরির শুচী শুভ্র শিখরে একটি চুম্বন দেবে এঁকে। সেই তো এ শিখর নির্বাচিত করেছে। তিন নম্বর শিবিরের জায়গা খুঁজে বার করেছে। সেখানে শিখরাভিযানে মাল বয়ে নিয়ে গেছে। আর সেই যাবে না শিখরে? কিন্তু সে গেলে যে নিতাই বাদ পড়ে। নিতাই তাঁর অনেক দিনের বন্ধু। এক সঙ্গে দার্জিলিংয়ে বেসিক কোর্স করেছে। কলকাতা ছাড়ার পর থেকে এক নম্বর শিবির পর্যন্ত দুজনে সব সময়ে এক সঙ্গে রয়েছে। একই তাঁবুতে রাতের পর রাত কাটিয়েছে। একজনের মাথা ধরলে আরেকজন মাথা টিপে দিয়েছে। ঘুমের ঘোরে টুপি খুলে গেলে টুপি পরিয়ে দিয়েছে। দুর্গম পথে মাল বয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়লে একে অপরের মুখের সামনে জলের বোতল খুলে ধরেছে। তারাই আজ প্রতিদ্বন্দ্বী। কে তার নিজের দাবী ছেড়ে দেবে? কিন্তু নিরাপদই যে নিতাইকে তেজপুর থেকে আনিয়েছে। আর এখন সে স্বার্থপরের মত নিতাইকে ফেলে রেখে নিজে এগিয়ে যাবে? কিন্তু না গেলে যে কেউ জানবে না—নিরাপদ একদিন এখানে এসেছিল, গোধূলীর রক্তিম রশ্মিতে রক্তরাঙা নীলগিরিকে সেও ভালবেসেছিল।

না জানুক—অজানাই থাক সে কথা। ভালবাসার অনেক কাহিনী তো চিরকাল মনের মণিকোঠায় থেকে যায়। তবে সে যে স্বার্থপর নয়, বন্ধুকে বঞ্চিত করে নি এ সত্যটা তো চিরকাল জানবে নিরাপদ। নিতাই-য়ের দিকে তাকায় সে। নিতাইও কি যেন বলতে চাইছে তাকে। হারিয়ে যাওয়া ভাষা খুঁজে পেল নিরাপদ। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “আমি নয়, তুই যাবি প্রথম দলে।”

'...আর একটু...ব্যাস্। দাস্ ফার্ এ্যাণ্ড নো ফার্দার্ ভাত্মুদা।' আনন্দে চিৎকার করে ওঠে নিতাই। আবেগে আলিঙ্গন করতে চায় ভাত্মুকে। পারে না। হাত দুখানি কি অবশ হয়ে গেছে? না ভাত্মুকে আলিঙ্গন করতে হলে হাত বের করতে হবে—স্লিপিং ব্যাগের জীপ্ খুলতে হবে। স্বপ্ন দেখছিল নিতাই। স্বপ্ন দেখছিল, তারা নীলগিরির স্বপ্নশিখরে আরোহণ করেছে। স্বপ্ন তো দেখছে আজ কতদিন ধরেই। ঘুমিয়ে নয়, জেগেই স্বপ্ন দেখেছে সেই প্রতীক্ষিত প্রহরের, যখন তারা বলতে পারবে—'ব্যাস্। এই পর্যন্ত, আর নয়। আরোহণ শেষ হল, এবারে অবরোহণের পালা।'

ভাগ্যিস ভাত্মুর ঘুম ভাঙ্গে নি। নইলে নিতাই বড় লজ্জা পেত। রাত কত বাকী কে জানে? ঘড়ি দেখতে হলেও হাত বের করতে হবে। দরকার নেই রাতের খবর নিয়ে—যা শীত পড়েছে। কাল সন্ধ্যের সময়েই ছিল মাইনাস পঁয়ত্রিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এখন কত? ভাবলেও ভয় করে। তার চেয়ে যতটা পারা যায় ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্। রাত ফুরোলেই ২৬শে অক্টোবরের উষা। বহু প্রতীক্ষিত চূড়ান্ত সংগ্রামের মহালগ্ন—এমন লগ্ন সবার জীবনে আসে না।

কিন্তু ভাত্মুদা তো দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে! ওর কি কোন ভয় নেই—ভাবনা নেই। নিতাই যে দু চোখের পাতা এক করতে পারছে না। নানা ভাবনা এসে ভীড় করছে তার মনে। মনে পড়ছে শুভাত্মুধ্যায়ীদের কথা, মনে পড়ছে অভিযাত্রী বন্ধুদের কথা, মনে পড়ছে অমূল্য ও নিরাপদর কথা।

নিরাপদ। হ্যাঁ নিরাপদর কথাই বেশী মনে পড়ছে। বলতে গেলে একরকম জোর করেই সে নিতাইকে শিখরাভিযানে পাঠিয়েছে। ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে বন্ধুত্বের দাবী তার কাছে অনেক বড়। বলেছে, "তোর যাওয়া আর আমার যাওয়া একই কথা। কে শিখরে উঠল সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে—আমরা নীলগিরি বিজয় করতে পারলাম কিনা? যদি সফল হই, তাহলে জানবি, সে সাফল্য তোর কিম্বা আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সম্ভব হয় নি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই সেই সাফল্য এনে দিয়েছে।"

কাল সকালে অমূল্য ও নিরাপদ ওদের রুকস্যাক গুছিয়ে দিয়েছে, সামনে বসিয়ে খাইয়েছে, তারপরে তাঁবু গুটিয়ে তিন নম্বর শিবিরে রওনা করিয়ে দিয়েছে। আস্তে আস্তে পথ চলেছে ওরা। অমূল্য ও নিরাপদকে ছেড়ে আসতে হয়েছে

বলে, মনের সঙ্গে পাও যেন ভারী হয়ে পড়েছে।

এখানে—এই তিন নম্বর শিবিরে পৌছতে বেলা দেড়টা বেজে গেছে। একটু বিশ্রাম নিয়ে চা খেয়ে কাজ শুরু করেছে। বরফ কেটে সমতল করে কাঠের পিটন পুঁতে দুটো তাঁবু খাটিয়েছে। একটা শেরপাদের, একটা নিতাই ও ভানুর। পর্বতাভিযান মানেই নিত্য নতুন সংসার পাতা—এক শিবির গুটিয়ে আর এক শিবির প্রতিষ্ঠা করা। এয়ার ম্যাট্রেস ফুলিয়ে শয্যা রচনা হল। পট্টি মোজা ও গেইটার রোদে শুকনো হল। বরফ পরিষ্কার করে জুতো স্লিপিং ব্যাগে রেখে দিল। ক্যাম্পশু না আনার জন্যে ওরা আর বাইরে বেরুতে পারল না। ততক্ষণে বেলাও গড়িয়ে এসেছে। নীলগিরির শুভ্র শিখরে অস্তগামী সূর্যের অন্তিম রশ্মির পরশ লেগেছে। শিশুর সারল্য নিয়ে খেয়ালী প্রকৃতি হোলি খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে। শুধু নীলগিরিকে রাঙিয়েই সে ক্ষান্ত হয় নি। চারিদিকের অমল ধবল নিশ্চল শিখরগুলোর কাউকে রেহাই দিচ্ছে না। রেহাই দিচ্ছে না অসীম আকাশকেও। নিতাই তাকে এত নীল হতে দেখে নি কোনদিন। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যে রংয়ের অভাব নেই!

ছুতারের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মাঝরাতে স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছিল নিতাই। স্বপ্ন দেখেছিল তারা নীলগিরির স্বপ্ন-শিখরে আরোহণ করেছে। তারপরে অনেকক্ষণ জেগে ছিল। ভাবছিল গতকালের কথা। ভাবতে ভাবতে কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

ছুতার চা ও পরিজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়ে ভানু ও নিতাই। ইস্ নটা বেজে গেছে। খেয়ে নিয়েই পোশাক পরতে শুরু করে—উলের গেঞ্জী, সুতীর জামা, সোয়েটার, উইণ্ডপ্রুফ ও ফেদার জ্যাকেট, উলের ড্রয়ার, উইণ্ডপ্রুফ ও ফেদার প্যাণ্ট। জুতো পরে ভানু পট্টি বাঁধে পায়ে, নিতাই বাঁধে গেইটার। তারপর বালাক্লাভা টুপি মাথায় দিয়ে, আইস গগ্ল্স্ ও আইস এক্স হাতে দুজনে বেরিয়ে আসে তাঁবুর বাইরে। বাঃ চারিদিকে কি সুন্দর রোদ! গত দু দিনের মত আজও আকাশ মেঘমুক্ত। নীলে নীলে নীলা হয়ে আছে নীলমণি—নীলগিরির নীলাকাশ।

কিছুক্ষণ বাদে শেরপাদের নিয়ে সর্দার আজীবা বেরিয়ে এল। ক্র্যাম্পন বেঁধে, দড়ি হাতে, রুকস্যাক পিঠে নিয়ে প্রস্তুত হয়েই এসেছে ওরা। ঠিক হল প্রথম দড়িতে যাবে আজীবা টোপগে ও ছান্দু। দ্বিতীয় দড়িতে ভানু নিতাই

আং দাওয়া ও আং টেম্বা। ওরা রওনা হল ওপরে—যেখানে পঁচিশ বছর আগে ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ গিয়েছিলেন একদিন—সেইখানে। যেতেই হবে, যেমন করেই হোক।

তাঁবু থেকে সিকি মাইল বরফাবৃত প্রায় সমতল প্রান্তরের ওপর দিয়ে হেঁটে ওরা পৌঁছল নরম বরফের একটা হেলে-থাকা দেওয়ালের সামনে। প্রান্তরের এখানে ওখানে ফাটল ছিল বলে এ পথটুকু খুব সাবধানে পেরুতে হয়েছে। ফিক্সড্ রোপ করে সবাই একে একে উঠে এল সেই দেওয়ালের ওপরে। একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার শুরু হল পথ চলা। জুতো দিয়ে সজোরে লাথি মেরে কিম্বা আইস এক্স দিয়ে স্টেপ তৈরী করে, আজীবা চলেছে সবার আগে। চলেছে স্বচ্ছন্দ গতিতে। দেখে মনে হচ্ছে না তার কোন পরিশ্রম হচ্ছে। মনে হচ্ছে না সে এ পথে জীবনে আর কোনদিন আসে নি—যেন সব চেনা সব জানা।

চলেছে ওরা কোমল তুষারের ওপর দিয়ে। খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে। তুষার ক্রমশঃ কোমলতর হচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপে পা তলিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আজীবার সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করল টোপগে। সুইজারল্যাণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত দার্জিলিং হিমালয়ান ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন ইন্সট্রাকটর শেরপা টোপগে। আর্মি টিমের সঙ্গে সে এসেছিল এখানে, কিন্তু হার মেনেছ নীলগিরির কাছে। আজ নীলগিরিকে হার মানতে হবে তার কাছে। আইস এক্স দিয়ে স্টেপ কেটে কেটে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে টোপগে। মুহূর্তের জন্যে অসাবধান হলে চলবে না। নীলগিরিকে বিশ্বাস নেই।

নইলে এতক্ষণ যা ছিল না তা আবার এখানে কেন? বেশ চওড়া ও গভীর একটি ফাটলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। পথ বন্ধ। কিন্তু ওরা যে পথিকৃৎ। পথ তৈরী করে পথ চলতে হবে। অভিজ্ঞ টোপগে ফাটলের মধ্যে চওড়া করে স্টেপ কাটল। ছান্দুর সাহায্যে ওপরে উঠে আইস পিটন পুঁতে, নিজের ভারসাম্য বজায় রেখে, হাত ধরে এক এক করে সবাইকে টেনে তুলল।

এবার সবার আগে চলেছে সর্বকনিষ্ঠ শেরপা ছান্দু। তার ওজনও সবচেয়ে কম। আইস পিটন নিয়ে সে সহজেই উঠে যেতে পারছে। আবার একটা বরফের দেওয়াল। এক জায়গায় ছান্দুর আইস এক্স বরফে ঢুকে গেল। ওপরের ঝুরো বরফ সরিয়ে নিচের শক্ত বরফ কেটে আইস এক্স খুঁজে বের করতে হল।

দেওয়াল পেরিয়ে খানিকটা সমতল জায়গা পাওয়া গেল। একটু বিশ্রাম না নিয়ে আর চলতে পারছে না কেউ। সবাই বসে পড়ল সেখানে। ভানু পকেট

থেকে চকোলেট বের করে সবাইকে দিল। চকোলেট খেয়ে বরফের গোলা পাকিয়ে চুষতে চুষতে ওরা আবার উঠে দাঁড়াল।

পথ দুর্গম। নীলগিরি যে দুর্গম গিরি। সে যে নীল দুর্গম। তবু এতক্ষণ ওদের আরোহণ ব্যহত হয় নি। সকল বাধাকে জয় করে ওরা ক্রমাগত ওপরে উঠছিল। কিন্তু এবারে বুঝি নীচে নামতে হয়। সামনেই একটা গভীর খাদ—আগের দুটির চেয়ে প্রশস্ততর। পার হবার পথ নেই। খাদের ওপর দু এক জায়গায় সেতুর মত বরফের আস্তরণ রয়েছে বটে, কিন্তু তা এত পাতলা যে তার ওপর পা দিলেই পাতাল-প্রবেশ। খাদ এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আর এড়িয়ে যেতে হলে খাড়া দুশ ফুট নেমে গিয়ে, হিমানী-সম্প্রপাত-স্থান দিয়ে আবার ওপরে উঠতে হবে। পাঁচশ ফুট উঠতে তিন ঘণ্টা লেগেছে। এখন বেলা সাড়ে বারোটা। শিখর এখনও ছশ ফুট ওপরে। এ অবস্থায় দুশ ফুট নেমে যাওয়া…! কিন্তু উপায় কি? তাই করতে হল ওদের।

যেখানে আরোহণে এত বাধা, সেখানে অবরোহণও কি নির্বিঘ্ন হতে পারে? একাধিক জায়গায় ফিক্সড্ রোপ করতে হল। ম্যানিলা রোপ ফুরিয়ে গেল। এর পরে নাইলন রোপ ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। ইতিমধ্যে দড়ি বদল হয়েছে। প্রথম দড়িতে নিতাই আজীবা ছান্দু ও আং দাওয়া। ধীর স্থির ও বিচক্ষণ ওস্তাদ আং দাওয়া। কথার চেয়ে কাজ করে বেশী। মুখে তার সব সময়েই হাসি। দুটি ভারতায় নন্দাদেবী অভিযানে অংশ নিয়েছে সে। আগামী আমেরিকান এভারেস্ট অভিযানেও দলভুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় দড়িতে ভানু টোপগে ও আং টেম্বা। প্রথম দলই পথ তৈরী করছে। দ্বিতীয় দল এক হাঁটু নরম বরফে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা জানে, এ রকম দাঁড়িয়ে থাকলে ফ্রস্ট-বাইট হবার সম্ভাবনা। ঠাণ্ডায় এমনিতেই রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। তার ওপর চলা বন্ধ করলে তো কথাই নেই। কিন্তু ওদের ফ্রস্ট-বাইট হবে বলে কি নীলগিরিতে বরফ থাকবে না? বরফই যে নীলগিরির বিশেষত্ব। স্মাইথের ভাষায়, 'The finest snow and ice-peak ..'

শেষ পর্যন্ত শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে ওরা উঠে এল ওপরে। একটু বিশ্রাম নিল। ভানু আবার এক টুকরো করে চকোলেট সবাইকে দিল। বেলা দেড়টা বাজে।

আকাশের অবস্থা অপরিবর্তিত। উজ্জ্বল সূর্যালোকে জ্বলজ্বল করছে নীলগিরি শিখর, 'Simple, beautiful and serene in the sunlight, the perfect

summit of the mountaineers dreams'.

মেঘ আসছে মানার দিক থেকে। সর্বনাশা মেঘ আবার তুষার ঝড় নিয়ে আসছে না তো ? তা হলে যে সব শেষ। আব্ হাওয়ার জন্যই অধিকাংশ অভিযান বিফল হয়।

বেশীক্ষণ বিশ্রাম করার সময় নেই। বেলা দুটো বাজে। শিখর এখনও অনেক দূর। তা ছাড়া যা শীত। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা না বলাই উচিত। তবে বরফের অবস্থা খুব ভাল। আজীবা বলে—এত উঁচুতে এত ভাল বরফ পাওয়া ভাগ্যের কথা। তাহলে কি আমরা ভাগ্যবান ?

ওরা আবার চলতে শুরু করেছে। লাথি মেরে স্টেপ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। এখন আর পথে তেমন বড ফাটল নেই। সহসা একটা দমকা হাওয়া আসায় থমকে দাঁড়াল সবাই। না, দমকা হাওয়া নয়। সব সময়েই এখানে এমনি হাওয়া চলছে। তবে এখানে ওদের দাঁড়াতে হতই। যে গিরিশিরা বেয়ে ওরা এখানে এসেছে, সেটি এখান থেকে প্রায় শ দুয়েক গজ সমতল। তারপরে সহসা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে খাড়া উঠে গিয়ে একটি বিন্দুতে মিশেছে। ঐ বিন্দুই সেই স্বপ্নশিখর।

সমতল জায়গাটুকু সহজেই পেবিয়ে এল ওরা। কিন্তু তারপর গিরিশিরাটি এত সঙ্কীর্ণ যে আর স্টেপ কাটা সম্ভব নয়। সামান্য যা নাইলন রোপ অবশিষ্ট আছে তা দিয়েই ওরা ফিক্সড রোপ কবতে লাগল। আর তর সইছে না। যেখানে উঠবে বলে দিনে সাধনা করছে, রাতে স্বপ্ন দেখছে—সেখানে ওঠার শেষ বাধা অপসারিত হচ্ছে।...কিন্তু সত্যিই কি সব বাধা সরে যাবে ? এখনও যে বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু সত্যিই সকল বাধা ধীরে ধীরে অপসারিত হল। সত্যি সত্যিই একসময়ে দড়ি ধরে ওরা একে একে উঠে এল ওপরে। স্বপ্নে-দেখা স্বপ্ন শিখরে। নীলগিরি শীর্ষে।

সবার শুভেচ্ছা সার্থক হল। আমাদের প্রচেষ্টা সফল হল। দুর্গম নীল বিজিত হল। ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথের নামের পাশে আরও একটি নাম পর্বতারোহণের ইতিহাসে যুক্ত হল—হিমালয়ান এ্যাসোসিয়েশান। উনিশ শ সাঁইত্রিশের পর উনিশ শ বাষট্টি।

ভানু ঘডি দেখল বেলা তিনটে। আজীবা গুঁডো দুধ দিয়ে ও মধু দিয়ে পুজো করল নীলগিরিকে—সকল বাধা জয় করে আমরা এসেছি তোমার কাছে।

হে সুদূর স্বপ্ন শিখর তুমি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করো।

পুজো শেষে ওরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করল—বিজয়া ও দেয়ালীর মিলিত আলিঙ্গন।

সে বিজয়ালিঙ্গনের সাক্ষী রইল ত্রিশূল, নন্দাঘুণ্টি, মানা, কামেট, চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ ও নন্দাদেবী। তবে কাছে কেউ নেই। কয়েক মাইলের মধ্যে আর এত উঁচু কোন শিখর নেই। দেখা যাচ্ছে তিব্বতও—গোলাপী রং-য়ের তিব্বত। মানস-কৈলাসের তিব্বত একদিন গোলাপের মতই পবিত্র ছিল। এখন পুণ্যার্থীদের আর সেই পবিত্র-তীর্থে প্রবেশের অধিকার নেই। গোলাপী তিব্বতের পথ আজ রক্ত পিচ্ছিল।

শিখর এতই সঙ্কীর্ণ যে সেখানে কোন রকমে একজন লোক দাঁড়াতে পারে। এক এক করে ওরা সবাই শিখরে দাঁড়িয়ে গেল। ভানু ও আং দাওয়া ক্যামেরা খুলল। জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে নিতাই নীলগিরি শিখরে জাতীয় পতাকা প্রোথিত করল। আমাদের এ্যাসোসিয়েশানের পতাকাও স্থান পেল সেই পবিত্র পতাকার পাশে। অবশেষে নীলমণি নীলগিরির শুভ্র শিখরে নিতাই একটি চুম্বন দিল এঁকে।

নীলগিরি আর বহু দূরের স্বপ্ন নয়। স্বপ্ন আজ সত্য হয়েছে। সত্য হয়ে উঠেছে সে সুন্দর ঐ নীলাকাশের মত, সত্য সে এই উজ্জ্বল দিবালোকের মত। সত্য হয়েছে সে আমাদের জীবনে—ভারতের পর্বতারোহণের ইতিহাসে।

॥ ৩১ ॥

বেস ক্যাম্প—২৭শে অক্টোবর। আজ কালীপুজো। অমূল্য বলেছিল, একসঙ্গে দেয়ালী ও বিজয়া উৎসব পালন করবে। কিন্তু কোথায় ?

চারদিন হল দেবীদাস নেই। সঙ্গে গেছে সাতজন কুলি। আশা করছি আজ বিকেল নাগাদ তারা জোশীমঠ থেকে ফিরে আসবে। দেবীদাস চলে যাবার পর দু দিন খুব ফাঁকা ফাঁকা লেগেছে। পরশুদিন বীরেন ও প্রাণেশ এ্যাডভান্স বেস থেকে নেমে এলে, ফাঁকা ভাব কিছুটা কেটেছে। তবে ওরা দুজনে মিলেও দেবীদাসের অভাব পুরোপুরি পূরণ করতে পারে নি।

কাল বিকেল থেকে আবার তুষারপাত শুরু হয়েছে। ওপরে কি হচ্ছে কে

জানে। তিন দিন কোন খবর নেই। তবে আকাশের দিকে তাকিয়ে কাল দুপুরে শের সিং হঠাৎ বলে উঠেছিল, 'আজ হোগা।' সঙ্গে সঙ্গে সিংহ পর্বত থেকে একটা ধস নেমেছিল। তার সিংহ-গর্জনে আমরা চমকে উঠেছিলাম। আর শৈলেশদা বলেছিলেন, 'সত্যি সত্যি সত্যি।'

কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে কোন খবরই নেই। কাল খবর পাঠিয়ে থাকলে এতক্ষণে···। না এখনও সময় হয় নি। সন্ধ্যের আগে খবর আসতে পারে না। ইস্, ওয়াকিটকি আনতে পারলে এই নিদারুন উৎকণ্ঠা ভোগ করতে হত না।

বাইরে আকাশ ভেঙ্গে তুষার ঝরছে। আমরা তাঁবুতে বন্দী। ভাল লাগছে না আর কিছু। ডাক্তার গান ভুলেছে। পিনাকী কাজ ভুলেছে। প্রাণেশ ডায়েরী ভুলেছে। উপেনবাবুর হাসি হারিয়ে গেছে। বীরেনের গল্প ফুরিয়ে গেছে। শৈলেশদার হিসেবে গরমিল হয়েছে। আমি একখানি বই নিয়ে বসেছি। কিন্তু পড়ায় মন বসছে না। মন যে এখন আমাতে নেই। কোথায়? যেখানে অমূল্য ভানু নিরাপদ নিতাই—সেই নীলগিরি শিখরে।

"কে?"

"কি হয়েছে?"

টলতে টলতে ধন বাহাদুর তাঁবুতে ঢুকছে। বসে পড়েছে। ভয়ানক হাঁফাচ্ছে। কি হল ওর? এল কোথা থেকে। ও তো ওপরে ছিল। কথা বলছে না কেন? কোন দুঃসংবাদ নেই তো? ধন বাহাদুর শুয়ে পড়েছে। ডাক্তার নাড়ী দেখে কি একটা ওষুধ খাইয়ে দেয়। আমরা সবাই মিলে ওর জামা থেকে বরফ ঝাড়তে থাকি। এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর ধন বাহাদুর চোখ মেলে তাকায়। পকেটে হাত দেয়। এক টুকরো জীর্ণ কাগজ বের করে আমার হাতে দিয়েই বলে ওঠে, "কাম্ ফতে হো গিয়া।"

"হো গিয়া।" সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে ওঠি। ধন বাহাদুর মাথা নাড়ে। আমি কাগজখানা খুলে ফেলি। সবাই ঝুঁকে পড়ে। ডট পেন দিয়ে লেখা। সব জায়গায় লেখা পড়ে নি। বোধ হয় ঠাণ্ডায় রিফিল্ জমে গেছে।

দু নম্বর শিবির

মহারাজ, ২৭.১০.৬২

আপনাদের শ্রম সার্থক। কাল বেলা তিনটেয়············জয় হয়েছে।

দুঃখের·····এ দিকের·····ভাল নয়।·····তিন জনের ফ্রস্ট-বাইট······

নিতাই আজীবা আং দাওয়া……।

কাল সকালে……রওনা হচ্ছি। কুলি পাঠান। অমূল্য

স্বপ্নশিখর জয় হয়েছে! আমাদের সকল শ্রম সার্থক হয়েছে! কি আনন্দ! আমরা পাগলের মত পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে থাকি। ডাক্তার গলা ছেড়ে গান শুরু করে, "তোরা সব জয়ধ্বনি কর!……অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর……"

শৈলেশদা দাঁত হাতে নাচতে শুরু করেছেন। কেন জানি না তিনি তাঁর এক পাটি নকল দাঁত খুলেছিলেন। আনন্দের আতিশয্যে সেটা লাগাতে ভুলে গেছেন। উপেনবাবু চিৎকার করে উঠলেন, "শৈলেশদা সব ঠিক আছে তো?"

"আছে আছে। সব ঠিক আছে।" শৈলেশদা নেচে চলেছেন।

বীরেন আমার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে আবার পড়তে শুরু করল। প্রাণেশ ঝুঁকে পড়ল তার পিছন থেকে। এক টুকরো জীর্ণ কাগজ, কিন্তু কত মূল্যবান। বার বার পড়েও আশ মিটছে না। পিনাকী ততক্ষণে তাঁবুর বাইরে গিয়ে চন্দ্র সিং ও কুলিদের ডাকাডাকি আরম্ভ করেছে। সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে সকলের। জীবনের শ্রেষ্ঠ লগ্ন যে সমাগত। আমাদের মন মুক্ত বিহঙ্গের মত উড়ে বেড়াতে চাইছে। নীল দুর্গম জয় হয়েছে। আমাদের জয় হয়েছে।

কিন্তু চিঠি তো শুধু আনন্দের সংবাদ বহন করে আনে নি। বিষাদের খবরও এনেছে যে। নিতাই আজীবা ও আং দাওয়ার ফ্রস্ট-বাইট হয়েছে। কেন হল? কোথায় বসে হল? কি করে হল? নিতাইকে আমরাই চিঠি লিখে তেজপুর থেকে আনিয়েছি। ওর বাবা মার কাছে আমরা কি কৈফিয়ৎ দেব? যে আজীবা সারাটা জীবন পাহাড়ে কাটাল, বরফ তাকেও দংশন করল? অভিজ্ঞ আং দাওয়ার কত আশা, সে আমেরিকান এভারেস্ট অভিযানে যাবে, তারও এই বিপদ হল? ওরা কেমন আছে? নিজেরা হেঁটে আসতে পারবে কি? যদি না পারে তাহলে…? নানা প্রশ্নে আমাদের মন আলোড়িত হচ্ছে।

ধন বাহাদুর হয়তো এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। কিন্তু কোথায়? কোন ফাঁকে সে সরে পড়েছে। নিশ্চয়ই শের সিং-য়ের কাছে গেছে। ওকে ডাকা যাক।

চন্দ্র সিং ও শের সিং এদিকেই আসছে। এক সঙ্গে আসছে। অচিন্তনীয়

ব্যাপার। শের সিং লাটু দেবীর সেবক, চন্দ্র সিং শিবের পূজারী। সে একখানা অতিকায় শিলাকে শিব বলে ঘোষণা করে নিয়মিত তার পুজোপাঠ করে যাচ্ছে। সে আমাদের পাচক। অতএব তার শিব অভুক্ত থাকেন নি। শের সিংও দমবার পাত্র নয়। সেও পাথর আর ভুজের ডাল দিয়ে একটি মন্দির তৈরী করে লাটু দেবীকে প্রতিষ্ঠা করছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সে শৈলেশদাকে লাটুদেবীর পুজো দিতে রাজী করাতে পারে নি, তবে পিনাকীর কাছ থেকে মাঝে মাঝে এক আধ ছটাক চিনি ও মধু আদায় করেছে। চন্দ্র সিং ক্রুদ্ধ হয়েছে। তার মতে—লাটু দেবীই আমাদের সব চিনি খেয়ে ফেলেছে। ফলে দুজনের বাক্যালাপ বন্ধ। আজ তারাই একসঙ্গে আসছে পরম বন্ধুর মত সহাস্য বদনে। সামনে এসেই শের সিং বলে, "কাল বোলা না? লাটু দেবীকী কৃপাসে আজ হোগা?......"

"কাল শাম্‌কো ম্যায়নে কহা থা শিউজীকী কৃপাসে ফতে জরুর হো গিয়া হোগা।"

পাছে লাটুদেবী ও শিউজীর ভক্তদের মধ্যে এই শুভক্ষণে দাঙ্গা বেধে যায়, তাই ওদের নিয়ে তাঁবুতে ঢুকি। ওদের দেখে শৈলেশদার নিজের হাতের দিকে নজর পড়ে। তিনি নাচ থামিয়ে দাঁত লাগালেন। এতক্ষণে বোধহয় খেয়াল হল যে তাঁর বয়সটা ঠিক নাচানাচির অনুকূলে নয়। ডাক্তারও গান বন্ধ করে নীরব হল। পিনাকী শের সিংকে জিজ্ঞেস করে, "তোমাকে ধন বাহাদুর সব বলেছে? কে কে ওপরে উঠেছে? কি রকম ফ্রস্ট-বাইট হয়েছে?"

"ধন তো সে সব কিছু বলতে পারে না সাব। সে ছিল দু নম্বরে। আজ সকালে লীডার সাব্ তিন নম্বর থেকে নেমে এসে বলেন—জয় হয়েছে। ঐ চিঠিখানা তিনি তাকে দেন। সে চিঠি নিয়ে সোজা ছুটে এসেছে এখানে। পথে কোথাও বসে নি। বহুত তকলিফ করেছে। এখন আর উঠতে পারছে না। ওকে কিছু ইনাম দেওয়া উচিত।"

"নিশ্চয়ই। দো রোজকা পথ এক রোজমে নামকে আয়া। লেও এই দশ রূপেয়া। উসকো দে দো।" শৈলেশদা আজ দাতা-কর্ণ।

অমূল্য কুলি পাঠাতে লিখেছে। না পাঠালে ওরা শিবির গুটিয়ে চলে আসতে পারবে না। ফলে কয়েকজনের বন্দী হয়ে থাকতে হবে। যে কজন কুলি ওদের সঙ্গে আছে, আহতদের নিয়ে তাদের কালই চলে আসতে হবে এখানে। এদিকে জোশীমঠ থেকে কুলিরা এখনও ফিরে আসছে না। বিজয় সংবাদ যে এত সমস্যার

সৃষ্টি করবে, তা কখনও ভাবি নি।

তবে আজ আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। বেশীক্ষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাতে হল না। ঠিক সন্ধ্যের সময় কুলিরা ফিরে এল। দেবীদাস ওদের সঙ্গে কিছু র‍্যাশন ও তিন বাণ্ডিল মোমবাতি পাঠিয়েছে। দূরদর্শী দেবীদাস।

প্রাণেশ প্যাকিং বাক্স ও কার্ডবোর্ড দিয়ে ছোট্ট একটি মন্দির তৈরী করল। মন্দিরে মা কালীর একখানি ছবি টাঙ্গাল। মোমবাতি দিয়ে মন্দির ও তাঁবুগুলো সাজানো হল। আশ্চর্য! এখন তুষারপাতও নেই, হাওয়াও নেই। মোমগুলো বেশ জ্বলছে। তাহলেও মোমের মিটমিটে আলোয় দেয়ালী তেমন জমছে না। তাই বরফ ঝেড়ে রুমেক্সের ডাল এনে আগুন লাগিয়ে দেয়া হল। উমাপ্রসাদ নগর আলোয় আলোময় হয়ে উঠল। মুলা সিউচাঁদ কোনদিন এত আলো দেখে নি। ডাক্তার পুজোয় বসল। মহাসমারোহে কালীপুজো হল।

কিন্তু অসম্পূর্ণ এ বিজয় উৎসব। যারা অভিযানকে সার্থক করল, তারাই যে অনুপস্থিত। জানি না কি ভাবে তাদের এখন সময় কাটছে। হয়তো শীতে অস্থির হয়ে পড়েছে। পরিশ্রমে দুর্বল হয়ে গেছে। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে আর প্রভাতের প্রহর গুনছে। আমাদের কথা ভাবছে।

মাঝ রাতে উঠতে হবে। সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু কেউই ঘুমোতে পারছি না। যার যা মনে আসছে তাই বলছে। কথার শেষ নেই। সব কথার অর্থ নেই। যার যত কথা ছিল বাকি, তা সবই বুঝি আজই উজাড় করে দেবে।

কথায় কথায় কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল করি নি। হঠাৎ টাইম পিসটায় এলার্ম বেজে ওঠে। যাক একটা বাজে তা হলে। তাড়াতাড়ি স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসি। চন্দ্র সিং-য়ের ঘুম ভাঙ্গাই। উনুন ধরানো হল। রান্না চাপল—রুটি, আলু সেদ্ধ ও হালুয়া। ওপরে পাঠানো হবে।

রান্না শেষ হতে চারটে বেজে গেল। বাইরে এখনও বেশ অন্ধকার। তা হলেও পিনাকী প্রাণেশ ও বীরেন কুলিদের নিয়ে খুলিয়াঘাটার পথে রওনা হল। কুলিরা চলে যাবে এক নম্বর শিবিরে। পিনাকীরা খুলিয়াঘাটায় অপেক্ষা করবে বিজয়ী অভিযাত্রীদের নিয়ে আসার জন্য। ডাক্তারও ওদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পিনাকী রাজী হয় নি। সাড়ে ষোল হাজার ফুট উঁচু খুলিয়াঘাটার ওপর বসে চিকিৎসা করার চাইতে আহতদের যত তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে আসতে পারা যায় ততই ভাল। তাছাড়া পথশ্রম ও শীতে ডাক্তার অযথা ক্লান্ত হয়ে

পড়লে চিকিৎসার অসুবিধা হবে।

ডাক্তারের সঙ্গে উপেনবাবু ও আমি পড়ে রইলাম উমাপ্রসাদ নগরে। কিন্তু সময় যে আর কাটতে চাইছে না। এমন উৎকণ্ঠা, এমন দুশ্চিন্তা, এমন অস্বস্তির মধ্যে আর কখনও দিন কাটে নি।

তাহলেও একসময় সূর্য পালিয়ে গেল রুপিনধরের পেছনে। দিনের আলো মিলিয়ে এল। আর দিন-রাতের সেই সন্ধিক্ষণে, যখন তাঁবুর ভেতর ঘনিয়েছে আঁধার, অথচ বাইরে তখনও মানুষ আর পাথরের পার্থক্য বোঝা যায়, তখন হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা বিরাট ছায়ামূর্তি নেমে আসছে। মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু অত লম্বা কেন? খুব আস্তে আস্তে আসছে। কে? এত লম্বা তো কেউ নেই আমাদের মধ্যে। লম্বা লোকটির পেছনে একজন স্বাভাবিক মানুষ। তার পেছনে আরেকজন। তার পরে আরও। এসেছে, ওরাই এসেছে। আমরা এগিয়ে আসি। লম্বা লোকটি একজন নয়, দুজন। কিন্তু চৈৎসিং-য়ের কাঁধে কে? ভানু না? হ্যাঁ তাই তো! ভানু কেন কাঁধে উঠেছে? তবে কি ভানুরও ফ্রস্ট-বাইট হয়েছে? অতি কষ্টে সংযত করি নিজেদের। ভানুর একখানি হাত ধরে বলি, "আর ভয় নেই। এবারে ভাল হয়ে যাবে।"

ভানু বোধহয় উত্তেজনায় কোন কথা বলতে পারে না। টলতে টলতে চৈৎ সিং এগিয়ে চলে। আমি হাতখানি ছাড়িয়ে নিই। ভানুর পেছনে পিনাকী বীরেন ও আং দাওয়া। আং দাওয়া তাহলে ভাল আছে? তাদের পেছনে পান সিংয়ের কাঁধে আং টেম্বা। সঙ্গে প্রাণেশ ছান্দু ও ছুতার। আং টেম্বার পিঠে হাত বুলিয়ে ওদের এগিয়ে যেতে বলি।

আবার একটি দীর্ঘমূর্তি। বোধহয় নিতাই কিম্বা আজীবা। নাঃ এ তো টোপগে। অমর সিং-য়ের কাঁধে টোপগে, সঙ্গে আজীবা। আজীবা ভাল আছে! চিঠি পড়ে আমরা যা ভেবেছিলাম, তার সঙ্গে তো কিছুই মিলছে না। কিন্তু নিতাই কোথায়? সে কেমন আছে? টোপগের হাত ধরে তাকেও ভরসা দিই। টোপগে কেঁদে ফেলে। কিন্তু সে কান্না ক্ষণিকের। একটু বাদেই কান্না থামিয়ে বলে, "আমার পা জ্বলে গেছে। কিন্তু নীলগিরি জয় হয়েছে।"

সবার শেষে এল অমূল্য। সফল নীলগিরি অভিযানের সার্থক নেতা অমূল্য সেন। কিন্তু আজ তার চোখেও জল। আইস এক্সে বাঁধা বিজয় পতাকাটি আমার হাতে দিয়েই সে আমাকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে থাকে। উপেনবাবু তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। তাতে সে আরও ভেঙ্গে পড়ে।

অবুঝ কণ্ঠে বলে, "আমি কি কৈফিয়ৎ দেব ? কি বলব ভানুর মাকে ? কি জবাব দেব টোপগের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের কাছে ?"

সত্যিই তো, আমরা কি কৈফিয়ৎ দেব।

ডাক্তার প্রস্তুতই ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা আরম্ভ করল। আং টেম্বার ক্ষত তেমন মারাত্মক নয়। একপায়ের দুটি আঙুল শুধু জ্বলে গেছে। ভানু ও টোপগের দু পায়েই কামড় লেগেছে। তবে টোপগের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ। কিন্তু ডাক্তার অবিচলিত। সে তার কর্তব্য করে চলেছে। সবাইকে শুইয়ে দিয়েছে। কাউকে বেশী কথা বলতে দিচ্ছে না। প্রত্যেকের পা খুলে কিছুক্ষণ ওষুধ মেশানো গরম জলে ডুবিয়ে রাখল। তারপর নতুন করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল।

তুষারের কামড়ে তিনজন আহত হলেও ওরা সকলেই অল্প বিস্তর কাহিল হয়ে পড়েছে। বরফে প্রতিফলিত সূর্যালোকে সবার মুখ ঝলসে গেছে। অথচ ঠোঁটগুলো সাদা ধবধবে—ফেটে চৌচির। সব মিলিয়ে একটা বীভৎস চেহারা। ডাক্তার ওদের প্রত্যেককেই ওষুধ খাওয়াল।

একটু বাদে চন্দ্র সিং খাবার নিয়ে এল। ওরা উঠে বসল। তারপর গোগ্রাসে গিলতে লাগল—গরম গরম পরোটা, হালুয়া ও চা। বহুদিন ওরা এমন সুস্বাদু খাবার পায় নি। আমরা আর অবাধ্য চোখের জলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি না। অথচ আশ্চর্য যাদের কথা ভেবে আমাদের চোখ জলে ভরে উঠেছে, তাদেব কিন্তু কোন কষ্ট নেই। তাদের আজ পরম আনন্দের দিন।

কথাটা প্রথম মনে হল শৈলেশদার, "নিতাই কি তোমাদের সঙ্গে আসে নি ? সে কেমন আছে ?"

"ভালই আছে তো ! সে তো খুলিয়াঘাটা পর্যন্ত আমাব সঙ্গেই ছিল।··· সত্যিই তো সে কোথায় গেল ?" অমূল্য উদ্বিগ্ন।

কোথায় গেল সে তাহলে ? বিপদের ওপর বিপদ। শ্রান্ত দেহ—ছিল সবার পেছনে। কোথাও পড়ে গেল না তো ? অথবা ভালুক বা ইয়েতি······। আর ভাবতে পারি না। ডাক্তার ও শৈলেশদাকে ভানুদের কাছে রেখে আমরা চললাম চাকুলঠেলার পথে। অদৃষ্টে কি আছে কে জানে ?

টর্চ ও আইস এক্স হাতে, চারিদিকে নজর রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। বেশীদূর নজরে আসছে না। জমাট বাঁধা আঁধার আমাদের ঘিরে ফেলেছে। তাই আমরা মাঝে মাঝে চিৎকার করছি। যদি সে কাছাকাছি কোথাও থাকে,

সাড়া দেবে। যদি তার পথ ভুল হয়ে থাকে? কিন্তু কেন ভুল হবে? এ পথ তো তার অপরিচিত নয়।

হঠাৎ বীরেন বলে ওঠে, "পিনাকীদা একটু নদীর দিকে আলোটা ধরুন তো।"

বীরেন ঠিকই দেখেছে। একজন মানুষ। নন্দাবতীর তীরে একখানি পাথরের ওপর শুয়ে আছে। হ্যাঁ, নিতাই। কিন্তু কি হয়েছে ওর? এ সময়ে এখানে এভাবে পড়ে আছে কেন? বেঁচে আছে তো? হ্যাঁ, নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

"নিতাই, নিতাই……" সমস্বরে ডাকতে থাকি। পিনাকী তাকে নাড়া দেয়।

"এ্যাঁ।"

সাড়া দিয়েছে। আমরা আবার ডাকি, "নিতাই।"

"কে?" সে উঠে বসে। দু হাতে চোখ রগড়ে নিয়ে বলে, "এ আমি কোথায়? ও, মনে পড়েছে। বহুদিন জল দেখি নি। এখানে এসে তাই বড় জল খেতে ইচ্ছে হল। জল খেয়ে ভাবলাম একটু জিরিয়ে নিই। তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।"

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে গেছে। শেরপা ও কুলিরা চলে গেছে তাদের তাঁবুতে। তবে টোপগে যায় নি ওদের সঙ্গে। তার আঘাত গুরুতর বলে ডাক্তার তাকে আমাদের তাঁবুতেই রেখে দিয়েছে। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুমুই নি আমরা। ঘুমোয় নি ভানু ও নিতাই। ভানু বলছে ওরা কেমন করে ঐ স্বপ্নশিখর জয় করেছে। বলছে—

ওরা সেদিন প্রায় আধ ঘণ্টা শিখরে ছিল। তারপর নেমে এল তিন নম্বর শিবিরে। খুব তাড়াতাড়িই নেমে আসতে হয়েছে। ভানু টোপগে ও আং টেম্বার পা ভারী হয়ে উঠেছিল। ছুতার ও পান্ সিংকে নিয়ে অমূল্য তিন নম্বর শিবিরে ওদের প্রতীক্ষায় ছিল। সে দূরবীন দিয়ে দেখেছে নীলগিরি বিজয়। দেখেছে কেমন করে ওরা উঠেছে, পতাকা পুঁতেছে, তারপর ওদের নেমে আসার একটু পরেই শিখর কালো মেঘে ঢেকে গেছে। অসীম লজ্জায় নীলগিরি তার শুভ্রসুন্দর মুখে ঘোমটা টেনে দিয়েছে। আর এক ঘণ্টা দেরি হলে স্বপ্নশিখর হয়তো স্বপ্নই থেকে যেত।

শিবিরের সামনে এসে সর্দার আজীবা অমূল্যকে পতাকা দিয়ে অভিবাদন জানাল। আত্মহারা নেতা আলিঙ্গন করল সবাইকে। কিন্তু মিলনের লগ্ন সংক্ষিপ্ত

করতে হল। ভানু টোপগে ও আং টেম্বার পা ফুলে গেছে—ফ্রস্ট-বাইট হয়েছে। অমূল্য সারা রাত জেগে রইল ওদের শিয়রে। যথাসাধ্য ওদের যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করল। পরদিন সকালে তুষারপাতের মধ্যেই ওদের নিয়ে আসা হল দু নম্বর শিবিরে। সেখানে নিরাপদ ও চঞ্চলকে শিবির গোটাবার ভার দিয়ে ওরা চলে এল এক নম্বর শিবিরে। কাল রাত সেখানেই কেটেছে ওদের। আজ খুব সকালে রওনা হয়েছে এখানে। অসাধ্য সাধন করেছে। দু দিনের পথ একদিনে এসেছে।

॥ ৩২ ॥

পরদিন সকালে ডাক্তার ওদের পরীক্ষা করে যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করতেই বলল, "আর ওদের এখানে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত। আমি আজই ওদের নিয়ে জোশীমঠ রওনা হতে চাই।"

ডাক্তার যা চায়, তা করতেই হবে। তাড়াতাডি ব্যবস্থা করে ফেলা হল। ভাগ্যিস তিনটি কাণ্ডী সঙ্গে এনেছিলাম। ঠিক হল—পালা করে টোপগেকে নিয়ে যাবে বাবুরাম ও পান সিং, টেম্বাকে অমর ও ধন বাহাদুর আর ভানুকে? চৈৎ সিং ছাডা যে আর কেউ নেই এখানে। কাল ভানুকে বয়ে আনার সময় সে স্নো ব্লাইণ্ড হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার তাকে ওষুধ দিয়েছে। কিন্তু এখনও সে ভাল করে দেখতে পারছে না। এ অবস্থায়···

ডাকা হল চৈৎ সিংকে। সামনে এসে সেলাম করল সে। ছোট খাটো হাসি খুশী ছেলেটি। মোটেই মোটা সোটা নয় বরং রোগাই বলা চলে। আমরা আদর করে চৈতা বলে ডাকি। গতকালের ধকল এখনও যেন কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কাল সে অবিশ্বাস্য কাজ করছে। ভানুর ওজন ওর নিজের ওজনের চেয়ে বেশী। সেই ভানুকে কাঁধে নিয়ে এই দুর্গম পথ পেরিয়ে সে কেমন করে এখানে এল, তা আজও বুঝতে পারছি না। আমাদের প্রস্তাব শুনে চৈতা সহাস্যে বলে, "ভবিষ্যৎ আমার ঠিক আছে সাব্। নিয়ে যাব ডিপটি সাব্‌কে। চোখটার জন্যেই যা একটু ভাবনা।"

"চোখের জন্যে ভেবো না। অসুবিধে হলেই বোলো, আমি ওষুধ লাগিয়ে

দেব।" ডাক্তার আশ্বাস দেয়।

"যো হুকুম সাব্।"

টোপগে ও টেম্বাকে নিয়ে ওরা রওনা হয়ে গেছে। শের সিং সঙ্গে গেছে। বেলা ঠিক নটার সময় রওনা হল চৈৎ সিং। ডাক্তার, বীরেন ও প্রাণেশ যাচ্ছে সঙ্গে। আমরা নন্দন-কাননের প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম ওদের। দিন সাতেক বাদেই জোশীমঠে আবার দেখা হবে। তাহলেও এ বিচ্ছেদ বড় বেশী ব্যথা দিচ্ছে। কারও মুখে কথা নেই। কোনদিন ভানুর চোখে জল দেখি নি। কাল সারারাত সে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেছে, কিন্তু কাঁদে নি। সেই ভানুর দু চোঁখেও নেমেছে আজ অশ্রুধারা।

চৈৎ সিং রওনা হল। আমরা পড়ে রইলাম পেছনে। ওরা চলল এগিয়ে পাথর ডিঙ্গিয়ে, নন্দাবতীর তীর দিয়ে। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে হাত নাড়ছে। আমরাও হাত নেড়ে উত্তর দিচ্ছি। তারপর বাঁকের মুখে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আজও রোদ ওঠে নি। তবে এতক্ষণ আব্‌হাওয়া মোটামুটি ভাল ছিল। নন্দন-কানন ছাড়িয়েই শুরু হল তুষারপাত। উৎরাই পথ। কয়েক হাত দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। তার ওপর চৈতার চোখ দুটি আবার লাল হয়ে উঠেছে। সে ঠিক মত দেখতে পাচ্ছে না। আন্দাজে আন্দাজে চলেছে। তাই পা দুটো কাঁপছে। ভানুর ভয় করছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এই বুঝি চৈতার পা ফস্কে গেল, আর দুজনে একসঙ্গে গড়িয়ে পড়ল নন্দাবতীতে।

গুহার মত একটা জায়গা দেখতে পেয়ে ডাক্তার চৈতাকে থামতে বলল। ওরা সেখানে আশ্রয় নিলে ডাক্তার চৈতার চোখে ওষুধ দিল। তারপর তুষারপাত একটু কমলে আবার চলা শুরু করল।

দেড়টা বাজে। ভেবেছিল এতক্ষণে ওরা ঘাংরিয়া পৌঁছে যাবে। সেখানে খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করে সন্ধ্যার আগেই গোবিন্দঘাট যেতে পারবে। কিন্তু তুষারপাত আর চৈতার চোখের জন্য দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে বেলা তিনটের সময় ওরা ঘাংরিয়া এল। জনহীন ঘাংরিয়া। ডাকবাংলো ও গুরুদ্বারকে প্রেতপুরীর মত মনে হচ্ছে। চৈতা পেছন দিকে ঝুঁকে ডাকবাংলোর সিঁড়ির ওপর আস্তে আস্তে বসে পড়ল। প্রাণেশ ও বীরেনের কাঁধে ভর দিয়ে, গোড়ালি দুটো মাটিতে ঠেকিয়ে ভানু একটু দাঁড়াল। এই ফাঁকে চৈতা সরে গেল। ওরা ধরাধরি করে ভানুকে শুইয়ে দিল। চৈতাও শুয়ে পড়ল। বাহক ও সওয়ার দুজনেই সমান কাহিল। কাণ্ডীতে বসে থেকে

থেকে ভানুর কোমর ব্যথা হয়ে গেছে। ডাক্তার দুজনের চিকিৎসায় লেগে গেল। বীরেন বলল, "প্রাণেশ, খাবারগুলো বের করে ফেলো।"

প্রাণেশ বীরেনের রুকস্যাকে হাত ঢোকাতে যায়। বীরেন বাধা দেয়, "না, না। আমার রুকস্যাকে নেই। তোমার কাছেই তো দেবার কথা ছিল।"

"আমাকে?" প্রাণেশ বিস্মিত, "আমাকে তো কেউ খাবার দেয় নি। বিমলদা, আপনাকে দিয়েছে কি?"

"না তো।"

খাবার তৈরী হল আর সেই খাবার সঙ্গে দিল না। তাও কি কখনও হয়? প্রাণেশ প্রতিটি রুকস্যাক পরীক্ষা করল। তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এতগুলো লোকের এত বড একটা ভুল হয়ে গেল। এই হয়। বিপদে এমনি ভাবেই মতিভ্রম হয়, কিন্তু খিদেয় যে পেট জ্বলে যাচ্ছে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে প্রাণেশের রুকস্যাকে এক শিশি জেলী পাওয়া গেল। তাই প্রসাদের মত ভাগ করা হল। জেলী ও জল খেয়ে ওরা আবার রওনা দিল।

তুষারপাত থেমে গেছে। দিনের আলো মিলিয়ে এসেছে। সন্ধ্যের একটু আগে ওরা ভুইন্দার পৌছল। ভুইন্দার এখন প্রাণহীন পাহাড়ী গ্রাম। কুকুরগুলো পর্যন্ত নেমে গেছে। হয়তো বা ভালুকরাও। নিষ্প্রাণ বাড়িগুলো শুধু নিঃশব্দে ওদের দেখছে। যাবার সময় গমগম করছিল এই গ্রাম। দেবীদাস নাচের স্কুল ডাক্তার দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছিল। এখন শীতের ভয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও রুগীরা পালিয়ে গেছে পুনগাঁয়ে।

ভানুকে নামানো হল। চৈতাব চোখে আবার ওষুধ দেওয়া হল। একটু সুস্থ হলে, সে পেটের দায়ে সারা গ্রাম চষে ফেলল। দরজা খুলে খুলে দেখল, যদি কেউ কোন খাবার ফেলে গিয়ে থাকে। কিন্তু তার খাদ্য-অভিযান বিফল হল। কিছুই পাওয়া গেল না। নিরুপায় অভিযাত্রীরা খালি পেটে খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে আবার উৎরাই ভাঙ্গা শুরু করল।

আঁধার বেশ ঘন হয়ে আসছে। চৈতা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তবু সে আস্তে আস্তে পথ চলেছে। না চলে উপায় নেই। ওরা এখন সেই ভালুকের জঙ্গল বাগডোরে। হঠাৎ চৈতা চিৎকার করে ওঠে, "সাব্। আর পারছি না। পড়ে যাচ্ছি। আমাকে ধরুন।"

তাড়াতাড়ি ভানুকে নামানো হল। চৈতা পথের ওপরই শুয়ে পড়ল। অভুক্ত ও অসুস্থ দেহে আর কতক্ষণ পারে—মানুষ তো। ডাক্তার তাকে ওষুধ

দিল। কিন্তু সে ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। ওষুধ আর কত করবে? কিন্তু এখানে এভাবে বসে থাকলে যে প্রাণ যাবে। ভালুক যদিও বা দয়া করে, শীত ছেড়ে দেবে না। ওরা সবাই থর থর করে কাঁপছে। বীরেন ভানুকে বলে, "প্রাণেশ ও চৈতার সঙ্গে একটু অপেক্ষা করুন এখানে। আমি ও ডাক্তার এগিয়ে দেখি, যদি কোন আস্তানা পাওয়া যায়।"

আহত ভানু ও অজ্ঞান চৈতাকে নিয়ে প্রাণেশ অন্ধকারে বসে রইল সেই শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে। বাতাসের গর্জন ও ঝিঁ-ঝিঁ পোকার বিরামহীন গুঞ্জনকে ছাপিয়ে সশব্দে প্রবাহিত হচ্ছে নন্দাবতী। যে শব্দকে এতদিন জীবনের জয়গান বলে মনে হয়েছে, তাকে এখন মনে হচ্ছে মরণের আহ্বান। কাছেই একটা কাঁকর মৃগ ডেকে উঠল।...ভানু ও প্রাণেশ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বসে আছে। টর্চ জ্বালতে সাহস হচ্ছে না, কথা বলতে ভরসা পাচ্ছে না, পাছে ভালুকের নেক নজরে পড়ে যায়।

রুকস্যাক পিঠে বীরেন ও ডাক্তার আশ্রয়ের অন্বেষণে বর্ষন-সিক্ত পিচ্ছিল পথে ছুটে চলে। বীরেনের হাতে আইস এক্স, ডাক্তারের হাতে রাজছত্র-ছাতা। অমূল্য বলে চেম্বারলেনের ছাতা। ছত্রহীন ডাক্তার কল্পনাতীত। ঐ ছাতা লজ্জা পেলে তার ঘোমটার কাজ করেছে তুষারপাতে মাথা বাঁচিয়েছে, আইস এক্সের অভাব পূরণ করেছে। সেই ছাতা আজ বোধহয় তার কোন কাজেই এল না। পিচ্ছিল উৎরাই। ডাক্তার প্রায়ই বেসামাল হয়ে পড়ছে। কিন্তু বীরেন যেন ক্রমেই চলার বেগ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বাধ্য হয়ে ডাক্তার বলে ওঠে, "একটু আস্তে চলো।"

"সময় নেই ডাক্তার ভানুদের ভালুকের হাতে রেখে..."

বীরেন শেষ করার আগেই ডাক্তার তাকে জড়িয়ে ধরে। কম্পিত কণ্ঠে কোনমতে বলে, "বী...রে...ন। ওটা কি?"

অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে দু জোড়া চোখ। যেন এদিকেই আসছে। এই বোধহয় লাফিয়ে পড়ল ঘাড়ে। ডাক্তার থরথর করে কাঁপছে, আর কথা বলছে না। বীরেনেরও বুক ধড়ফড় করছে। তবু সে ডাক্তারকে সজোরে একটা ঝাঁকুনি দেয়। বলে, "যাই হোক আমরা তো কাপুরুষ নই। এসো রুখে দাঁড়াই।"

"কিন্তু আমরা যে নিরস্ত্র!" ডাক্তার খানিকটা স্বাভাবিক হয়েছে।

"মোটেই নিরস্ত্র নই। এই নাও আমার আইস এক্স।"

"তুমি?"

"আমাকে টর্চটা দাও।" ডাক্তার শিথিল হাতে আইস এক্সটা ধরে। বীরেন আবার বলে, "আমি টর্চ জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে গলা ছেড়ে চেঁচাতে থাকবে।" বীরেন দু হাতে দুটি টর্চ নিয়ে একসঙ্গে বোতাম টেপে।

আর ডাক্তার, "কোই হায়? হামলোগ মর গিয়া। ভালু মর গিয়া।"

হাতে হাতে ফল ফলে। লোমশ জন্তু দুটি থমকে দাঁড়ায়। আলো তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। তারা সেখানে দাঁড়িয়েই গর্জে ওঠে, "ঘেউ ঘেউ ঘেউ।"

"বীরেন—কুকুর ভালুক নয়। কুকুর।"

"ঠিক আছে। তুমি থেমো না। চালিয়ে যাও।"

ডাক্তারের প্রাণে বল এসেছে। বুকে বল পেয়েছে। গলার জোর বেড়েছে। তার গানের গলা। রীতিমত রেওয়াজী কণ্ঠ। অমূল্য বলে—দগ্ধ কোকিলাহারী। ভুটিয়া কুকুর তার সঙ্গে পারবে কেন?

ডাক্তার ও কুকুরের এই বাদ প্রতিবাদের প্রতিযোগিতা ক্রমে চরমে উঠল। ডাক্তারের জয় যখন সুনিশ্চিত, সেই সময় তৃতীয় পক্ষের আকস্মিক আবির্ভাবে অকস্মাৎ প্রতিযোগিতা থেমে গেল। টর্চের আলোয় দেখা গেল দুজন লোক এদিকে ছুটে আসছে। থেমে যাওয়া কাঁপুনিটা আবার ডাক্তারের দেহে দেখা দিল। 'পাদমেকম্ ন গচ্ছামি' পণ করে যারা এতক্ষণ ডাক্তারের পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও আগন্তুকদের পথ ছেড়ে দিল। আরে! এযে বাবুরাম আর পান সিং। ডাক্তার হাতে স্বর্গ পেল। আইস এক্স এমন কি তার চিরসাথী ছাতাটি পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাবুরামকে জড়িয়ে ধরল। পান সিং বলল, "সামনেই একটা বকরীওয়ালার ঝোপড়ী আছে। টোপগেকে রেখে আমরা সেখানেই আপনাদের অপেক্ষায় ছিলাম। আর সব কোথায়?"

"ওরা পেছনে রয়েছে।"

"সে কী, এই জঙ্গলের মধ্যে বসে আছে?"

"হ্যাঁ। ওদের নিয়ে আসতে হবে।"

"তাহলে আর দেরী নয়। চলুন আমরা ঝোপড়ীতে যাই। তারপর ওদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে।"

জঙ্গলের শেষে ছোট্ট একটি কুঁড়ে। পেছনে একফালি ক্ষেত। কুঁড়েটি মানুষের জন্য নয়। ভেতরে গোটা বিশেক ভেড়া। বাইরে পথের ওপর টোপগেকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। পাশেই লাঠি হাতে বকরীওয়ালা ও তার দুটি ছোট ছোট ছেলে ভেড়া পাহাড়া দিচ্ছে। একটু বাদেই কুকুর দুটি এসে বকরীওয়ালার গা

ঘেঁষে বসল। এখনও ডাক্তারের রাগ পড়ে নি, "এ দোনো তোমারা কুত্তা হায় ?"

"জী হাঁ।"

"ছোড়কে কাহে রাখ্‌তা হায় ?"

"ভালুকে লিয়ে।"

"আর ভালু নহী মিলনে সে তো আদমীকো পাকড়তা হায়।"

"জী হাঁ। কভী কভী।"

পাছে ডাক্তার কিছু বেফাঁস বলে বকরীওয়ালাকে বিগড়ে দেয়, তাই বীরেন তাকে বাধা দিয়ে কাজের কথা পাড়ে। অনেক অনুরোধের পর বিশ টাকার বিনিময়ে সেই বকরী-নিবাসের একাংশে রাত্রিবাসের অনুমতি মেলে। টোপগেকে ভেতরে নিয়ে আসা হল। বকরীওয়ালা কিছু কাঠ দিল। পান সিং আগুন জ্বালালো। বাবুরাম ও বকরীওয়ালা ওদের আনতে চলে গেল। পান সিং-য়ের কাছে কিছু আলু ছিল। বকরীওয়ালার ছেলেদের কাছ থেকে বাসন ও জল নিয়ে, পান সিং তাই সেদ্ধ চাপিয়ে দিল। ডাক্তার টোপগের চিকিৎসায় মনোনিবেশ করল। বীরেন বকরী নিবাসের খানিকটা অংশ ভেড়ামুক্ত করে পরিষ্কার করে এয়ার ম্যাট্রেস বিছিয়ে শয্যা রচনা করল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ওরা ফিরে এল। বাবুরাম ভানুকে ও বকরীওয়ালা চৈতাকে বয়ে এনেছে। আগুনের ধারে বসিয়ে দেওয়া হল ওদের।

আলুর পরিমাণ খুবই কম। তারও বেশীর ভাগ খেয়ে ফেলল পান সিং ও বাবুরাম। বাবুরাম এ্যাডভান্স বেসে পাচকের কাজ করেছে। সে সাব্‌দের না খাইয়ে কোনদিন নিজে খায় নি। কিন্তু আজ খিদের জ্বালায় বোধহয় তার সাব্‌দের কথা খেয়ালই নেই। তবে খাওয়ার পরই খেয়াল হল। লজ্জা পেয়ে ছুটে গেল বাইরে। বকরীওয়ালাকে বলে তার ক্ষেত থেকে আলু তুলে আনল, কিছু রামদানাও জোগাড করল। রামদানা দেখে প্রাণেশ বলে, "বিমলদা, যাবার সময় অসুখ হবে বলে রামদানার লাড্ডু খেতে দেন নি। এখন বোধহয় আর খেতে বাধা নেই। আমরা তো জোশীমঠের মিলিটারী হাসপাতালেই যাচ্ছি।"

"না না। তুমি কিচ্ছু ভেবো না প্রাণেশ। আমি এমন ওষুধ দিয়ে দেব যে খাওয়া মাত্র হজম হয়ে যাবে।"

"সে ওষুধটা কি যাবার সময় তোমার কাছে ছিল না ডাক্তার ?" বীরেনের কথায় প্রাণেশ হেসে ওঠে।

ডাক্তারও দমবার পাত্র নয়। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, "good digestion

wait on appetite—শেক্সপিয়ারের বাণী, বুঝলে হে! খিদের নাম বাবাজী, রোগ পালায় যার ভয়ে।"

রামদানার রুটি যে এত সুস্বাদু, শরীরকে এমন গরম করে, তা জানলে কি ডাক্তার সেদিন অমন গরম হত? না হয় আজকের মতই একটি করে বড়ি খাইয়ে দিত সবাইকে। সারাদিন অভুক্ত থেকে নেহাত দৈবের কৃপায় খাওয়াটা বড়ই ভাল হল। ওরা নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ল। নিশ্চিন্ত হতে পারল না কেবল ডাক্তার। কারণ তার হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে। তার হিসেব মত এখন ওদের গোবিন্দঘাটে থাকার কথা। তাই সে মেহনত বাঁচাতে স্লিপিং ব্যাগ ও এয়ার ম্যাট্রেস আনে নি। ভেবেছিল—জশবীর সিং-য়ের একখানি কার্পেট ও কয়েকখানি কম্বল দখল করে 'সঘন ঘুমে মগন' হবে। অগত্যা বীরেন ও প্রাণেশের মাঝে শুয়ে পড়ল ডাক্তার। ওরা দুজনে দুদিক থেকে স্লিপিং ব্যাগ দিয়ে চাপা দিল তাকে। কিন্তু ঘুম এল না কারও চোখে। ভেড়ার পাল এই অনধিকার প্রবেশকারীদের বিশেষ পছন্দ করল না বোধ হয়। সমস্বরে সারারাত ধরে প্রতিবাদ জানিয়ে চলল। সেই স্বরলহরীর সঙ্গে তাদের গায়ের গন্ধ মিলিত হয়ে এমন একটি উৎকট পরিবেশের সৃষ্টি করল যে নিদ্রাদেবী আপন প্রাণের মায়ায় পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

সব মিলিয়ে বকরীওয়ালা চল্লিশটাকায় রফা করল। ভেড়ার আস্তানায় রাত্রিবাস ও রামদানার রুটির জন্য মাথা পিছু পাঁচ টাকা প্রণামী দিতে হল। কিন্তু এই প্রণামী ওদের মাথা বাঁচিয়েছে। এ আশ্রয়টুকু না পেলে আজ সকালে ওদের ধড়ে প্রাণটুকু টিঁকে থাকত কিনা সন্দেহ।

মাইল খানেক হেঁটে বেলা আটটার সময় ওরা পুনগাঁয়ে এল। ওদের দেখে গ্রামবাসীরা হৈ চৈ আরম্ভ করে দিল। একজন চায়ের দোকানদার পরম সমাদরে ওদের বসাল। একটু বাদেই ছুটে এল শের সিং। ওরাও তাহলে গোবিন্দঘাট পৌঁছতে পারে নি। টেম্বাকে নিয়ে এখানেই রাত কাটিয়েছে। সেলাম ঠুকেই শের সিং আলিঙ্গন করল ভানুকে। আবেগ ভরা স্বরে বলল, "সাব্ আপনারা এসেছেন, বেঁচে আছেন! আমরা আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কাল অনেক রাতে লোকজন নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। না পেয়ে ভাবলাম, আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না। সারারাত লাটু দেবীকে ডেকেছি তাঁর কৃপায় ভালু আপনাদের কিছুই করতে পারে নি।"

সামনেই কয়েকটা ভেড়া চরছে। টাকাপয়সার টানাটানি। পাছে আবার পুজোর প্রসঙ্গ ওঠে, তাই ভয় পেয়ে বীরেন বলে, "টেম্বাকে নিয়ে এসো। চা খেয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া যাক।"

খবর পেয়ে স্বামী অরূপকৃষ্ণ ছুটে এলেন। তিনি ভানু ও টোপগেকে হোমিওপ্যাথী ওষুধ দিলেন। জোর করে ওঁদের চা-বিস্কুটের দাম দিয়ে দিলেন। তারপর এক সঙ্গেই রওনা হলেন জোশীমঠ।

বেলা ঠিক বারোটার সময় ওরা গোবিন্দঘাট এল। জশবীর সিং ওদের দেখে ভারী খুশী হলেন। গুরুদ্বারে আশ্রয় ও ভাণ্ডারা দিলেন স্বামীজী। ভাত ডাল ও সব্‌জী রান্না করলেন। খেতে বসে ওরা পরিমাণবোধ হারিয়ে ফেলল। কিন্তু খাবারে টান পড়ল না। স্বামীজী হিসেবে ভুল করেন নি।

বিকেল চারটেয় ওরা বিষ্ণুপ্রয়াগ পৌছল। তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার বলে স্বামীজী এগিয়ে গেছেন। বিষ্ণুগঙ্গার পুল পেরিয়ে বীরেন ওদের বিশ্রাম করতে বলল। উমাপ্রসাদ নগর থেকে কাল যে উৎরাই শুরু হয়েছিল, তা আজ এখানে শেষ হয়ে গেল। যেমন করেই হোক কুলিরা আহতদের পিঠে নিয়ে এই উৎরাই পথ পেরিয়ে এসেছে। এবারে শুরু হবে চড়াই। পিঠে মানুষ নিয়ে এই চড়াই ভাঙ্গা মানুষের অসাধ্য। তাই বীরেন ছুটে চলল জোশীমঠ। যাত্রীদের পথ দিয়ে গেলে সময় বেশী লাগবে। সে পাকদণ্ডী বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। কিন্তু যত সাধ ছিল—সাধ্য ছিল না, কিছুদূর উঠেই দম ফুরিয়ে এল। তার ওপর পিপাসা। এত পিপাসা কোনদিন পায় নি তার।

কিন্তু কোথায় জল? জল পেতে হলে হয় নামতে হবে বিষ্ণুপ্রয়াগে, নয় উঠতে হবে জোশীমঠে। তাই যদি পারবে তাহলে আর এখানে বসে পড়ল কেন?

একটু জিরিয়ে নিয়ে বীরেন উঠে দাঁড়ায়। আবার চলতে শুরু করে। ঐ তো একটা ঝরনা কিন্তু জলটা বড্ড নোংরা। তা হলেও তো জল। জল মাত্রই জীবন। জীবনের আবার বাছবিচার কি?

॥ ৩৩ ॥

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পাণ্ডেজী অফিসেই ছিলেন। সব কথা শুনে তিনি বীরেনকে তাঁর জীপটি দিয়ে দিলেন। জীপ নিয়ে এসে বীরেন দেখে ওরা

সেখানে নেই। তার দেরী দেখে ওরা সেই চড়াই পথ বেয়েই শম্বুক গতিতে ওপরে উঠছে। বীরেনের হাঁক ডাকে তারা পেছন ফিরে তাকায়। তারপর মহানন্দে নেমে আসে নীচে। ধরাধরি করে আহতদের জীপে তোলা হল। চৌত্রিশ দিন বাদে আজ ওরা গাড়িতে চাপল। ঠিক একমাস পরে জোশীমঠ ফিরে চলেছে।

মানুষ সৃষ্টি করেছে যন্ত্র। সে যন্ত্র তার স্রষ্টাকে কৃতজ্ঞতার নাগপাশে আবদ্ধ করে রেখেছে। চড়াই·বেয়ে জীপ ছুটে চলেছে জোশীমঠ। কৃতজ্ঞ কুলিরা মনে মনে বীরেনকে ধন্যবাদ দিল।

জীপ এসে থামল মিলিটারী হাসপাতালের সামনে। বীরেন তাড়াতাড়ি এল মেজর উবেরয়ের কোয়ার্টারে। পর্বতারোহণের পোশাক পরিহিত পরিশ্রান্ত অস্নাত অভুক্ত বীরেনকে চিনতে একটু কষ্ট হয় তাঁর। কিন্তু চিনতে পেরেই চিৎকার করে ওঠেন, "সরকার! হোয়াট্ নিউজ? সাক্সেস্‌ফুল?"

"ইয়েস। বাট্……"

"মাই বয়!" তিনি সজোরে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। দাড়ি গোঁফময় বীরেনকে চুম্বনে অধীর করে তোলেন। বলতে থাকেন, "আমি জানতাম সরকার, আমি জানতাম তোমরা পারবে। আমি জানতাম, নীলগিরিকে এবার পরাজয় স্বীকার করতেই হবে।"

তাঁর উচ্ছ্বাস একটু স্তিমিত হলে বীরেন তাঁকে ভানুদের কথা জানায়। মেজর তাড়াতাড়ি বীরেনকে ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "তারা কোথায়?"

"হাসপাতালের সামনে জীপে বসে আছে।"

"আর তুমি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ? চলো শিগ্‌গীর চলো।" বীরেনকে একরকম টেনে নিয়ে তিনি ছুটতে থাকেন।

মেজরকে দেখেই ওদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তিনি কাছে এসে ভানু টোপগে ও আং টেম্বার পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে থাকেন, "ওয়েল্-ডান্ মাই বয়েজ। ডোণ্ট ওয়ারী। সব ঠিক হো জায়গা।" তার পরে চিৎকারে হাসপাতাল কাঁপিয়ে তোলেন। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ক্যাপ্টেন (ডাক্তার) রায় তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ছুটে আসেন সেখানে। তাঁকে দেখে মেজর আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, "রয়, আমি বলি নি? এরা পারবে। তবে নীলগিরিও এদের মরণ কামড় দিয়েছে। তিন জনের ফ্রস্ট-বাইট। তুমি তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করো। এই, তোমরা হাঁ করে কি দেখছ! স্ট্রেচার নিয়ে

এসো।" তারপরেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন।

বিমলের সহযোগিতায় ক্যাপ্টেন রায় ওদের পরীক্ষা শুরু করেন। এমন সময় মেজর ফিরে এলেন। সঙ্গে খাবার সহ দুজন আর্দালী। ক্যাপ্টেন তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, "তুমি তো শুধু রোগের খবর নিয়েই খুশী থাকবে, পেটের খবর নেবে না। তাই আমি ওদের জন্ম খাবার নিয়ে এলাম।" তারপরেই বীরেনকে বলেন, "এসো সরকার। আমরা ওদের খাইয়ে দিই।"

"একটু সবুর করুন। আমি আগে পরীক্ষাটা সেরে নিই।" ক্যাপ্টেন অনুরোধ করেন।

"বেশ তো তুমি তোমার কাজ করে যাও। ওরা তো পা দিয়ে খাচ্ছে না। পরীক্ষা ও খাওয়া একই সঙ্গে চলুক। ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারছ না—ওরা খিদেয় অস্থির হয়ে পড়েছে?"

বিমল ক্যাপ্টেন রায়ের সঙ্গে হাসপাতালেই থাকল। বীরেন ও প্রাণেশ এল বিড়লা রেস্ট হাউসে। রাত তখন অনেক হয়েছে। রেস্ট হাউস প্রায় নিঝুম। বহু কষ্টে ওরা দেবীদাসের ঘর খুঁজে পেল। দেবীদাস ঘুমিয়ে পড়েছে। বেশ কয়েকবার দরজায় ধাক্কা দেবার পর তার নাসিকা গর্জন স্তব্ধ হল। সাড়া পাওয়া গেল, "কৌন হায়?"

"বীরেন হায়। দরজা খুলুন।"

"এ্যাঁ। কে?"

"দরজা খুলুন দেবীদা। আমি প্রাণেশ।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খোলে দেবীদাস, "তোমরা এ সময়? কি খবর?"

"কেল্লা ফতে।" বীরেন বলে।

"এ্যাঁ? সাক্‌সেস্‌ফুল?"

"হ্যাঁ।"

"সাক্‌সেস্‌ফুল। জয় হয়েছে। আমাদের জয় হয়েছে। জয় হয়েছে রে।" দেবীদাস সঙ্গীত সহযোগে নৃত্য শুরু করে। নিস্তব্ধ রেস্ট-হাউস সেই প্রলয় নাচনে চমকে ওঠে। পাছে রেস্ট-হাউসবাসী জওয়ানরা দেবীদাসের মস্তিকের সুস্থতা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়ে বন্দুক হাতে ছুটে আসে, তাই বীরেন তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিল।

মিনিট দশেক দ্রুত লয়ে নেচে গেয়ে ক্লান্ত হয়ে দেবীদাস হাঁফাতে হাঁফাতে প্রশ্ন করে, "কি করে হল? কবে হল? আরে সব খুলে বল না ছাই।"

সব শুনে গম্ভীর হয়ে যায় দেবীদাস। বলে, "চলো তাহলে এখনই একবার হাসপাতাল থেকে ঘুরে আসি।"

"এত রাতে!" প্রাণেশ বিস্মিত হয়।

"কি আর এমন রাত হয়েছে।" ঘড়ি দেখে দেবীদাস, "মোটে তো এগারোটা। কতক্ষণ লাগবে ঘুরে আসতে?"

"কিন্তু ক্যাপ্টেন রায় ওদের বিরক্ত করতে নিষেধ করেছেন। ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন।" বীরেন বলে।

"ও!" দেবীদাস মুষড়ে পড়ে।

"আমরা বড় পরিশ্রান্ত দেবীদা। আর খিদেও পেয়েছে খুব।"

"কেন তোমরা খাও নি?"

"না মেজর তাঁর কোয়ার্টারে নেমন্তন্ন করেছিলেন। কিন্তু এই অসময়ে আমরা আর তাঁকে বিরক্ত করি নি।"

"তা সে কথা আগে বলতে হয়। যাও তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নাও।"

"আছে নাকি কিছু?" প্রাণেশ আশান্বিত হয়।

"আছে হে আছে। দেবীদা আছে অথচ খাবার নেই, এ কোনদিন হয়েছে?" দেবীদাস তার রাজকোষ উন্মুক্ত করে দেয়। একে একে বের করে বিস্কুট জেলী আপেল কমলা লেবু কলা চিঁড়ে চিনি—যথের ধন। অন্য সময় তার এই গুপ্তভাণ্ডারের দিকে তাকালেও সে ক্ষেপে যেত। কিন্তু আজ? আজ দেবীদাস গৌরী সেন, "যেটা ইচ্ছে, যত ইচ্ছে—খেয়ে যাও। আরও লাগে আরও দেব।"

বীরেন ও প্রাণেশের রুকস্যাক থেকে এয়ার ম্যাট্রেস ও স্লিপিং ব্যাগ বের করে ঠিকঠাক করে ফেলে দেবীদাস। তারপর ওদের খাওয়া হলে বলে, "এবারে শুয়ে পড়ো। কষে ঘুম দাও।"

ওরা দ্বিরুক্তি না করে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ে। কিন্তু দেবীদাস থালা ও মগ গুছিয়ে রেখে হাত ধুয়ে আলোর কাছে গিয়ে বসে। বীরেন জিজ্ঞেস করে, "আপনি শোবেন না?"

"শোব বইকি। তবে একটু দেরী হবে। আমার একটা কাজ আছে। আপনারা ঘুমিয়ে পড়ুন।"

"এত রাতে আবার কি কাজ দেবীদা? কাল করবেন এখন।"

"না না প্রাণেশ। তুমি বুঝতে পারছ না। এখনই শেষ করে ফেলতে হবে।"

"কি এমন জরুরী কাজ?" প্রাণেশ চিন্তিত।

দেবীদাস কথা না বাড়িয়ে কতগুলো কাটা কাগজ, আঠার শিশি ও 'Nilgiri (Garhwal) Expedition 1962' ফেস্টুনটা বের করে ফেলেছে। বীরেন বলে, "এত রাতে আবার ওগুলো নিয়ে বসলেন কেন?"

"বাঃ। কাগজ কেটে Successful শব্দটা লিখে রেখেছি, সেটা ফেস্টুনে লাগাব না?"

"কিন্তু ওটা তো কাল সকালে করলেও চলত।"

"চলত না প্রাণেশ! চলত না। কাল সকালে হাসপাতালে যাবার আগেই ফেস্টুনটা রেস্ট হাউসের গেটে টাঙ্গিয়ে দিতে হবে।"

দেবীদাসকে তার জরুরী কাজ থেকে নিরস্ত করা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে বীরেন ও প্রাণেশ পাশ ফিরে শোয়। চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে থাকে। আর দেবীদাস তার কাঁচা ঘুমের মায়া ত্যাগ করে, প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে, সেই নিশুতি রাতে, মোমের মৃদু আলোয়, নিঃশব্দে তার জরুরী কাজ সারতে থাকে। তার 'Successful' শব্দের এক একটি বর্ণে আঠা লাগিয়ে পরম যত্ন-সহকারে ফেস্টুনে সাঁটতে থাকে। প্রতিবার অপত্য স্নেহে অপলক নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তার চোখ-মুখ খুশীর আলোয় ঝলমল করে ওঠে। উজ্জ্বল সূর্যালোকে নীলগিরি শিখরও বোধকরি এত ঝলমল করে নি কোনদিন।

দেবীদাসের ডাকে বীরেন ও প্রাণেশের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তার এক হাতে দুধ আর এক হাতে চা। সে ইতিমধ্যে ফেস্টুন টাঙ্গিয়ে নিজের জন্য দুধ ও ওদের জন্য চা নিয়ে এসেছে।

তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে ওরা পথে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু দেবীদাসের জন্য কি তাডাতাড়ি চলার জো আছে? লোক দেখলেই সে চিৎকার করে উঠছে, 'কেল্লা ফতে হো গিয়া। হুর্ রো হো! হুর্ রো হো!' মুখ চেনা কাউকে পেলে তো কথাই নেই। নিজেদের গৌরবের কথা গোড়া থেকে বর্ণনা করছে। বাধ্য হয়ে বিনীত কণ্ঠে প্রাণেশ বলে, "দেবীদা, ওদিকে ওরা আমাদের পথ চেয়ে বসে আছেন।"

"ওঃ হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম। চলো, তাড়াতাড়ি চলো।" তারপর তার মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতাদের আশ্বাস দেয়, "দুপুরে রেস্ট হাউসে আসুন ডিটেল্‌স্ শুনে যাবেন।"

হাসপাতালের গেটে বিমলের সঙ্গে দেখা। সে ওদেরই অপেক্ষায় পায়চারী

করছিল। দেখে মনে হচ্ছে এখনও হিমরেখার ওপরে। আজও সে পর্বতারোহণের পোশাক ছাড়ে নি। অদূর ভবিষ্যতে বোধ করি ছাড়ার কোন ইচ্ছেও নেই। কাছে আসতেই বলে ওঠে, "আজই কলকাতা রওনা হতে হবে।"

"কেন?" দেবীদাস চমকে ওঠে।

"টোপগের পায়ের অবস্থা খুব খারাপ। আমি ওকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাই। ভানুও কলকাতায় যেতে চাইছে।"

"ক্যাপ্টেন রায় কি বলছেন?" বীরেন জিজ্ঞেস করে।

"তাকে আমি রাজী করিয়েছি।"

"কিন্তু কেমন করে যাবে? আমাকে যে মোটে একশ টাকা দিয়েছে। তার প্রায় অর্ধেক খরচ হয়ে গেছে।" বীরেন চিন্তিত।

"এত কম টাকা দিল কেন?" দেবীদাস বিরক্ত।

"তাড়াতাড়িতে তখন কি দিয়ে কি হবে কিছুই খেয়াল ছিল না। তাছাড়া শৈলেশদা ও পিনাকীদা তো ক্যাম্প গুটিয়ে দু তিন দিনের মধ্যেই এখানে চলে আসবেন। তখন তো বুঝি নি যে আমাদের আজই কলকাতা রওনা হতে হবে।"

"কিন্তু এখন কি করবেন? আমার কাছে যা আছে তাতে বড়জোর টেলিগ্রাম ও চিঠিগুলো পাঠানো যেতে পারে। ওঁদের নিয়ে যাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। বাস রিজার্ভ করতে হবে। সে তো বহু টাকার ব্যাপার।"

"যোগাড় করতে হবে।" প্রাণেশের কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়।

"কে এখানে তোমাকে টাকা দেবে?"

"কেন? মেজরের কাছ থেকে ধার নেব। শৈলেশদা এলে শোধ করে দেব।"

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ধার করতে হল না। ভানু বীরেনকে বলল, "আমার কাছে কিছু টাকা ও দুখানা রেলের টিকিট আছে। আপনারও পাশ আছে। মেজর একখানি গাড়ি দিতে চেয়েছেন।"

"গাড়ি?"

"হ্যাঁ। মিলিটারী ট্রাক। তিনি সেই খোঁজেই বেরিয়েছেন।"

বলতে বলতেই ঝড়ের বেগে মেজর হাজির হলেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "তোমরা ভাগ্যবান। একখানা বাড়তি গাড়ি পাওয়া গেছে। তোমাদের একেবারে ঋষিকেশ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। ঠিক এগারোটার সময় গাড়ি চলে আসবে।"

গাড়ি সময় মতই এল। কিন্তু ওরা তখন সবে খেতে বসেছে। ওদের ব্যস্ত

হতে দেখে মেজর তিরস্কার করেন, "অত তাড়াহুড়ো করছ কেন? পেট ভরে খেয়ে নাও। এর পরে আবার কোথায় খেতে পাবে কে জানে?"

সহকর্মীদের সঙ্গে মেজর নিজ হাতে মালপত্র তুলে দিলেন। কোলে করে আহতদের এনে গাড়িতে শুইয়ে দিলেন। বার বার বললেন, পথে কোন অসুবিধায় পড়লে তারা যেন তাঁকে ফোন করে। ড্রাইভারকে আদেশ দিলেন, "সাহেবরা যখন চালাতে বলবেন তখনই গাড়ি চালাবে। যেমন করে হোক, কাল বিকেলে এঁদের ঋষিকেশ পৌঁছে দেবেই। দরকার হলে গেটের নিয়ম অমান্য করবে।"

বিদায়ী অভিযাত্রীদের সঙ্গে একে একে করমর্দন করলেন মেজর, ক্যাপ্টেন রায়, দেবীদাস, প্রাণেশ ও উপস্থিত শুভানুধ্যায়ীরা। করমর্দন করল শের সিং, চৈৎ সিং, পান সিং, ধন বাহাদুর, বাবুরাম ও অমর। নিজেদের জীবন বিপন্ন করে, বিপদসঙ্কুল পথ পেরিয়ে, যাদের নিরাপদে নিয়ে এসেছে—তারা আজ চিরতরে বিদায় নিচ্ছে। দুর্গম পথে যারা ওদের হাতে নিজেদের সঁপে দেয়, তারা সবাই এমনি ভাবেই একদিন বিদায় নেয়। এই তো নিয়ম। তাহলে ওদের চোখে জল কেন? তবে কি টাকাপয়সার সম্পর্ক ছাড়িয়ে ওদের মাঝে অন্য কোন সম্পর্ক ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছিল? একটু মায়া, একটু মমতা, একটু ভালবাসা অঙ্কুরিত হয়েছিল মনে?

গাড়ি গর্জে ওঠে। প্রাণেশ ও দেবীদাসের চোখে জল ঝরে। মেজর সান্ত্বনা দেন, "তোমরা কাঁদছ কেন? তোমাদের সঙ্গে তো কদিন পরেই দেখা হবে। আমাদের কথা ভাবো তো। তবু দেখো আমি কেমন হাসিমুখে ওদের বিদায় দিচ্ছি।" বলেই টের পেলেন অবাধ্য অশ্রু তাঁরও গাল বেয়ে নেমে এসেছে। তাড়াতাড়ি চোখ দুটি মুছে, মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।

আর যারা বিজয় গৌরবে ফিরে চলেছে ঘরে? তাদেরও মনের আকাশে বর্ষা নেমে এসেছে। কখন কান্না এসে জুড়ে বসবে, তা কি কেউ আগের থেকে বুঝতে পারে?

অনেক স্মৃতিই নাকি বিস্মৃতির অতলান্ত অন্ধকারে হারিয়ে যায়। কিন্তু এই বেদনা-মধুর বিদায় লগ্নটি? আর ঐ অনাত্মীয় মানুষ কটি? ওরা কি কোনদিন বিস্মৃত হবে? না, এই স্মৃতি যে ওদের অন্তরের অন্তস্তলে অক্ষয় আসন পেতে নিল।

বেলাকুচীতে এসে গাড়ি অচল হল। ধস নেমেছে। দু ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়ে গেল। ফলে চামোলী পেঁছুতে রাত দশটা বাজল। কিন্তু ওদের ভাগ্য ভাল। একটি হোটেল তখনও বন্ধ হয় নি। সেখানে খেয়ে নিয়ে গাড়িতে বসেই রাত কাটাল ওরা।

সকালে খবর পেল এগারোটায় গেট। সর্বনাশ! তাহলে তো আজও ঋষিকেশে পেঁছতে পারবে না! ডাক্তার তার বিচিত্র পোশাক পরেই গেটম্যানের কাছে ছুটল। পাছে গেটম্যান ঘাবড়ে যায়, তাই বীরেনও তার পিছু নিল। মেজরের হুকুম শুনে গেটম্যান সভয়ে গেট খুলে দিল। আটটার সময় গাড়ি ছাড়ল।

রাস্তা খুবই খারাপ। ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে গাড়ি চলেছে। কর্ণপ্রয়াগ পেঁছতে দুপুর গড়িয়ে গেল। একটু জিরিয়ে নিয়ে ক্রমবর্ধমান জনতাকে অসীম কৌতূহলের মধ্যে নিমজ্জিত রেখে ওরা আবার রওনা হল।

সন্ধ্যার একটু আগে রুদ্রপ্রয়াগ এল। চায়ের আশায় বীরেন ও ডাক্তার গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। ডাক্তার কিন্তু এখনও পর্বতারোহণের পোশাক ছাড়ে নি। তেরো হাজার সাতশ থেকে দু হাজার ফুটে নেমে এসেও তার নাকি শীত কমে নি। ফলে ডাক্তার বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একদল লোক গাড়িখানাকে ঘিরে ফেলেছে। ডাক্তার ক্ষেপে গিয়ে বলে, "এই তোমলোগ্ কা দেখ্তা হায়? সার্কাস মিলা?"

"জরুর। ইসি লিয়ে তো আয়া। তুম্হি তো জোকার হো।" জনতার মধ্য থেকে জনৈক সবজান্তা মন্তব্য করে। ডাক্তার আরও রেগে যায়। সে তার চিরসাথী ছাতি নিতে হাত বাড়ায়। বীরেন বাধা দিলে ডাক্তার গজরাতে থাকে।

এমন সময় একজন পুলিস এসে সেলাম ঠোকে, সসম্ভ্রমে বলে, "মেহেরবানি করে যদি আপনারা আমার সঙ্গে আসেন তাহলে বড় ভাল হয়। দারোগা সাহেব আপনাদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাইছেন।"

ডাক্তারের বুক ফুলে ওঠে। উষ্মা অন্তর্হিত হয়। প্রফুল্ল চিত্তে বীরেনকে বলে, "চলো ঘুরে আসা যাক। একটু খাতির-টাতির করবে আর কি। সুবিধেই হবে।" পুলিসের বদলে ডাক্তারই চিন্তিত বীরেনকে ফাঁড়ির পথে টেনে নিয়ে চলে।

সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গম্ভীর স্বরে দারোগা বলেন, "আপনাদের পরিচয়-পত্র দেখি।"

"পরিচয়-পত্র!" বীরেন বিস্মিত হয়, "আমরা ভারতীয়। আমাদের তো কোন পরিচয়-পত্রের প্রয়োজন নেই।"

"প্রয়োজন আছে কি না, তা কি আপনাদের কাছে শিখতে হবে নাকি?" দারোগা রেগে যান, "আছে কি না তাই বলুন।"

"নেই।" বীরেন বিরক্ত হয়।

"তাহলে আমি আপনাদের এ্যারেস্ট করতে বাধ্য হলাম।"

"এ্যারেস্ট!" ডাক্তারের গলা সপ্তমে চড়ে, "এ্যারেস্ট করবেন কেন? আমরা কি চোর না ডাকাত?"

"আপনারা স্পাই।"

"স্পাই! আপনার স্ক্রু ঢিলে আছে।"

"কি বলছেন?" দারোগা বুঝতে পারেন না।

"আপনাকে কে চাকরী দিল?"

"তা জেনে আপনার লাভ?"

এভাবে চললে কোথাকার জল কোথায় গড়ায় ঠিক নেই বুঝতে পেরে, বীরেন শান্ত কণ্ঠে দারোগাকে জিজ্ঞেস করে, "আমরা স্পাই, এ খবর আপনি কোথায় পেলেন?"

"আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া? তখনই জানতাম তোমাদের এই পথেই সটকাতে হবে। তাই তো খবর পেয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছি।"

"কি খবর পেয়েছেন?"

"একদল চীনে গুপ্তচর সীমান্ত পেরুবার সময় জওয়ানদের নজরে পড়ে যায়। তাঁরা গুলি করে তিনজন গুপ্তচরকে আহত করেন, কিন্তু ধরতে পারেন না। তোমরা সেই ফেরারী চর।"

"কিন্তু আমরা তো ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়িতে করে যাচ্ছি।"

"হ্যা! গাড়ি চুরির খবরটা এখনও এসে পৌঁছয় নি। তবে এসে যাবে।" দারোগা তার সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ।

"কিন্তু আমাদের সঙ্গে তো কোন চীনে নেই!" বীরেন শেষ চেষ্টা করে।

"নেই, না?" দারোগা একটু হাসেন, "ঐ যে তিনটা লোক গাড়িতে শুয়ে আছে তার দুটোই তো চীনে। আর এই লোকটা?" দারোগা ডাক্তারকে দেখিয়ে দেয়।

"আমি চীনে ?" ডাক্তার আর কিছু বলতে পারে না। সে রাগে কাঁপছে।

বীরেন বলে, "আপনার এখানে টেলিফোন আছে ? আমি একবার জোশীমঠের বেস কমাণ্ডার মেজর উবেরয়ের সঙ্গে কথা বলব।"

"মেজর উবেরয় !" দারোগা অবাক হয়।

"হ্যাঁ তিনিই আমাদের এই গাড়ি দিয়েছেন। আপনি জানেন আমরা কে ?" ডাক্তার প্রশ্ন করে।

"কে ?" দারোগা যেন নিজের সিদ্ধান্তে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন।

"আমরা নীলগিরি পর্বত বিজয়ী। খবরের কাগজ টাগজ পড়েন ? নীলগিরি অভিযানের কথা শুনেছেন ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুনেছি। আপানারা......"

"আমরাই তারা। আমি ডক্টর বিমল ঘোষাল, এম বি বি এস। হাউস সার্জন, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হসপিট্যাল, ভবানীপুর, ক্যালকাটা। আর ইনি বিখ্যাত মাউণ্টেনিয়ার বীরেন সরকার। অথার..."

"ছেড়ে দাও ডাক্তার। উনি সন্দেহ বশে আমাদের ডাকিয়ে এনেছিলেন। আমাদের মাতৃভুমির নিরাপত্তার জন্যই ওঁকে এসব করতে হয়েছে।"

"ঠিকই বলেছেন মিস্টার সরকার। আমি সত্যিই বড় লজ্জিত।"

"আচ্ছা, আমরা তাহলে চলি।" বীরেন পেছন ফেরে।

"না না, সেকি ? বসুন। আরে তাই তো—আপনাদের যে বসতেই বলা হয় নি। এই হাবিলদার ! ছ গেলাস্ চা বল। তিন গেলাস গাড়িতে দেবে, তিন গেলাস এখানে। আর সাহেবদের গাড়ির কাছে ভীড় সরাতে একজন কন্সটেব্‌ল পাঠিয়ে দাও।"

"তাহলে খবরটা বেশ রটেই গেছে। আর তাই বোধ হয় কর্ণপ্রয়াগ থেকেই আমাদের পেছনে লোক লেগেছে।"

"জী। তবে হয়তো এতটা হত না।" দারোগা ডাক্তারের দিকে তাকান।

"কেন এতটা হল ?" ডাক্তার কৌতূহলী হয়ে পড়েছে। দারোগা কি যেন বলতে গিয়েও চুপ করে থাকেন। ডাক্তার আবার জিজ্ঞেস করে, "বলতে কোন বাধা আছে কি ?"

"মানে, আপনি কিছু মনে না করলে......"

"মনে করার কি আছে ? বলুন না।" ডাক্তার দিলদরিয়া ভাবে অনুমতি দেয়।

"মানে, আপনার এই পোশাকটাই যত গোলমাল বাধিয়েছে।" প্রাণখুলে হাসতে থাকেন দারোগা। বীরেন তার সঙ্গে যোগ দেয়। ডাক্তার লজ্জায় মুখ লুকোতে পারলে বাঁচে তখন। কিন্তু হায়, চিরসাথী সেই ছাতি এখন কোথায়?

রাত্রি বেলা রুদ্রপ্রয়াগেই থাকতে হয়েছিল ওদের। তবে কোন অসুবিধে হয় নি। পুলিশী ব্যবস্থায় রাতটা ওদের আরামেই কেটেছে। গেটের নিয়ম না মেনে, খুব সকালে ওরা রুদ্রপ্রয়াগ থেকে গাড়ি ছেড়েছে। কিন্তু এগোতে পারে নি বেশীদূর। রাস্তা খারাপ বলে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। এভাবে চললে আজও ঋষিকেশ পৌছনো যাবে কিনা সন্দেহ। ড্রাইভার যদিও ভরসা দিচ্ছে—সে আজ ওদের রেলে চাপিয়ে দেবেই।

শ্রীনগর থেকে ভাল রাস্তা পাওয়া গেল। আর পেয়েই ড্রাইভার এ্যাকসিলেটারে জোরে চাপ দিল। তীব্র বেগে গাড়ি ছুটল। গাড়ির গতি বাড়াবার জন্য সকাল থেকে ডাক্তার কি না করেছে? রাগারাগি থেকে খোশামুদি করেছে ড্রাইভারকে। এখনও তাই করছে। তবে এখন গতি বাড়াবার জন্য নয়, কমাবার জন্য। পাছে এই গতি দুর্গতির কারণ হয়, তাই বলছে, "এত্ না জোরসে মাত্ চালাইয়ে। গিরনেসে……।" দুর্জ্ঞেয় বিমলশ্চরিত্রম।

ধর্মপ্রাণ ডাক্তারের নিবেদনে ড্রাইভার কর্ণপাত করে নি। কিন্তু ভগবান তাঁর ভক্তের আবেদন মঞ্জুর না করে পারলেন না। ব্যাসীর কাছে এসে গাড়ির গতি রুদ্ধ হল। পথ বন্ধ। সামনে একটি মিলিটারী ট্রাক বিকল হয়েছে। ডাক্তার কপালে করাঘাত করে। সে তো একেবারে অচল হতে চায় নি। তাই অস্থির ভাবে বার বার ঘড়ি দেখে আর ঈশ্বরে শরণ নেয়।

দেড়ঘণ্টা অধীর প্রতীক্ষার পর মিলিটারী ট্রাক সচল হল। ওরাও রওনা হল। আবার তেমনি জোরে গাড়ি চলল। এবারে কিন্তু ডাক্তার নির্বাক। সে নিমীলিত নয়নে ধ্যান-মগ্ন হয়ে রইল।

বাহাদুর ড্রাইভার। তার জবান রেখেছে। ওরা ঋষিকেশ স্টেশনে পৌছে গেছে। এখনও আধ ঘণ্টা হাতে আছে। বীরেন ও ডাক্তার নিজেরাই ধরাধরি করে ভাদুদের গাড়িতে ওঠাল। ড্রাইভার তাদের সাহায্য করল। তারপর রেল ছাড়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল প্ল্যাটফর্মে। হাত নেড়ে পরম স্নেহে ওদের বিদায় দিল। ওরা চলল হরিদ্বার।

হরিদ্বারেও রিজার্ভেশান পাওয়া গেল না। বীরেন ও ডাক্তার চিন্তায় পড়ল।

স্টেশনে যা ভীড়, তাতে সাধারণ কামরায় বসবার জায়গাই পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ভানু টোপগে ও টেম্বা পা ঝুলিয়ে বসতে পারছে না। শোবার জায়গা না পেলে ওদের পক্ষে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। ঠিক হল রিজার্ভেশান ছাড়াই ওরা স্লিপার কোচে উঠে পড়বে। তারপরে যা হয় হবে।

তাই করা হল। ট্রেন আসতেই মরীয়া হয়ে ভীড় ঠেলে ওরা উঠে পড়ল স্লিপার কোচে। ভানুদের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখে কণ্ডাক্টার বাধা দিলেন না। তবে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের রিজার্ভেশান আছে তো?"

ডাক্তার ইশারায় বীরেনকে দেখিয়ে দিল। আর বীরেন মালপত্র তোলার অছিলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওরা নির্বিঘ্নে গাড়িতে উঠল। তারপর ধীরে সুস্থে বীরেন কণ্ডাক্টারকে জানাল, "আমাদের কোন রিজার্ভেশান নেই। আমরা নীলগিরি জয় করে ফিরছি। সঙ্গে তিনজন তুষারাহত অভিযাত্রী।"

চিন্তিত কণ্ডাক্টার চুপ করে থাকেন। আশে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েক-জন যাত্রীর কানে কথাটা যায়। তাঁদের মধ্য থেকে একজন কণ্ডাক্টারকে বলেন, "আমি এস. রানা। আমাব তিনটি বার্থ আছে। তার দুটি আপনি এদের দিয়ে দিন।"

বীরেন অবাক-বিস্ময়ে নেপালী ভদ্রলোকের দিকে তাকায়। ভদ্রলোক তাকে বলেন, "আসুন আমরা এঁদের বার্থে শুইয়ে দিই।"

কৃতজ্ঞ ডাক্তার ভদ্রলোকের একখানি হাত দু হাতে চেপে ধরে অভিভূত কণ্ঠে বলে, "ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।"

কিন্তু মিস্টার রানা কিছু বলতে পারার আগেই, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বলে ওঠেন, "আমি মিস্টার সিং। আমার দুটি বার্থের একটি এঁদের দিয়ে দিচ্ছি।"

"আমিও একটা বার্থ ছেড়ে দিলাম। আমার নাম বি. পাণ্ডে।"

"কিন্তু আপনাদের যে কষ্ট হবে।" বীরেন লজ্জিত হয়।

"আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন। আমরা না হয় এটুকু কষ্ট করলাম।" মিস্টার রানা বীরেনের লজ্জা ভাঙতে চান।

পাণ্ডেজী বলেন, "আপনাদের কথা, কাগজে পড়েছি। আমাদের সৌভাগ্য যে আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।"

"আর দেরী নয়। ওঁদের এভাবে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। চলুন আমরা ওঁদের জায়গামত নিয়ে যাই।" মিস্টার সিং ভানুদের কাছে এগিয়ে আসেন।

পাণ্ডেজী ও মিস্টার রানা তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে যান।

বাধা দেন কণ্ডাক্টার, "আপনারা একটু অপেক্ষা করুন স্যার। দেখি আমি কি করতে পারি।" তিনি কাগজপত্র খুলে বসলেন। একটু বাদে বীরেনকে বলেন, "দেখি আপনাদের টিকিটগুলো।" বীরেনের হাত থেকে সেগুলো নিয়েই কণ্ডাক্টার বলে ওঠেন, "এই পাশটা কার?"

"আমার।" বীরেন বলে।

"আপনি রেলের কর্মচারী?"

অনেক অনুনয় বিনয় ও অদল বদল করে কণ্ডাক্টার একজায়গাতেই পাঁচখানি বার্থ খালি করে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত মিস্টার রানা, মিস্টার সিং ও পাণ্ডেজীকে আর নিজেদের বার্থ ছাড়তে হল না। তবে তাঁরা যেভাবে সম্ভব ওদের সাহায্য করে চলেছেন। ভানুদের ধরাধরি করে নিয়ে এসেছেন, বিছানা করে শুইয়ে দিয়েছেন, খাবার কিনে খাইয়েছেন। কণ্ডাক্টারও কম করেন নি। বীরেন রিজার্ভেশানের চার্জ দিতে গেলে হাত জোড করে বলেছেন, "আমি সামান্য মানুষ। আপনাদের সাহায্য করার সামর্থ্য বা সাহস কোনটাই আমার নেই। তবু এই সামান্য কটা পয়সা আমি নিজের থেকেই দিয়ে দিয়েছি। ওটা ফেরত দিয়ে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।"

পরদিন লখ্‌নৌ স্টেশনে খবরের কাগজ পাওয়া গেল। নিয়ে এলেন মিস্টার রানা। আজও কাগজে নীলগিরি বিজয়ের কথা বেরিয়েছে। ওদের তিনজনের তুষারাহত হবার খবরও আছে। পাণ্ডেজী পরমানন্দে সেই সংবাদ পড়ে শোনালেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল ওরা। ওদের গৌরবে আজ সারা ভারত গর্বিত। ওরা সকল কষ্ট ভুলে গেল। ওদের সকল যন্ত্রণার অবসান হল।

আর এই ফাঁকে কথাটা রটে গেল সারা কামরায়। এ কামরায় বাঙালীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁরা বড একটা এদিকে আসেন নি। রেলে চেপে যতটা কালা ও বোবা সেজে থাকা যায়, ততই ভাল। তাছাডা কি না কি রোগ হয়েছে কে জানে? স্বভাবতই তাঁরা এতক্ষণ ওদের হাওয়া বাঁচিয়ে চলছিলেন। খবরের কাগজ ও পাণ্ডেজীদের দৌলতে এতক্ষণে এদিকে আকৃষ্ট হলেন। চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরলেন ওদের। রানাদের আসন টলে উঠল। তাঁরা পালিয়ে বাঁচলেন। আর বঙ্গ-সন্তানগণের গর্বে গর্বিত বঙ্গ-সন্তানগণ মন্তব্য করলেন—'দেখতে হবে তো, কোন দেশের ছেলে'। তারপরে প্রশ্নের প্রবাহে

ভাসিয়ে দিতে চাইলেন বীরেনকে। অতি উৎসাহীরা আবার ডাক্তারের কাছে ডাক্তারীর পাঠ নিতে বসে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন—"ফ্রস্ট-বাইট দেখতে কেমন ?"

ডাক্তার সাফ জবাব দিল, "দেখানো সম্ভব নয়।"

"কেমন করে হয় ?"

"পর্বতাভিযানে বা চীনেদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলেই জানতে পারবেন।"

"কেন হয় ?"

বাধ্য হয়ে ডাক্তারকে বলতে হয়, "যেখানে প্রচণ্ড শীত ও প্রবল হাওয়া বয় সেখানে শরীরের উত্তাপ খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়। শিরাগুলি সঙ্কুচিত হয়ে মোমের মত শক্ত হয়। ফলে নাক কান কিম্বা পায়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কারণ শরীরের এই অংশগুলিই অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু তখন রোগী টেরই পায় না। ব্যথা হয় না কিনা ?"

"কেন ব্যথা হয় না স্যার ?"

নাঃ ডাক্তার আজ জব্বর পাল্লায় পড়েছে। নিরুপায় ডাক্তার বলে চলে, "রক্তচলাচল বন্ধ হবার ফলে শরীরের ঐ অংশগুলো মরে যায়—বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে। আহত অংশগুলো কুঁচকে প্রথমে লাল ও পরে কালো হয়। তা থেকে আলসার বা গ্যাংরীণ হয়ে যায়। তখন কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না।"

ওদের এই উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে বীরেনের কাছে একটা প্রচণ্ড প্রহসন বলে মনে হয়। সে আর চুপ করে থাকতে পারে না বলে ফেলে, "মাফ করবেন। এঁরা অসুস্থ, বিশ্রামের প্রয়োজন। আপনারা যদি দয়া করে আমাদের বিরক্ত না করেন, বাধিত হব।"

॥ ৩৫ ॥

এক মাস বিশ দিন বাদে ১১ই নভেম্বর তুন এক্সপ্রেস আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে এল কলকাতায়। ভানুরা এসেছে ঠিক তার সাতদিন আগে। স্টেশন থেকেই ওদের নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওরা সেখানেই আছে। বেস ক্যাম্প থেকে রওনা হবার পর ওদের চিন্তাই আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। অথচ

এই মানসিক অবস্থার মধ্যেও আমাদের বদ্রীনাথ যেতে হয়েছিল। মানত না মেনে উপায় নেই। গোবিন্দঘাট থেকে আমরা ধরেছি বদ্রীনাথের পথ। যাত্রীশূন্য যাত্রাপথ। নভেম্বর মাস। এ সময় এমনিতেই যাত্রী খুব কম থাকেন। বদ্রীনাথে তুষারপাত আরম্ভ হয়ে যায়। তাহলেও মন্দির বন্ধ হবার উৎসব উপলক্ষে কিছু কিছু যাত্রী প্রতি বছরই এ সময় বদ্রীনাথ যান। এবারে তাদের সংখ্যা নেহাতই নগন্য। মাও-সে-তুংয়ের শত পুষ্পের মহিমায় ('letting a hundred flowers blossom, and a hundred schools of thought contend,) বাবা বদ্রীনাথ এবারে ভক্তশূন্য হয়ে পড়েছিলেন।

আমরা বদ্রীনাথ যাচ্ছি শুনে গোবিন্দঘাটে সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন—'বলেন কি! লোক পালিয়ে আসছে। কবে চীনেরা আক্রমণ করে ঠিক নেই। আর আপনারা সেই সীমান্তের দিকেই চললেন ?'

বিস্মিত হিতাকাঙ্ক্ষীদের সকল উপদেশ অমান্য করে, আমরা বীর জওয়ানদের সঙ্গে মার্চ করে গিয়েছি অলকাপুরীতে। করুণাময় বদ্রীনারায়ণের কাছে করজোড়ে ভানু টোপগে ও আং টেম্বার আশু আরোগ্য কামনা করেছি। সেই শান্ত সমাহিত অলকাপুরীতে আমরা নিঃসন্দেহে বদ্রীনারায়ণের পুণ্যস্পর্শ পেয়েছি। যেমন পেয়েছেন বীর জওয়ানরা—যাঁরা মন্দিরের সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মিলিটারী স্যালুট্ ঠুকে, সীমান্তের পথে এগিয়ে চলেছেন। মনে মনে তাঁদেরও প্রণাম করে আমরা বিদায় নিয়েছি বদ্রীনাথ থেকে।

নির্বিঘ্নেই ফিরে এসেছি কলকাতা। ইতিমধ্যে 'যুগান্তর'-এ ধারাবাহিক ভাবে 'নীলগিরি অভিযান' প্রকাশ শুরু হয়ে গেছে, 'স্টেট্‌স্‌ম্যান'-এ আমাদের আগমন সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। স্বভাবতই অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী হাওড়া স্টেশনে আমাদের সম্বর্ধনা জানাতে এসেছেন। তাঁরা আমাদের আলিঙ্গন করছেন, মালা দিচ্ছেন, ছবি তুলছেন। কিন্তু এই স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দনে আমরা ঠিক সাড়া দিতে পারছি না। ভানুদের কথাই কেবল বার বার মনে পড়ছে। মিস্টার ডয়েগ বললেন, "ওরা ভাল আছে। এখন তোমরা পরিশ্রান্ত। বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করে বিকেলে নার্সিং হোমে এসো।"

আমাদের মন কিঞ্চিৎ শান্ত হল। কিন্তু শান্ত হল না অমূল্য। সে তার ডায়না ছাত্র সংঘের কয়েকটি বন্ধুকে নিয়ে স্টেশন থেকে সোজা নার্সিং হোমে চলে গেল।

আমরা নার্সিং হোমে এলাম বিকেলে। ওরা আমাদের দেখতে পেয়েই

বিছানায় উঠে বসল। পারলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে। আমরাই এগিয়ে গিয়ে ওদের জড়িয়ে ধরলাম।

আং টেম্বার অবস্থা অনেকটা ভাল। হয়তো অপারেশান করতে হবে না। ভানুর অবস্থাও খুব খারাপ নয়। কিন্তু টোপগে? টোপগের চোখে জল—মুছে দিতে গিয়ে দেখি নিজের চোখও সজল হয়ে উঠেছে। তবু বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলি, "চিন্তা কোরো না। তোমাকে আমরা ভাল করে তুলবই।"

ডাক্তারের নির্দেশে আমরা বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না ওদের কাছে। পাছে ওরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে তাই আমাদের বেরিয়ে আসতে হল কেবিন থেকে। চিন্তাকুল মনে নেমে এলাম নীচে।

অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এই চিকিৎসা। কোথা থেকে যোগাড় হবে টাকা? বহু টাকা। অন্ততঃ হাজার দশেক টাকার প্রয়োজন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোটেই এই অর্থসংগ্রহের অনুকূলে নয়। সারা দেশ প্রতিরক্ষা তহবিল নিয়ে ব্যস্ত। এ সময় কে দেবে আমাদের এত টাকা? তাই বলে তো নার্সিংহোম ছেড়ে দেবে না। যে ভাবেই হোক যোগাড় করতে হবে। ঠিক হল—কাগজে দশ হাজার টাকা তোলার আবেদন জানানো হবে। আমরা চীনেদের রুখি নি, কিন্তু তাদের আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও দুর্গম নীলগিরি শিখরে জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেছি। আসমুদ্র-হিমাচল এই বিরাট দেশের বিশাল জনসাধারণ যদি সাড়া দেন, তবে দশ হাজার টাকা উঠতে কতক্ষণ?

নার্সিং হোমের সামনের প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হলাম সবাই। আঁধার নেমে এসেছে শহরের বুকে। বাতাসে একটা স্নিগ্ধ শীতের পরশ। পাখীরা কুলায়ে গেছে ফিরে। আমরাও ফিরে যেতে পারি ঘরে। কিন্তু ঘরমুখো হচ্ছে না মন। মন আমাদের অশান্ত।

"মহারাজ, এক ভদ্রমহিলা আপনাকে ডাকছেন।"

প্রাণেশের কথায় ফিরে তাকাই। জিজ্ঞেস করি, "কোথায়?"

"ঐ যে, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।"

এগিয়ে আসি। সাহেব পাড়ার নির্জন রাস্তার অপর্যাপ্ত আলোয় দেখতে পাই—সাদা থান পরিহিতা বছর বিশেক বয়সের নিরাভরনা একটি মেয়ে বিষন্ন নয়নে তাকিয়ে আছে। তার পা দুটি পাদুকা-শূন্য। সাধারণ বাঙালী মেয়েদের মতই গড়ন। কিন্তু গায়ের রং খুবই ফর্সা। ঘোমটাটি খসে পড়েছে পিঠে।

কোঁকড়ানো কালো কেশ—অনাদরে অবিন্যস্ত। আহা এমন মেয়ের এমন বেশ!

কাছে আসতেই দু হাত জোড় করে স্নিগ্ধ স্বরে মেয়েটি বলে, "নমস্কার। আপনি আমাকে চিনবেন না। কিন্তু আমি আপনাকে জানি।"

"আপনার পরিচয়টা……"

"পরিচয়?" গলাটা হঠাৎ ভারী হয়ে ওঠে মেয়েটির। একটু থেমে আবার বলে, "আপনাদের গৌরবে যারা গৌরবান্বিত, আমি তাদেরই একজন।"

"গৌরব যদি কিছু অর্জিত হয়ে থাকে, তার সবটাই আপনাদের প্রাপ্য। আপনাদের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহানুভূতির জন্যই আমরা সফলকাম হতে পেরেছি।"

"এ আপনার বিনয়। যাই হোক, আমার একটি আবেদন আছে।"

"বলুন কি করতে পারি।"

"আহত অভিযাত্রীদের চিকিৎসার জন্য আমি সামান্য কিছু নিবেদন করতে চাই।"

"নিবেদন বলছেন কেন? বলুন দান। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে সে দান গ্রহণ করব।"

মেয়েটি এক টুকরো কাগজ আমার হাতে দেয়। খুলে দেখি একটি পঁচিশ টাকার চেক। নীচে সুন্দর মেয়েলি ছাঁদের স্বাক্ষর—অনীতা ভৌমিক। চমকে উঠি। অনীতা? মনে করার চেষ্টা করি। অনীতা ভৌমিক… . বিকাশ—? "আপনি লেফটেন্যাণ্ট বিকাশ ভৌমিকের……?" আর বলতে পারি না। তাই যদি হয় তবে অনীতার এ বেশ কেন? তাহলে কি বিকাশ……? মেয়েটির দিকে তাকাই। হ্যাঁ, আমার অনুমান মিথ্যে নয়। অনীতা মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। তার দু গাল বেয়ে অঝোরে জল ঝরছে। কি বলব? সান্ত্বনা, সহানুভূতি, উপদেশ? না, সে সবই যে মিথ্যে। বাসি-বিয়ের দিন স্বামীকে সীমান্তে রওনা করে দিয়েছে। আর সে ফিরে আসে নি। সহসা একদিন সংবাদ এসেছে। শাঁখা ভেঙ্গে ফেলতে হয়েছে, সিঁদুর মুছে ফেলতে হয়েছে, অলঙ্কার খুলে ফেলতে হয়েছে। একে আমি কি সান্ত্বনা দেব?

আমারই কি কিছু সান্ত্বনার প্রয়োজন নেই?…মনের মধ্যে এ কিসের একটা গ্লানি এমন করে ঠেলে ঠেলে উঠছে!…সেদিনের সেই মনোভাবের জন্য অনুশোচনাই কি? বিকাশ ভৌমিক ভাবী অমঙ্গলের আভাস পেয়েছিল তার মনে—কিন্তু সেটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি নি। তার সেই বিষন্নতা নিয়ে উপহাস করেছি মনে মনে, আতিশয্য মনে করেছি! কবির উক্তি স্মরণ করিয়ে

ব্যাপারটা লঘু করে দেবারও চেষ্টা করেছি। জল ভরা মেঘ রয় না, রয় না চিরকাল। কিন্তু কবির সে আশ্বাস সত্য হয় নি তার জীবনে।

কতক্ষণই বা চুপ করে থাকা যায়? কিছু তো বলতে হবে। জিজ্ঞেস করি, "কবে এরকম হল?"

ক্ষীণকণ্ঠে অনীতা বলে, "টেলিগ্রাম এসেছে আজ দশ দিন।" একটু থেমে সামলে নিয়ে আবার বলে, "বিয়ের রাতে সেই টেলিগ্রাম পেয়েই মন আমার অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল। তাই আমি যেতে চেয়েছিলাম ওর সঙ্গে। কিন্তু আমার অসুবিধে হবে বলে কিছুতেই নিয়ে গেল না জোশীমঠে।"

"সেখানে তো তিনি মাত্র মাস দেড়েক ছিলেন।"

"তবু সেই দেড মাসের স্মৃতিকে সম্বল করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম।"

কি উত্তর দেব? যে মেয়ে জীবনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য স্বামীর সান্নিধ্যে এসেছে, তার কাছে দেড় মাস সুদীর্ঘ কাল বইকি!

অনীতাই আবার বলল, "কত করে বললাম—ও কিছুতেই রাজী হল না। কেবলই সেই এক কথা—চারটে তো মাস। নভেম্বরেই হাই-অল্‌টিচুড্ টার্ম শেষ হয়ে যাবে। আর রিনিউ করবে না। নেমে আসবে কোন ভাল ফ্যামিলি স্টেশনে। সংসার পাতবে···যে নভেম্বরের আশায় বুক বেঁধেছিলাম, সেই নভেম্বরেই এল শেষ সংবাদ। এ জীবনে আর সংসার পাতা হল না আমার।"

"আপনি তাঁর শেষ চিঠি কবে পেয়েছিলেন?"

"হট্‌স্প্রিংয়ে যাবার পথে চুশুল থেকে ডাকে দিয়েছিল। সেই চিঠিতেই ও আপনাদের কথা লিখেছিল। ওর বিশ্বাস ছিল জয় আপনাদের হবেই। লিখেছিল—আমি যেন ওঁর হয়ে আপনাদের অভিনন্দন জানিয়ে যাই। তাই আমি আপনাদের অপেক্ষায় বসে ছিলাম কলকাতায়। আজ তার শেষ আদেশ পালন করলাম। কাল চলে যাচ্ছি।"

"কোথায়?"

"দিল্লী। আমি মিলিটারী নার্সিং সার্ভিসে যোগ দিয়েছি।"

"বড় পরিশ্রমের কাজ। আপনি লেখাপড়া শিখেছেন। অন্য কোন ভাবেও তো দেশের সেবা করতে পারতেন।"

"সে সেবায় আমার মন ভরবে না মহারাজ। তাকে সেবা করতে পারি নি। জানি না সে কিভাবে কি অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। তার চিকিৎসা

হয়েছে কিনা। শেষ সময় কেউ তার মুখে একটু জল ঢেলে দিয়েছিল কিনা। কিন্তু তার মত যাঁরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করছেন, তাঁদের যদি সেবা করতে পারি, তবে তার অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তি হবে। আমিও শান্তি পাব।"

কোনমতে একটি নমস্কার করে অনীতা তাড়াতাড়ি চলে যায়। বোধ হয় পালিয়ে যায়। আমি চেয়ে থাকি ব্যথার ভারে নুয়ে পড়া সেই চলমান মেয়েটির দিকে। ওর মত দুঃখিনী সংসারে খুব বেশী জন্মায় না। অথচ ওর সকল দুঃখের মূলে এ দেশের মাটি, যে দেশের মানুষ বিকাশদের কথা বড় একটা ভেবে দেখে নি কোনদিন।

কিন্তু চিরকাল এ বিস্মৃতির পালা চলতে পারে না। বিকাশের মত যারা তাদের সকল প্রিয়জনের অগোচরে, নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে, দেশের মান বাঁচিয়ে গেল, তাদের কথা একদিন লেখা হবে ইতিহাসে। অনীতাদের নামও লেখা থাকবে তাদের পাশে।

সেদিন সন্ধ্যায় অনীতা যে ভাণ্ডার খুলে দিয়ে গেছে, আজ আমাদের সে ভাণ্ডার ভরে উঠেছে। ব্যক্তিগত জীবনে অনীতা যত বড় ভাগ্যহীনাই হোক, আমাদের কাছে সে পরম সৌভাগ্যের প্রতীক। দু মাসে দশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। তাছাড়া কলকাতার একজন বিখ্যাত ইংরেজ সার্জেন বিনা পারিশ্রমে ভানু ও টোপগের অপারেশান করে আমাদের অন্ততঃ দু হাজার টাকার সাশ্রয় করেছেন।

রাজসিক ব্যয়ের কথা জেনেও আমরা ওদের নার্সিং হোমে ভর্তি করেছিলাম। ভানু ও টোপগে প্রায় দু মাসের মত বন্দী ছিল সেখানে। জলের মত টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু লাভ হয় নি কিছু। টোপগে তার দু পায়ের সাতটি ও ভানু এক পায়ের দুটি আঙুল জীবনের মত হারিয়েছে। আং টেম্বা ভাগ্যবান! তার কোন অঙ্গহানি হয় নি।

ভানু অচল হয় নি, তবে তাকে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। কিন্তু তার পর্বতাভিযানের নেশা কাটে নি, বরং বেড়েছে। আগামী গ্রীষ্মে (১৯৬৩) সে স্যার এডমাণ্ড হিলারী ও মিঃ ডেসমণ্ড ডয়েগের সঙ্গে 'স্কুল হাউস' অভিযানে অংশ গ্রহণ করছে।

সুইজারল্যাণ্ড ট্রেন্ড্ পেশাদার শেরপা টোপগে আর কোন দিন পর্বতাভিযানে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। নীলগিরি তাকে স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়েসহ অনাথ করেছে। দুর্গমগিরি নীলগিরি শিখরে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্য, কিন্তু ভারতকে হারাতে হয়েছে তার একজন শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী।

—শেষ—

হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গারোহণের পঞ্জী

শৃঙ্গ	উচ্চতা (ফুট)	প্রথম আরোহণকারী	তারিখ	সংগঠক	অবস্থান
১ এভারেস্ট	২৯,০২৮	তেনজিং নোরগে, এডমাণ্ড হিলারী	২৯।৫।৫৩	বৃটিশ	কোশী, পূর্ব নেপাল
২ কে—২	২৮,২৫০	আচিলে কম্পাগ্ননি, লিনো লাচেদেলী	৩১।৭।৫৪	ইতালীয়	বালতোরো, লাদাক
৩ কাঞ্চনজঙ্ঘা—১	২৮,২০৮	জর্জ ব্যাণ্ড, জো ব্রাউন, নর্মান হার্ডি, এইচ. আর. এ. স্ট্রীথার	২৫।৫।৫৫	বৃটিশ	সিকিম
৪ লোত্‌সে	২৭,৯২৩	ফ্রিত্‌জ লুকসিঙ্গার, আর্নস্ট রাইস্‌	১৮।৫।৫৬	সুইস	কোশী, পূর্ব নেপাল
৫ মাকালু—১	২৭,৮২৪	জ াঁ ফ্রাঙ্কো, লায়োনেল টেরে, জ াঁ কুজি, গি দ্য মাগনোনে, পিয়ের লেরু, জ াঁ বুভিয়ের, আঁদ্রে ভিয়ালাত্তে, সার্জে কুপে, এক শেরপা	১৫।৫।৫৫	ফরাসী	কোশী, পূর্ব নেপাল
৬ কাঞ্চনজঙ্ঘা—২	২৭,৮০৩	চার্লস ইভান্স (নেতা)	১৬।৫।৫৫	বৃটিশ	সিকিম
৭ ধৌলাগিরি—১	২৬,৯৭৫	ডাঃ ম্যাক্স আইসেলিন, নর্মান ডাইরেন-ফুর্ট, পিটার ডিয়েনার, আর্নস্ট ফোরার, এ. স্কেলবার, কুর্ট ডিয়েমবার্গার, মাইকেল ভাউচার, এইচ. ওয়েবার, নেমা দোর্জে, নানা	১৩।৫।৬০	সুইস	কার্নালী, মধ্য নেপাল

শৃঙ্গ	উচ্চতা (ফুট)	প্রথম আরোহণকারী	তারিখ	সংগঠক	অবস্থান
৮ মানাস্লু (কুতাং)—১	২৬,৭৬০	তোসিও ইমানিশী, কিচিরো কাটো, মিনোরু হিগেটা, গিয়ালজেন নরবু	৯।৫।৫৬	জাপানী	গণ্ডকী, মধ্য নেপাল
৯ চো-উ	২৬,৭৫০	ডাঃ হার্বার্ট টিচ, সেপ জোয়েকলার, পাসাং দাওয়া লামা	১৯।১০।৫৪	অস্ট্রিয়	কোশী, পূর্ব নেপাল
১০ নাঙ্গা পর্বত—১	২৬,৬৬০	হার্মান বুল	৩।৭।৫৩	অস্ট্রো-জার্মান	কাশ্মীর
১১ অন্নপূর্ণা—১	২৬,৫০৪	এম. মরিস হার্জোগ, লুই লাচেনাল	৩।৬।৫০	ফরাসী	গণ্ডকী, মধ্য নেপাল
১২ গাশেরব্রুম—১	২৬,৪৭০	পিটার কে. স্কুয়েনিং, এ্যাণ্ড্রিউ জে. কাউফম্যান	৪।৭।৫৮	মার্কিন	বালতোরো, লাদাক
১৩ ব্রড্ পিক—১	২৬,৪১৪	মার্কাস শুমাচ, হার্মান বুল, ফ্রিত্জ উইণ্টারস্টেলার, কুর্ট ডিয়েমবার্গার	৯।৬।৫৭	অস্ট্রিয়	বালতোরো, লাদাক
১৪ গাশেরব্রুম—২	২৬,৩৬০	এস. লার্চ, এফ্ মোরাভেক, এইচ উইলেনপার্ট	৭।৭।৫৬		বালতোরো, লাদাক
১৫ গোসাইথান—১ (শিশা পাংমা)	২৬,২৯১		অজেয়		গণ্ডকী, মধ্য নেপাল
১৬ গাশেরব্রুম—৩	২৬,০৯০		অজেয়		বালতোরো, লাদাক
১৭ অন্নপূর্ণা—২	২৬,০৪১	আর. জি. গ্র্যাণ্ট, সি. জি. বনিংটন, আং নীমা	১৭।৫।৬০	ভারতীয়-নেপালী-বৃটিশ	গণ্ডকী, মধ্য নেপাল

১৮ ব্রড পিক—২	২৬,০১৭		অজেয়		বালতোরো, লাদাক,
১৯ গাশেরব্রুম—৪	২৬,০০০	ওয়াল্টাব বনাত্তি, কার্লোমানরো	১৯।৮।৫৮	ইতালীয়	বালতোরো, লাদাক
২০ গিয়াচুংকাং	২৫,৯৯০		অজেয়		কোশী, পূর্ব নেপাল
২১ দিস্তেঘিল-সর—১	২৫,৮৬৮	গাম্বার স্টার্কার, ডাইথার মার্চার্ট	৯।৬।৬০	অস্ট্রিয়	হিসপার, লাদাক
২২ হিমালচুলি	২৫,৮০২	জিভো ইয়ামাদা (নেতা)	।৬০	জাপানী	গণ্ডকী, মধ্য নেপাল
২৩ কাংবাচে	২৫,৭৮২		অজেয়		সিকিম
২৪ কিনিয়াংচিশ	২৫,৭৬২		অজেয়		কারাকোরাম
২৫ নোজুম্বা-কাং	২৫,৭৩০		অজেয়		কোশী, পূর্ব নেপাল
২৬ নুপত্সে	২৫,৭২৫	ডেনিস ডেভিস, ক্রস বনিংটন, লেসলী ব্রাউন, জিম সোয়ালো, তাসী, আং পেম্বা	১৬।৫।৬১	বৃটিশ	কোশী, পূর্ব নেপাল
২৭ মানাসলু—২	২৫,৭০৫		অজেয়		গণ্ডকী, মধ্য নেপাল
২৮ মাশেরব্রুম-পূর্ব	২৫,৬৬০	ডাঃ জর্জ বেল, উইলিয়াম আনসোল্ড, নিকোলাস ক্লিঞ্চ, আর. জে. আখতার	৬।৭।৬০	মার্কিন-পাক	লাদাক
২৯ নন্দাদেবী	২৫,৬৪৫	এইচ. ডাবলু. টিলম্যান, এন. ই. ওডেল	২৯।৮।৩৬	বৃটিশ	চামোলী, গাড়োয়াল,
৩০ চোমা-লোমজো	২৫,৬৪০	জে. কুজি. এল. টেরে	৩০।১০।৫৪	ফরাসী	কোশী, পূর্ব নেপাল
৩১ নাঙ্গা পর্বত—২ (নর্থ পিক)	২৫,৬২০		অজেয়		কাশ্মীর

শৃঙ্গ	উচ্চতা (ফুট)	প্রথম আরোহণকারী	তারিখ	সংগঠক	অবস্থান
৩২ মাশেরব্রুম—পশ্চিম	২৫,৬১০		অজেয়		লাদাক
৩৩ রাকাপোশী	২৫,৫৫০	ক্যাপ্টেন মাইক ব্যাঙ্ক্স্, টম প্যাটে	২৫।৬।৫৮	বৃটিশ-পাক	কাশ্মীর
৩৪ হুঞ্জা কুঞ্জি—১	২৫,৫৪০		অজেয়		বাতুরা, কাশ্মীর
৩৫ জেমু	২৫,৫২৬		অজেয়		সিকিম
৩৬ কান্‌জুত্-সর	২৫,৪৬০		অজেয়		হিসপার, লাদাক
৩৭ কামেট	২৫,৪৪৭	ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ, এরিক সিপ্টন, আর এল. হোল্ডসওয়ার্থ, ই. এস. জে বার্নি, সি. আর গ্রীন, লেওয়া, কেশর সিং	২১।৬।৩১	বৃটিশ	চামোলী, গাড়োয়াল
৩৮ নাম্‌চা বারোয়া	২৫,৪৪৫		অজেয়		আসাম
৩৯ ধৌলাগিরি—২	২৫,৪২৯		অজেয়		গণ্ডকী, মধ্য নেপাল
৪০ সালতোরো কাংরী-১	২৫,৪০০		অজেয়		লাদাক
৪১ গুর্লা মান্ধাতা	২৫,৩৫৫		অজেয়		কার্নালী, মধ্য নেপাল
৪২ জানু	২৫,২৯৪		অজেয়		কোশী, পূর্ব নেপাল
৪৩ হুঞ্জা কুঞ্জি—২	২৫,২৯৪		অজেয়		বাতুরা, কাশ্মীর
৪৪ সালতোরো কাংরী-২	২৫,২৮০		অজেয়		লাদাক
৪৫ মাউন্ট নলা	২৫,২৭৮		অজেয়		গণ্ডকী, মধ্য নেপাল
৪৬ ধৌলাগিরি—৩	২৫,২৭১		অজেয়		গণ্ডকী, মধ্য নেপাল

৪৭ তিরিচ মির	২৫,২৬৩	পি. কার্নবার্গ, এইচ. বার্গ, এ. নেস্, এইচ আর. এ. স্ট্রিথার	২১।৭।৫০	নরওয়েজীয়	হিন্দুকুশ, চিত্রল
৪৮ দিস্তেঘিল-সর—২	২৫,২৫০		অজেয়		হিসপার, লাদাক
৪৯ সাসের কাংরী	২৫,১৭০		অজেয়		লাদাক
৫০ কুঙ্গুর	২৫,১৪৬		১৬।৮।৫৬	রুশ-চীনা	পামীর
৫১ গোসাইথান—২	২৫,১৩৪		অজেয়		কোশী, পূর্ব নেপাল
৫২ মাকালু—২	২৫,১২০	জে ফ্যাঙ্কো, এল. টেরে, গিয়ালজেন, পা নরবু	২।১০।৫৪	ফরাসী	কোশী, পূর্ব নেপাল
৫৩ চোগোলিসা—১	২৫,১১০		অজেয়		মাসেরব্রুম, লাদাক
৫৪ ধৌলাগিরি—৪	২৫,০৬৪		অজেয়		গণ্ডকী, মধ্য নেপাল

ভারতীয় পর্বতারোহণের পঞ্জী

শৃঙ্গ	উচ্চতা (ফুট)	প্রথম আরোহণকারী	নেতা	তারিখ	অবস্থান
১ চো-উ	২৬,৭৫০	সোনাম গিয়াত্‌সো, পাসাং দাওয়া লামা, নেতা	কেকি এফ. বুনশা	১৫।৫।৫৮	কোশী, পূর্ব নেপাল
২ কামেট	২৫,৪৪৭	আং থার্কে, দা নামগিয়াল, আং টেম্বা, লাকপা দোর্জে, নেতা	এন. ডি. জয়াল	৬।৭।৫৫	চামোলী, গাড়োয়াল
৩ অন্নপূর্ণা—৩	২৪,৮৫৮	সোনাম গিয়াত্‌সো, সোনাম গির্মি, নেতা	এম. এস. কোহলি	৬।৫।৬১	গণ্ডকী, মধ্য নেপাল
৪ সাকাং	২৪,১৫০	বিজয় রায়না, দ্বারকা দাস, উগাম পুলজার, দা নামগিয়াল, নওয়াং গোম্বু, টোপগে, পুলজার, নেতা	এন. ডি. জয়াল	২৫।৭।৫৬	লাদাক
৫ আবিগামিন	২৪,১৩০	পেম্বা সুন্দর, পূরণ সিং, নেতা	ঐ	১৭।৬।৫৩	চামোলী, গাড়োয়াল
৬ চৌখাম্বা—১	২৩,৪২০	এ. কে. চৌধুরী, পি. সি. চতুর্বেদী, সি. পি. রাওয়াত, পাসাং দাওয়া লামা	এস. এন. গয়াল	১৭।১০.৫৯	চামোলী, গাড়োয়াল
৭ ত্রিশুল—১	২৩,৩৬০	রয়. ডি. গ্রীনউড, দাওয়া থাণ্ডুপ, নেতা	গুরুদয়াল সিং	২১।৬ ৫১	চামোলী, গাড়োয়াল
৮ কোকটাং	২৩,০০০	এইচ. পি. এস. আলুওয়ালিয়া, নওয়াং গোম্বু, কালদেন, দোর্জে, নেতা	কে. এস. রানা	২৬ ৪।৬২	পশ্চিম সিকিম
৯ থাংচেনগিয়	২২,৭০০	জশবন্ত সিং, লাকপা তেনজিং, নেতা	সোনাম গিয়াত্‌সো	২১।১০।৬১	সিকিম

১০ পঞ্চচুলি	২২,৬৫০	নেতা	পি. এন. নিকোরে	২৭।৫।৫৩	কুমায়ুন
১১ নন্দাকোট	২২,৫১০	কে. পি. শর্মা, নেতা	এম. এস কোহলি	২৫।৫।৫৯	কুমায়ুন
১২ মৃগথনি	২২,৪৯০	আমীর আলি, রাজেন্দ্রবিক্রম সিং, কল্যাণ সিং, দেওয়ান সিং, নেতা	গুরুদয়াল সিং	১৯।৬।৫৮	চামোলী, গাড়োয়াল
১৩ মাইকতোলি	২২,৩২০	জন ডায়াস, হরি দাং, সুমন দুবে, কে এন. থাদানী, লাকপা, নিমা, কালদেন, কল্যাণ সিং, বাহাদুর সিং, নেতা	ঐ	২১।৬।৬১	চামোলী, গাড়োয়াল
*১৪ দেবীস্থান—১	২১,৯১০	জন ডায়াস, হরি দাং, সুমন দুবে, এন শর্মা, নিমা, কালদেন, কল্যাণ সিং, নেতা	ঐ	১৬।৬।৬১	চামোলী, গাড়োয়াল
১৫ নন্দাখাত	২১,৬৯০	পান সিং, নেতা	পৃথ্বী চৌধুরী	২০।১০।৬১	আলমোড়া, কুমায়ুন
*১৬ নীলকণ্ঠ	২১,৬৪০	ও. পি. শর্মা, ফুর্বা লোবসাং, লাকপা গিয়ালবু	এন. কুমার	১৩।৬।৬১	চামোলী, গাড়োয়াল
১৭ নীলগিরি	২১,২৬৪	ভানু ব্যানার্জি, নিতাই রায়, আজীবা, আং দাওয়া, টোপগে, আং টেম্বা, পূর্বা ছান্দু	অমূল্য সেন	২৬।১০।৬২	চামোলী, গাড়োয়াল

শৃঙ্গ	উচ্চতা (ফুট)	প্রথম আরোহণকারী	নেতা	তারিখ	অবস্থান
১৮ বন্দরপুচ্ছ—১ (ব্ল্যাক পিক)	২০,৯৫৬	কে. এন. থাদানী, এম. এস জোশী, বি. এল. ভাট, ও. পি. মানচান্দা, ওয়াই. কে. যাদব, টি. আও, ফুর্বা লোবসাং, দাওয়া থাণ্ডুপ, নেতা	জগজীৎ সিং	৭।৬।৫৯	উত্তরকাশী, গাড়োয়াল
১৯ নন্দাঘুন্টি	২০,৭০০	দিলীপ ব্যানার্জি, আং শেরিং, আজীবা, পেম্বানরবু, তাসী, নেতা	সুকুমার রায়	২২।১০।৬০	চামোলী, গাড়োয়াল
২০ ফ্রে পিক	২০,০০০	এ্যাডভান্স কোর্সের মেয়েরা, নেতা	তেনজিং নোরগে	১২।৫.৬২	সিকিম
২১ দেও টিব্বা	১৯,৬৮৭	হিমালয়ান ইন্‌স্টিটিউট, মানালী-র ছাত্ররা		৪।৬।৬২	পাঞ্জাব

* প্রথম বিজয়